রাজনীতিতে সন্ত্রাস ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ২৯।৭।১০
ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

449618

এম, এ, রাজ্জাক
এম, ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-৪৭০
শিক্ষাবর্ষ -২০০৩-২০০৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
Dhaka University Library
449618

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আগস্ট-২০১০

449618

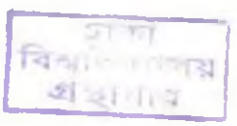

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার দাদা-দাদী,

ও

বাবা-মা,

বড় বোন রিনা, ছোট বোট মিনা, শিউলী, লিপি এবং

ভাগ্নে দ্বীপ, এন্থ্যনী, টনী, ভাগ্নী মাহি, অদিতি ও মীম' কে।

449618

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিনীত

এম. এ. রাজ্জাক
এম. ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা
• গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র	I
• গবেষকের ঘোষণাপত্র	II
• গবেষকের কথা	III-IV
• গবেষণার সারসংক্ষেপ	V-VII
• মানচিত্র (সন্ত্রাস চিত্র)	VIII-XIII

449618

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম, এ, রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "রাজনীতিতে সন্ত্রাস: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বধানে রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা

প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

২৯/৭/৯৯

(ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমি এম, এ, রাজ্জাক, এম, ফিল গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত "রাজনীতিতে সন্ত্রাস: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ" শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভটি ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম, ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি জন্য কখনোও প্রকাশিত হয়নি।

বিনীত

এম. এ. রাজ্জাক
এম, ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

তাত্ত্বিক জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জিত হয় ব্যবহারিক কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে। গবেষণাকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন একটি সময়োপযোগী গবেষণা করার সুযোগ পেয়ে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীনের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। যিনি গবেষণাকর্ম পরিচালনার প্রতিটি স্তরে সুচিন্তিত পরামর্শ, মূল্যবান উপদেশ, নির্দেশনা, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা দিয়ে আমার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছেন।

আমার রাজনীতিতে সন্ত্রাস শীর্ষক শিরোনামে পরিচালিত গবেষণা কর্মটি ছিল একটি সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে গবেষক হিসেবে কিছু কথা তুলে ধরছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাপূর্ব, ১৯৬০ সালে কমিউনিজম পার্টির আর্দশে প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীই সর্ব প্রথম এদেশের ভূখন্ডে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সূচনা করে। পরবর্তী সময়ে এই ধারাবাহিকতায় যে সমস্ত সন্ত্রাসী গ্রুপ এদেশের ভূখন্ডে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বীজ বপন করেছে তা হলো সর্বহারা পার্টি, জনযুদ্ধ, নতুন বিপ্লবী সাম্যবাদী গোষ্ঠী, শ্রমজীবী আন্দোলন, মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইস্ট বেঙ্গল এবং কমিউনিষ্ট পার্টি অব পূর্ব বাংলা। যা দেশের উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে বিস্তৃত লাভ করেছে। এছাড়াও পরবর্তীতে আরো কয়েকটি নবতর সন্ত্রাসী গ্রুপ আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসী গ্রুপ হচ্ছে-জামাতুল মুজাহিদিন অব বাংলাদেশ (জে,এম,বি), হরকাতুল জিহাদ-ই-ইসলামী (হুজি) আহলে হাদী, আল্লাহর দল, হিজবুত-তাহির এবং হিজবুল মুজাহিদীন। এ সমস্ত দলগুলো ইতিমধ্যে আমেরিকার সন্ত্রাসী কালো তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। উক্ত সন্ত্রাসী দল সমূহ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সর্বোপরি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী ভীত সন্ত্রস্ত এবং জীবন যাপন কে নাভিশ্বাস করে তুলছে। বর্তমান সরকারকে উক্ত সন্ত্রাসী গ্রুপের পৈশাচিক অপতৎপরতা রুখতে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর সাবধান, সাহসী এবং তৎপরতার সঙ্গে এগোতে হচ্ছে। যা কিনা দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ভারসাম্যহীন করে তুলছে এবং বাধাগ্রস্ত করছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

দেশের এরূপ পরিস্থিতিতে আমার উপলব্ধি কাজ করে যে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধরে রাখতে হলে, জন জীবনে স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক অঙ্গন ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলার জন্য সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর নির্মূল অপরিহার্য। আমার এই গবেষণার বিষয় নির্ধারণে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা যিনি রেখেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন এবং উক্ত গবেষণা কর্মের যাবতীয় বিষয় সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

গবেষণার শিরোনাম নির্বাচনের আরো একটি শক্তিশালী দিক হচ্ছে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। যা কিনা উপরোক্ত বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে আমাকে দারুণ ভাবে উৎসাহী করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সাব্বীর আহমেদ, শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় শিক্ষক মণ্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল শ্রদ্ধাভাজন উত্তরদাতাগণকে, যারা গবেষণার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ও নির্ভূলভাবে পূরণ করে সহযোগিতা করেছেন এবং গবেষণার মূল উপজীব্য হিসেবে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম অভিসন্দর্ভটি কম্পোজে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর নিষ্ঠার মাধ্যমে যে সহৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও আমার বন্ধু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মিঠু বিভিন্ন দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমার গবেষণা কর্মে দারুন ভাবে সহায়তা করেছে।

পরিশেষে গবেষণা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লাইব্রেরী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণ যারা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছে, আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

বিনীত

এম. এ. রাজ্জাক
এম. ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সাব্বীর আহমেদ, শ্রদ্ধেয় বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও বিভাগীয় শিক্ষক মণ্ডলী বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল শ্রদ্ধাভাজন উত্তরদাতাগণকে, যারা গবেষণার জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে ও নির্ভূলভাবে পূরণ করে সহযোগিতা করেছেন এবং গবেষণার মূল উপজীব্য হিসেবে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম অভিসন্দর্ভটি কম্পোজে অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর নিষ্ঠার মাধ্যমে যে সহৃদ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও আমার বন্ধু সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মিঠু বিভিন্ন দিক নির্দেশনার মাধ্যমে আমার গবেষণা কর্মে দারুন ভাবে সহায়তা করেছে।

পরিশেষে গবেষণা কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লাইব্রেরী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিগণ যারা তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছে, আমি তাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

বিনীত

এম. এ. রাজ্জাক
এম. ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে সন্ত্রাস ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

গবেষণার সারসংক্ষেপ

আমার গবেষণার অভিসন্দর্প "রাজনীতিতে সন্ত্রাস" প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ। বিষয়টি বর্তমান বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন, যা কিনা আমাকে উক্ত অভিসন্দর্ভ নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী করেছে। উক্ত গবেষণা কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উৎস, সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইহার নেতিবাচক প্রভাবকে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি যথেষ্ট যৌক্তিক বলে আমার মনে হয়। আমার গবেষণার মাধ্যমে সন্ত্রাসের একটি শক্ত অবস্থান যে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে এ বিষয়টি অত্যন্ত শক্তিশালী ভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। বর্তমানে বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে আখ্যা দিয়ে পশ্চিমা দেশগুলো সুবিধা লুটে নেয়ার যে পায়তারা চালাচ্ছে এবং মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে অপর মুসলিম রাষ্ট্র সমূহকে ধ্বংস করতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে নেয়ার রসদ হিসেবেই যেন আমরা বলি হতে যাচ্ছি সে বিষয়টির উপস্থাপনও যুক্তিসঙ্গত।

আমার গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উদ্ভব এবং হইার পর্যায় ক্রমিক রূপান্তর কিভাবে সমাজে ঘটেছে এবং কিভাবে তা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপ পরিগ্রহ লাভ করেছে সে বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন। এছাড়া সন্ত্রাস আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় ব্যবস্থাকে যে আমূল পাল্টে দিচ্ছে তারও একটি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত ছিল। সন্ত্রাসের কারণে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের সকল ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে ঐ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডই দায়ী তার একটি সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে এই অবস্থা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করতে পারি তারও সুর্নিদিষ্ট দিক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে । গবেষণায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উদ্যোগ বিকাশ ও সন্ত্রাস সংস্কৃতির যে ধারাবাহিকতা স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে চলে আসছে তার সাতকাহন আলোচিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের নতুনভাবে জঙ্গিবাদ ও চরম পন্থী গোষ্ঠী সমূহ আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকতর সক্রিয় হয়ে উঠেছে তারও আলোচনা অত্যন্ত জোরেশোরে চালানো হয়েছে বিভিন্ন পুস্তক, জার্নাল ও দৈনিক পত্রিকার মধ্য থেকে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস যে ভয়ানক রূপে বিস্তার লাভ করছে তারও একটি সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আমার গবেষণার অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাসের উত্থানের পিছনে দায়ী কারনসমূহের উদ্‌ঘাটন।আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ইহার গুরুত্ব অনুধাবনেরও চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান যে সন্ত্রাস রয়েছে তা যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সৃষ্টি নয়, উপরন্তু, এই সন্ত্রাসের যে, একটা আর্ন্তজাতিক যোগসূত্র রয়েছে তারও একটি আলোচনা হয়েছে। বিশ্বায়ন নামক প্রত্যয়টির মাধ্যমে আজ আমরা সন্ত্রাসের স্রোত ধারায় মিশে গেছি খুব দ্রুত এবং এই পরিস্থিতি দিন দিন ভয়ানক রূপ লাভ করছে।

আমার গবেষণাকর্মটি মোট সাতটি অধ্যায় বিভক্ত হয়ে আলোচিত হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে-১) ভূমিকা ২) গবেষণার পরিধি ৩) গবেষণার উদ্দেশ্য ৪) আনুষাঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা ৫) গবেষণার পরিচালনা পদ্ধতি ৬) গবেষণা এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা ৭) গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায় ৮) গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৯) বাংলাদেশের মানচিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাসের প্রাথমিক পটভূমি ২)সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ৩)রাজনীতিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ৪) সন্ত্রাসের কারণ ৫) রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রকারভেদ ৬) বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস ও গতিধারা ৭) রাজনীতিতে আর্মড্ ক্যাডার।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস অবস্থার পর্যালোচনা ২) বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস প্রবণতা ৩) বাংলাদেশের রাজনীতিক সন্ত্রাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনামলের প্রেক্ষাপট :১৯৭২-২০১০ সাল পর্যন্ত ৪) বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসকের আমলের সন্ত্রাস।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাস বিএনপির শাসনামল।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাস ও আওয়ামীলীগ শাসনামল ২) সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড :১৯৭৪-২০১০ সাল পর্যন্ত।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন ২) আন্তঃ মহাদেশীয় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ৩) ধর্মীয় সন্ত্রাস ও প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম ৪) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তথা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস ৫) বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ১

প্রশ্নমালা জরীপে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষনমূলক ফলাফল

পরিশিষ্ট- ২

জরীপ প্রশ্নমালার নমুনা

উপসংহার

সন্ত্রাস নির্মূলে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা

গ্রন্থপঞ্জি

টাঙ্গাইল সদর উপজেলা

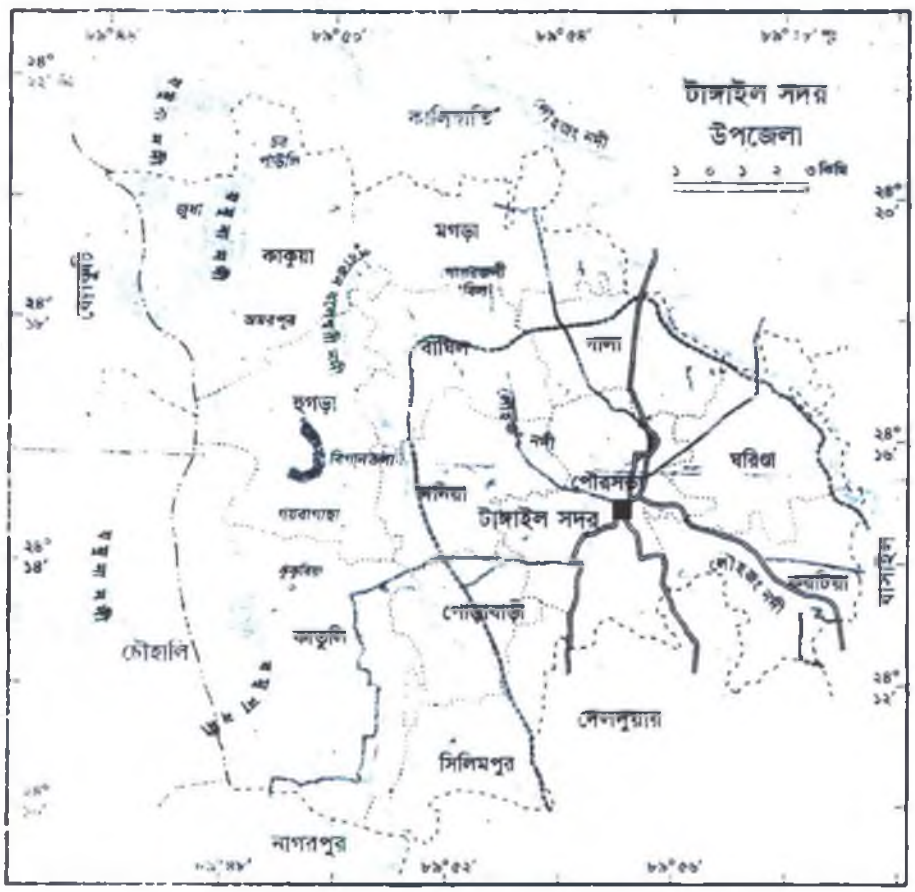

Dhaka University Institutional Repository

কালী মীর্জা

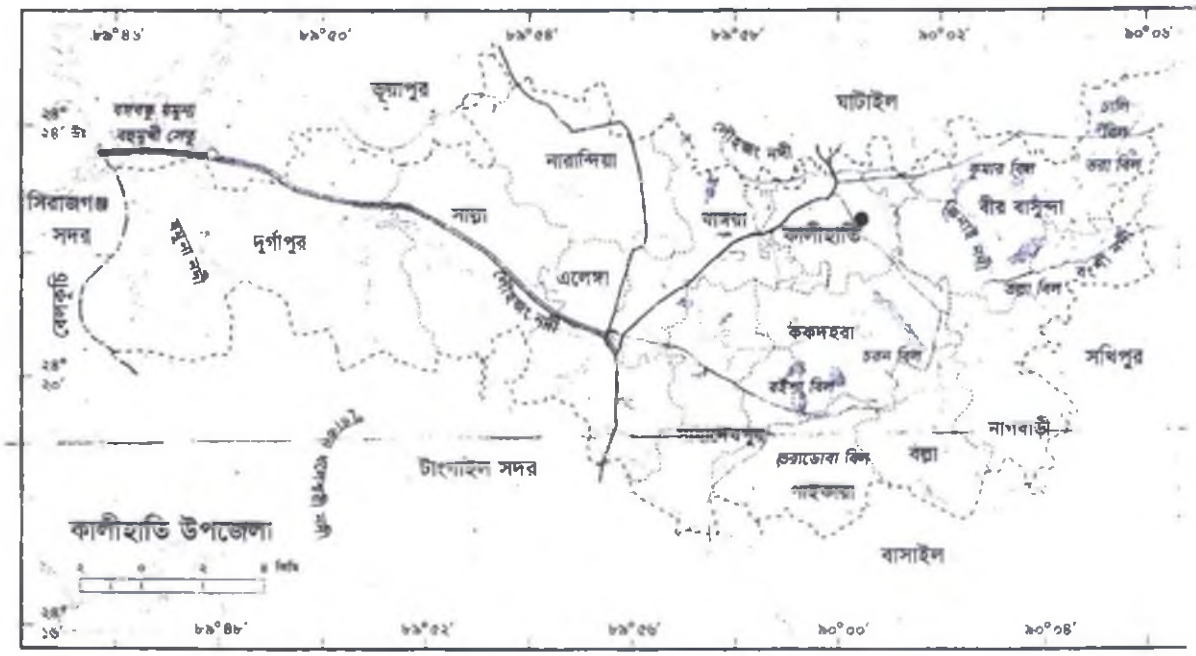

Dhaka University Institutional Repository

রমনা থানা

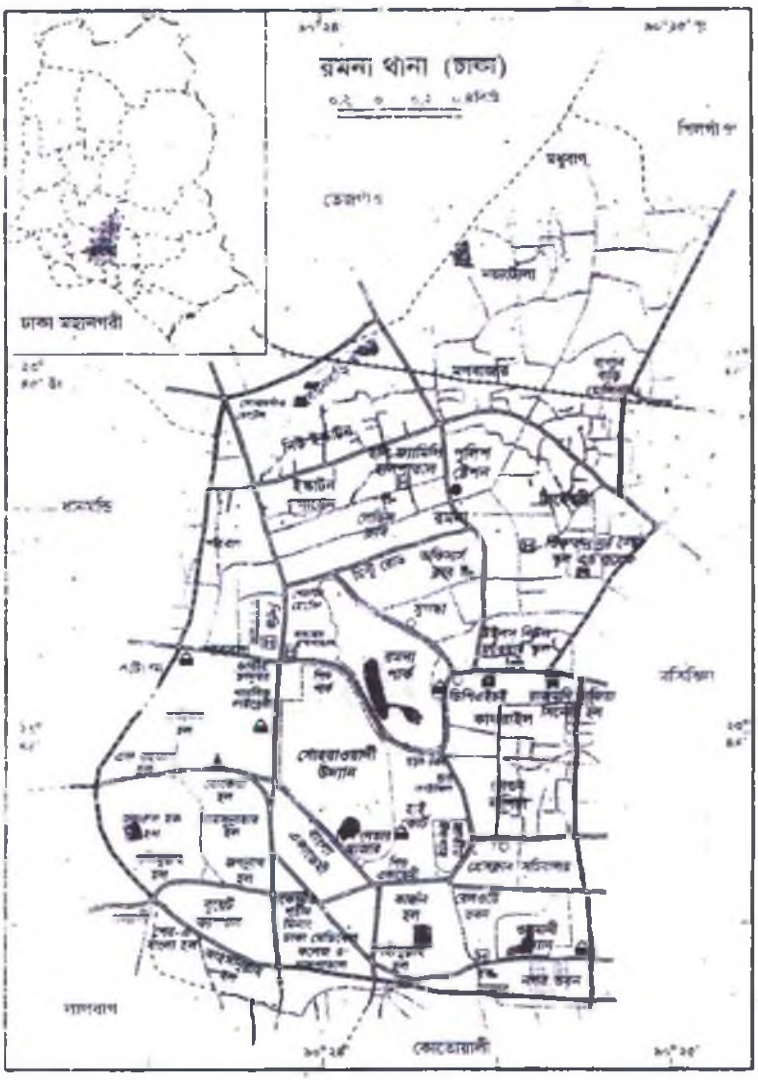

Dhaka University Institutional Repository

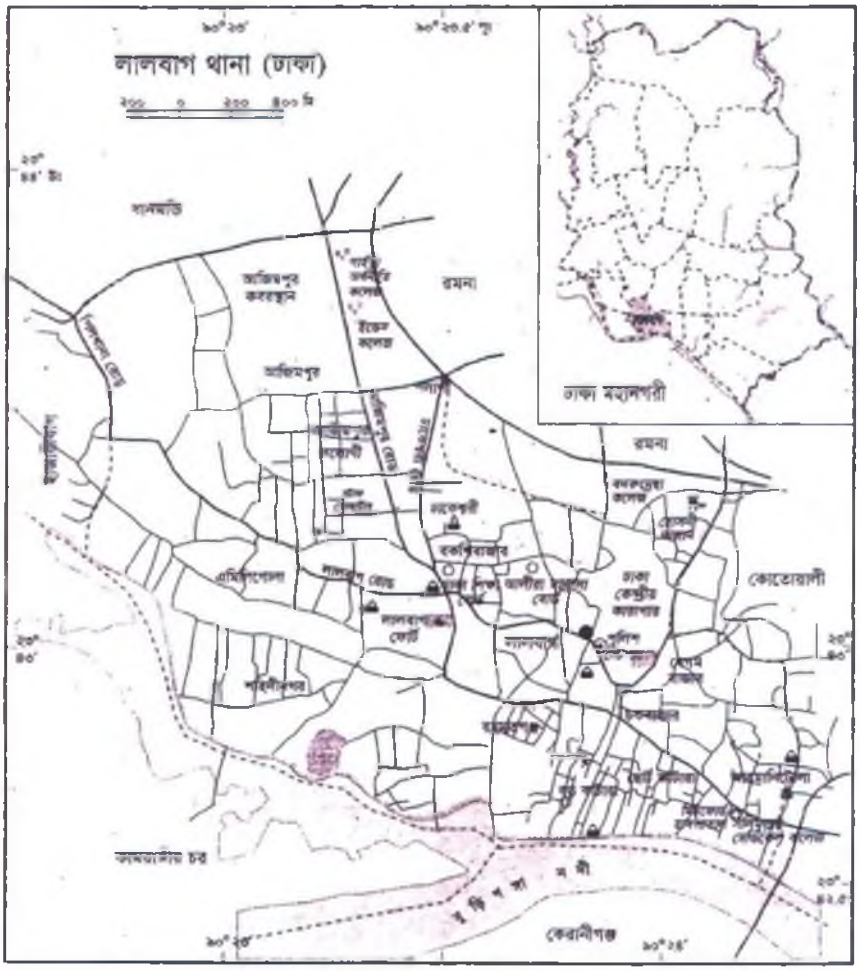

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক কালের কণ্ঠ

২১ আগস্ট ২০১০। বর্ষ ১। সংখ্যা ২৬০।

দৈনিক প্রথম আলো

৫ মে ২০১০। বর্ষ ১২, সংখ্যা ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

জার্নাল সাপ্তাহিক আপামী,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৮ নভেম্বর ১৯৯১।

CRIME AGAINST HUMANITY
Political Persecution
DOCUMENTS
October 3- December 31. 2001

Dhaka University Institutional Repository

জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ৮ নভেম্বর ১৯৯১।

CRIME AGAINST HUMANITY
Political Persecution
DOCUMENTS
October 3- December 31. 2001

Dhaka University Institutional Repository

CRIME AGAINST HUMANITY
Political Persecution
DOCUMENTS
October 3-December 31.2001

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী ..... পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় **১-১২**

- ভূমিকা
- গবেষণার পরিধি
- গবেষণার উদ্দেশ্য
- আনুষাঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা
- গবেষণার পরিচালনা পদ্ধতি
- গবেষণা এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা
- গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায়
- গবেষণার সীমাবদ্ধতা
- বাংলাদেশের মানচিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায় **১৩-৪৩**

- সন্ত্রাসের প্রাথমিক পটভূমি
- সন্ত্রাসের সংজ্ঞা
- রাজনীতিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা
- সন্ত্রাসের কারণ
- রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রকারভেদ
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস ও গতিধারা
- রাজনীতিতে আর্মড্ ক্যাডার।

তৃতীয় অধ্যায় **৪৪-৬১**

- বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস অবস্থা পর্যালোচনা
- বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস প্রবণতা
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনামলের প্রেক্ষাপট :১৯৭২-২০১০ সাল পর্যন্ত
- বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসকের আমলের সন্ত্রাস।

চতুর্থ অধ্যায় **৬২-৭৪**

- সন্ত্রাস বিএনপির শাসনামল।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ৭৫-৯৮

- সন্ত্রাস ও আওয়ামীলীগ শাসনামল
- সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৯৯-১২০

- বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড :১৯৭৪-২০১০ সাল পর্যন্ত ।

সপ্তম অধ্যায় ১২১-১৪৪

- সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন
- আন্তঃ মহাদেশীয় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক
- ধর্মীয় সন্ত্রাস ও প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম
- রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তথা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস
- বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

পরিশিষ্ট- ১ .....১৪৫-১৫৬

- প্রশ্নমালা জরীপে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষনমূলক ফলাফল

পরিশিষ্ট- ২ .....১৫৭-১৬৪

- জরীপ প্রশ্নমালার নমুনা
- উপসংহার
- সন্ত্রাস নির্মূলে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা
- গ্রন্থপঞ্জি ১৬৫-১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

- **ভূমিকা ঃ**

বাংলাদেশ আজ স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিতি আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু স্বাধীন দেশের মর্যাদা বাংলাদেশ এমনিতেই পাইনি। স্বাধীন দেশের মর্যাদা অর্জনে বাঙালী জাতিকে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির, অনেক নারীকে তাদের সম্ভ্রম হারাতে হয়েছে, ধর্ষিত হতে হয়েছে লাখো মা বোন কে। অনেক কিছুর বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম সবুজ শ্যামলের ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের এক স্বর্ণালী ভূখন্ড। আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে গর্বিত নাগরিক। স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্ম প্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশ নানা ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতার নায়করা একে একে রাজনৈতিক হত্যার শীকার হয়েছেন। যা কিনা স্বাধীন বাংলাদেশের ভূখন্ডে কালিমা জনক অধ্যায়ের ইতিহাস। তা সত্ত্বে বীরের জাতি বাঙালি হিসেবে যে খেতাব আমাদের রয়েছে তা যেন আমাদের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা পদপিষ্ট করে সামনে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বহুল আলোচিত বিষয়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে এটা এক সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার কারণে গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, নেতৃত্ব সংকট জাতি গঠনে জটিলতা ঐতিহ্য গড়ে না উঠায় এসব দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বর্তমান সময়ে সন্ত্রাস ব্যাপক রূপ ধারণ করে বিশ শতকে। যা থেকে আমাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজ করছে। সন্ত্রাস এক ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি যা আমাদের উন্নয়ন পথে এক বিরাট অন্তরায়। এতে করে শুধু রাজনীতিই নয় অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো সমভাবে আক্রান্ত।

সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন তত্ত্বের পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ অত্যন্ত জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছে। কেননা, বর্তমান বিশ্বায়নের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদ এক দ্বান্দ্বিক অবস্থান নিয়েছে। বর্তমান পরাশক্তি আমেরিকা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সবচেয়ে বেশি তৎপর।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাস ছেয়ে যাচ্ছে ভয়ানকভাবে। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো যেন প্রতিপক্ষ দলকে নাস্তানাবুদ করার উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিচ্ছে সন্ত্রাসকে। সন্ত্রাসের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ জনতাসহ সকল শ্রেণীর আমলা, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ এমনকি দেশের সরকার প্রধানদেরকে যা কিনা দেশের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সন্ত্রাসের কারণে হত্যা, মৃত্যুহুমকি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও দুর্নীতি বেড়েছে ব্যাপকভাবে। দেশের সরকার প্রধান থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনতাকে ভাবিয়ে তুলছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতি দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্তদের তালিকায় স্থান পাইয়ে দেবার মতো নিকৃষ্টতম অবস্থানে নামিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এনেছে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বিশ্ববাসীর সামনে নুইয়ে দিয়েছে। এ অবস্থার অবসান অত্যন্ত জরুরি দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে সমাদৃত শাসনব্যবস্থা। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিস দেশে সর্বপ্রথম 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত নতুন ধ্যানধারণা একে প্রভাবিত করেছে। এর ফলে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা আরও জটিল রূপ গ্রহণ করেছে। এ কারণে Mobbott মন্তব্য করেছেন যে, "Democracy is the most elusive and ambiguous of all political terms" তবুও আধুনিক বিশ্বে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে গণতন্ত্রের স্থান সর্বোচ্চ। গোটা বিশ্ব আজ গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে গণতন্ত্র মানুষকে মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাসনব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা এক বা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ন্যস্ত না থেকে সমগ্র জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং অধিকাংশ জনগণকে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাকে গণতন্ত্র বলে।

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Democracy'। শব্দটি এসেছে, 'Demos' ও 'Kratos দুটি গ্রিক শব্দ হতে। এ শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে 'জনগণ' এবং 'শাসন' বা কর্তৃত্ব। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন।

গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

অধ্যাপক লিন্ডসের ভাষায়, "Democracy is a theory of society as well as a theory of goverment"

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মতে, Democracy is a government of the people, by the people and for the people"

লর্ড ব্রাইস তার 'Modern Democracies' গ্রন্থে বলেছেন, "যেখানে শাসনব্যবস্থা কোন শ্রেণির উপর ন্যস্ত না থেকে সমগ্র সমাজের সদস্যদের উপর ন্যস্ত থাকে তাই গণতন্ত্র।"

J.S.Mill এর মতে, "রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতায় সকলের প্রবেশাধিকার হচ্ছে গণতন্ত্র।"

অধ্যাপক সিলির মতে, "গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা সেখানে প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।"

অধ্যাপক গিডিংস বলেছেন, "A Democracy may either be a form of government, a form of state; a form of society or a combination of all the three"

অধ্যাপক ম্যাকাইভার বলেন, "গণতন্ত্র বলতে সংখ্যাগরিষ্ঠের বা অন্য কারো দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হওয়ার পদ্ধতিকে বুঝায় না, বরং এটা কে বা কারা করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন উদ্দেশ্যে শাসন করবে, তা নির্ধারণ করারই উপায় বিশেষ।"

Dhaka University Institutional Repository

কার্ল. জে. ফ্রেডারিকের ভাষায়, "রাজনৈতিক ও সামাজিক আনয়নের একটি প্রধান স্বীকৃত উপায় হল গণতন্ত্র।"

সর্বোপরি বলা যায় যে, গণতন্ত্র হচ্ছে সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় জনমত দ্বারা।

❖ **গণতন্ত্রের সফলতার শর্তসমূহ:** তত্ত্বগত বিচারে গণতন্ত্র আদর্শ ও সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে রাজনৈতিক চিন্তাজগতে স্বীকৃত। তবে এর সাফল্যের জন্য কতকগুলো শর্ত পালন করা আবশ্যক। নিম্নে শর্তগুলো আলোচনা করা হল ঃ

১. গণতান্ত্রিক জনগণ ঃ গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সর্বাগ্রে যে জিনিসটির প্রয়োজন তাহল জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারণার উপস্থিতি। Ivor Brown গণতান্ত্রিক ধারণাকে 'an action of will' বলে উল্লেখ করেছেন। গণতান্ত্রিক চেতনাই জনগনকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তার সাফল্যের জন্য নাগরিকদের কাছে বিশেষ যোগ্যতাও দাবি করে। এর পরিবর্তে নাগরিকরাও সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান পায়। লর্ড ব্রাইস মন্তব্য করেছেন, "No government demands so much from citizens as democracy and nonages so much back"

২. একাধিক রাজনৈতিক দল ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যে একাধিক রাজনৈতিক দল এবং বিরোধী দলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একাধিক রাজনৈতিক দল ব্যতীত গণতন্ত্র চলতে পারে না। এছাড়া একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে সরকার সব সময় সর্তক থাকে এবং জনস্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়।

৩. গণতান্ত্রিক পরিবেশ ঃ মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশই হল গনতান্ত্রিক পরিবেশ। এর জন্য প্রয়োজন সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃত ও সংরক্ষণ। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং অন্যায় ও শোষণ গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে। সুতরাং, সমাজতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্য সুনিশ্চিত হতে পারে না।

৪. আইনের শাসন ঃ গণতন্ত্রের সফলতার একটি অন্যতম শর্ত হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে। এতে সকলে সমান অধিকার ভোগ করতে পারব এবং গণতন্ত্র সফল হবে।

৫. গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একান্ত ভাবে অপরিহার্য। স্বাধীনতা মূল্যহীন ও অবাস্তব। অধ্যাপক লাস্কির মতে, "Political democracy is meaningless without economic democracy" সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্য এবং জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গণতন্ত্রের সাফল্যের সহায়ক।

৬. যোগ্য নেতৃত্ব ঃ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ন্যায় নীতি ও বিবেকবোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব গণতন্ত্রের কবর রচনা করে। এছাড়া দুর্বল নেতৃত্বের কারণে বহু দেশেই গণতন্ত্র আজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্রীয় নেতাগণের ন্যায়পরায়ণতা, সততা, উদারচিত্ত, বিবেকবান প্রভৃতি গুণাবলী গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭. সৎ ও দক্ষ সরকারী কর্মচারি ঃ গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সৎ, সুদক্ষ ও উৎসাহী সরকারী কর্মচারী আবশ্যক। গণতন্ত্রে প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে স্থায়ী সরকারী কর্মচারীগণই হল প্রশাসন যন্ত্রের যন্ত্রী। সুতরাং, তাদের সততা, গুনগত যোগ্যতা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার উপর গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।

৮.উপযুক্ত শিক্ষা ঃ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারকে গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলমন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্র হল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন। আর জনগণের অধিকাংশ যদি অশিক্ষিত হয় তবে তাদের পক্ষে যোগ্য ও বিজ্ঞ প্রতিনিধি নির্বাচিত করা সম্ভব হয় না। সেজন্য বলা হয়, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থায় সাফল্যের জন্য জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন।

৯. জনমত ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য শর্ত হল সুস্থ, সবল ও সদাজাগ্রত জনমত। সদা সর্তক এবং সক্রিয় জনমত সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে এবং সরকারকে গণমুখী করে।

১০. সহিষ্ণুতা ঃ পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রাণ। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। এ শাসনব্যবস্থাকে সফল করতে হলে সংখ্যালঘিষ্ঠরা যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নেবে, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠকেও সংখ্যালঘু তথা বিরোধী দলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করতে হবে। এজন্য বলা হয়ে থাকে, "Majority must be granted, Majority should be respected."

১১. সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব ঃ J.S. Mill এর মতে, গণতন্ত্রকে সাফল্য করে তোলার জন্য সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ, জনগণের একটি বিরাট অংশ সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকলে গণতান্ত্রিক সরকার সফল হতে পারে না।

১২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঃ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। অধ্যাপক Bryce যথার্থই বলেছেন, "Democracy needs local-self government as its foundation." স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিবেন্দ্রীকরণ ঘটে। আর জন সাধারণ স্থানীয় শাসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে ব্যাপক সুযোগ পায়।

১৩. লিখিত সংবিধান ঃ হেনরী মেইন, লেকী প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতানুসারে, সংবিধান লিখিত হলে জনসাধারণ সরকারের কর্তৃত্বের পরিধি এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে। ফলে জনগণ সর্তক থাকে এবং সরকার স্বৈরাচারি হতে পারে না।

১৪. সামাজিক ঐক্য ঃ J.S. Mill এর মতানুসারে, জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন গণতন্ত্রের বিকাশের পক্ষে সহায়ক। তাই জনগণের মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যবোধ ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

১৫. ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ ঃ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে সরকারের তিনটি বিভাগকে পৃথক করে দেওয়া হয়। প্রতিটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা পায় এবং জনগণও সুযোগ সুবিধা পায়।

১৬. গণতান্ত্রিক চেতনা ঃ জনগণকে অবশ্যই গণতন্ত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণে ইচ্ছুক ও সমর্থ থাকতে হবে। নাগরিকদের গণতন্ত্র রক্ষায় চরম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. সামাজিক ভারসাম্য ঃ সমাজের জনগণের মাঝে ব্যাপক মাত্রায় শ্রেণীগত বা অনুরূপ ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য থাকলে কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী সরকারের উপর অনুচিতভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

১৮. গণতান্ত্রিক ঐক্য ঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ ও সার্থকতা সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য জনসাধারণকে সাহায্য করে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও নীতির সাথে জনগণের বহুদিনের পরিচয় থাকলে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠলে গণতন্ত্রের সফল প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

১৯. জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য ঃ গণতন্ত্রকে সার্থক করতে হলে প্রত্যেককে ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থের উপরে স্থান দিতে হবে।

২০. গণতান্ত্রিক আদর্শ ঃ সাম্য ও সমানাধিকার হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই গণতান্ত্রিক জনগণকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হতে হবে। লর্ড ব্রাইস মন্তব্য করেছেন, "No government demands so much from citizens as democracy and none gives so much back"

২১. রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ঃ গণতন্ত্রকে সার্থক করে তুলতে হলে নাগরিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে শুধুমাত্র তত্ত্বগত স্বীকৃতি নয়, সেগুলোকে বাস্তবে কার্যকরী করা প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরা করার স্বাধীনতা, সংঘ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, ধর্মের অধিকার ইত্যাদি।

২২. দায়িত্ববোধ ঃ জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। দেশবাসী নিজেদের সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের পরিবর্তে সমাজের সার্বিক ও বৃহত্তর স্বার্থ সাধনের ব্যাপারে যত্নবান হবেন। জনসাধারণের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধন থাকতে হবে।

২৩. শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ ঃ প্রত্যেকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মধ্যে গণতন্ত্রের স্বার্থকতা নির্ভর করে। সাধারণ মানুষের ত্যাগ, চরিত্র ও কর্মদক্ষতা ইত্যাদির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে।

২৪. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ঃ মিলের মতানুসারে, জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন গণতন্ত্রের বিকাসের পক্ষে সহায়ক। জনগণের মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যবোধ ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। সামাজিক ঐক্যবোধ সৃষ্টির স্বার্থে জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য দূর করা উচিত।

২৫. উন্নত কৃষ্টি ঃ উন্নত কৃষ্টি সম্পূর্ণ দেশেই গণতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে এবং আমেরিকার মত শিল্পোন্নত ও উন্নত দৃষ্টিসম্পন্ন দেশে গণতন্ত্র অনেকটা সফল হয়েছে। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

J.S. Mill অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, জনগণকে গণতন্ত্র গ্রহণ করতে, এর সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার করতে এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বে পালনে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই কেবল একটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সাফল্য অর্জন করতে পারে।[১] *কমীন কুমার দাস- দিক দর্শন, প্রকাশনী দিক দর্শন, ঢাকা-২০০৭, পৃষ্ঠা ১৭৫ - ১৭৮।*

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র সমাজ যেন এক বিভীষিকার মধ্য দিয়ে পথ চলছে। প্রতি পদে প্রায় প্রত্যেককে সন্ত্রাসের মুখোমুখি হতে হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভীষণভাবে বিঘ্নিত। প্রাতিষ্ঠানিক শুচিতা নিঃশেষ প্রায়। নেই কোথাও সহযোগিতার আশ্বাস। কোথাও নেই আইনের নিয়ন্ত্রণ। চারদিকে সন্ত্রাসের দাপট। পশু শক্তি যেন সমাজটাকে গ্রাস করতে উদ্যত। আর্ত মানবতার আর্তনাদ সামাজিক ন্যায় নীতির গভীর ঘুম ভাঙ্গাতেও ব্যর্থ। দেশে শিল্প উৎপাদনে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে বাজার সন্ত্রাসের কারণে। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতিহীনতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে পর্যুদস্ত করেছে। কিন্তু যাদের এসব দেখার কথা তাদের চোখে যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম। এ ঘুম ভাঙ্গাবে কে?

দেশের ছ'টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য চেম্বার এবং সমিতির পক্ষ থেকে দেশে বিদ্যমান ভয়াবহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখ করে দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে প্রতিবিধানের জন্যে। তাঁদের কথায় "অপূরণীয় ধ্বংস থেকে সমাজজীবনকে রক্ষা করুন" (Save the social fabric from irreparable damage.) যথাযথ প্রতিবিধানের মাধ্যমে। আইন-শৃঙ্খলার নজিরবিহীন অবনত মান এবং অপ্রতিরোধ্য সামাজিক দূর্বৃত্তায়নে একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। অন্যদিকে তেমনি শিশু ও নারী নির্যাতনের মতো পাশবিক তাণ্ডব, ব্যবসা কেন্দ্রে অসহনীয় সন্ত্রাস এবং ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের ফলে সীমাহীন নিরাপত্তাহীনতার শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে সামাজিক জীবন হচ্ছে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত। তাঁদের মতে এ অসহনীয় অবস্থার জন্যে নির্দিষ্ট কোনো একটি দল দায়ী নয়, কিন্তু এর প্রতিবিধানে সরকারকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, কেননা শাসন-প্রশাসনের দায়িত্ব সরকারের এবং একমাত্র সুশাসন (good governance) এবং আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এর প্রতিবিধান করতে পারে। সমাজে আইনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে তাঁরা সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর নির্ভরশীলতা। রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্বৃত্ত এবং সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সমর্থন লাভের মানসিকতা (Mindset) এ জন্যে প্রধানত দায়ী।

যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক দল ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গড়ে ওঠা এ অশুভ আঁতাতই সমাজে আইনের প্রাধান্যকে নিঃশেষ করেছে। এ অবস্থায় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এক নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই সরকারের প্রতি তাদের এ আবেদন। সরকার যেমন ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ও আর্থিক দুর্নীতি আইনের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে বিশেষ আদালত গঠন করেছে, শিশু ও নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের দ্রুত বিচারকল্পে বিশেষ আদালত গঠনেরও প্রস্তাব তারা দিয়েছেন। ছয়টি বাণিজ্যিক চেম্বার ও সমিতির এ আবেদন যেমন সময়োপযোগী তেমনি যথার্থ। এসব কথা এর পূর্বে আমরাও বলেছি বারে বারে, কিন্তু যাদের কানে পৌঁছানো উচিত সেখানে পৌঁছেনি।

সকলেই জানেন, সন্ত্রাসীর কোনো দল নেই। তাদের নেই নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রতি আনুগত্য। তারা কিছু ক্ষমতার প্রতি অনুগত। তারা অনুগত ক্ষমতা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি। তাদেরকেই সন্ত্রাসীরা গড ফাদার (God Father) হিসেবে গ্রহণ করে। এ জন্যে যে, আইনের শক্ত হাতে তাদের দুর্বল হাতকে ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হলে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে অবস্থানকারী ওই সব গড ফাদার অবিলম্বে যেন ছুটে আসতে পারে তাদের সহায়তায়। ক্ষমতার আবর্তে ভাসমান ওই সব গড ফাদার ক্ষমতাব্যূহে প্রবেশের লক্ষ্যে যখন পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে, নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এসব সন্ত্রাসীদের দুস্কর্মের সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে আসে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে। তাই দু'এর মধ্যে গড়ে

Dhaka University Institutional Repository

ওঠে পোষক-আশ্রিতের (Patron-client) সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই সমাজে দুর্বৃত্তায়নের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এর মূল বড়ো শক্ত। এর মূলোচ্ছেদ করবেন কে?

মাত্র ক'দিন পূর্বে, ২৮ এপ্রিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী ঘটনা ও হল দখলের রাজনীতি সম্পর্কে দীর্ঘ বিবৃতি দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেই বসলেন, সংসদ সদস্যগণ এবং বিরোধী দল একমত হলে সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রধারীদের ক্যাম্পাসে দেখা মাত্র পুলিশকে গুলি করার নির্দেশ দিতেও তিনি প্রস্তুত। এ ধরনের কথাবার্তা বললে মুহূর্তের জন্যে বাহবা পাওয়া যায়। টেবিল চাপড়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণ তাঁকে বাহবাও দিলেন সংসদে। কিন্তু এ ধরনের প্রস্তাব যে কোনো সভ্য দেশে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে বেরোয় না তা তিনি সম্ভবত এতদিনে অনুভব করেছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রীকে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে অনুরোধ করেছেন। বিরোধী দলের নেত্রী কেন, সংসদের কোনো সদস্যও তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করবেন না। সন্ত্রাসী এবং অস্ত্রধারীদের ক্যাম্পাসে দেখামাত্র পুলিশকে গুলি করার নির্দেশ দানের প্রস্তাব অনেককে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রক্তপিপাসু টিক্কা খানের মুক্তিযোদ্ধাদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা মুক্তিযোদ্ধাদের টিক্কা খান চিহ্নিত করেছিলেন দুস্কৃতকারী রূপে। স্বাধীন বাংলাদেশও এক সময় রক্ষীবাহিনীর ওপর এমনি ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ভুক্তভোগীদের তা স্মরণে থাকার কথা। এ ধরনের কথার মাধ্যমে মূল সমস্যাকে আড়াল করা সম্ভব হয়।

সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র গুলি ছোঁড়ার জন্যে পুলিশের ওপর নির্দেশ দেবার কোনো প্রয়োজন থাকে না যদি সন্ত্রাসের মূলে যে পোশাক আশ্রিত ব্যবস্থা কাজ করছে তা উচ্ছেদ করা হয়। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্র কেন দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে? দেখবেন সবগুলো সন্ত্রাসকবলিত প্রতিষ্ঠান প্রায় বিধ্বস্ত, সর্বোচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ জর্জরিত। ২০০৯ সালেবুয়েটের উপাচার্যসহ প্রায় ৭০ শিক্ষক পদত্যাগ করেছেন এবং সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। হত্যা সন্ত্রাস ও হল দখলের তান্ডবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অসহায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ। মহানগরীর শহীদ তিতুমির কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান নির্যাতনের শিকার। এসব কেন ঘটছে, কারা ঘটাচ্ছে? যারা ঘটাচ্ছে, তাদের শক্তির উৎস কি? এসব প্রশ্নের উত্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানেন। কিভাবে তা বন্ধ করা সম্ভব তাও তিনি জানেন। এও জানেন, এজন্যে একটি গুলি ছোঁড়ারও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু নির্দেশের। তারপরেও প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করেন দেখামাত্র পুলিশকে গুলি ছোঁড়ার ক্ষমতা দানের।

জাতীয় সংহতি: জাতীয় সংহতি হচ্ছে রাষ্ট্রে কোন দল বা সরকারের পক্ষে এককভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ জন্যে প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য। শুধুমাত্র জাতীয় ঐকমত্যের প্রচেষ্টাতেই সন্ত্রাসকে ঝুলানো সম্ভব। জাতীয় সমস্যা সমাধানে বিশেষ করে সামাজিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে, জাতীয় ঐকমত্যের কোনো বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ঐকমত্যের কোনো উদ্যোগ কোনো সময়ে গ্রহণ করেননি। বিগত ২২ মাসে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তার একটিতেও ঐকমত্যের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন ঘটেনি। এমন কি ঐকমত্যের সরকারকে শক্তিশালী করতে তিনি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মন্ত্রিত্বের প্রলোভন দিয়ে ভাগিয়ে আনতেও কার্পণ্য করেননি। বর্তমানে জাতীয় স্বার্থবিরোধী পার্বত্য চট্টগ্রামসম্পর্কিত বিলগুলোতে বিরোধী দলগুলোর মুখ বন্ধ করতে জাতীয় সংসদে যে প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে মাননীয় স্পিকারের মাধ্যমে তাও জাতীয় ঐকমত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় ঐকমত্য যদি সেই দুর্লভ সোনার হরিণ হয়ে থাকে এ সমাজে। তাহলে সমস্যাসমূহ প্রতিদিন যেভাবে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে একদিন সমস্যার গুরুভারে সরকার শুধু যে নিঃশেষ হবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ করবে এখনো যেসব গ্রন্থি সমাজজীবনকে সচল রেখেছে তাকেও। এমনি সময়ে বাণিজ্য চেম্বার এবং সমিতিগুলোর আবেদন অত্যন্ত সময়োচিত। সরকারি দলসহ সকল দলের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক। সন্ত্রাসের হাত থেকে সমাজ অব্যাহতি লাভ করুক এবং আইনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক এ মুহূর্তে তাই সকলের কামনা।[২] *এমাজ উদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ রাজনীতি- কিছু কথা ও কথকতা- মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৯ সাল, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯।*

- **গবেষণার পরিধিঃ**

আলোচ্য গবেষণায় যেসব বিষয় সমূহকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমেই ভূমিকা, উদ্দেশ্য ও তথ্যসংগ্রহের কৌশল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক পটভূমি, সন্ত্রাসের সংজ্ঞা, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের নানামুখি ধারা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ধারাবাহিক আলোচনা সাম্প্রতিক সময়ের ঘনটাবহুল সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ইত্যাদি বিষয় সমূহ বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। যা কিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের স্বরূপ তুলে ধরতে সক্ষম হবে বলে আমি একজন গবেষক হিসেবে আশা করছি।

- **গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন এম,ফিল পর্বের গবেষক হিসেবে আমার 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাস' শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছি, কারণ এ বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি এবং আমি ধারণা পোষণ করছি যে, আমার গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশে রাজনীতিতে সন্ত্রাসের যে পরিধি লাভ করেছে তার একটি চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে ছাত্র, গবেষক রানৈতিকবিদ, সরকার, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সর্বপরি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

- **গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ**

১। সন্ত্রাস তথা রাজনৈতিক সন্ত্রাস সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা।
২। বাংলাদেশে যেহেতু সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং রাজনীতিক অঙ্গন এর বর্হিভূত নয়, কাজেই এই সন্ত্রাসের কারণ খুজে বের করা।
৩। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস ও মাত্রা নিরূপন করা।
৪। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পিছনে রাজনৈতিক দলগুলো এবং নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন বা মদদ রয়েছে কিনা তার উপর আলোকপাত করা।
৫। বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে সরকার বিরোধী দল এবং আপামর জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও কর্মকান্ড তুলে ধরার মাধ্যমে সন্ত্রাস দূরীকরণে সম্ভাব্য উপায় সমূহ চিহ্নিত করে রাষ্ট্র দেহ থেকে সন্ত্রাস দূর করা।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ড পরিচালনায় আমাকে উৎসাহী করেছে। তাছাড়া এধরনের গবেষণা পরিচালনা ক্ষেত্রে অনেক সময় উত্তরদাতা তথ্য প্রদানে অনেকটা সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি এলাকার স্থানীয় ও সুপরিচিত হওয়ায় উত্তরদাতারা স্বতুঃস্ফূর্তভাবে উত্তর প্রদান করবে বলে আমার মনে হয়েছে। এছাড়া ঢাকার শাহবাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বর্তমান আবাসন এলাকা হওয়ায় উক্ত এলাকায় আমার পরিচিতি পরিসর অনেকটাই ব্যপ্ত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী এলাকা আজিমপুর ও লালবাগ সম্পর্কে আমার ধারনা রয়েছে। যা কিনা আমার গবেষণা কর্ম পরিচালনায় অনেকটাই সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। যেহেতু ইতিপূর্বে এই বিষয়টির উপরে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার ব্যাপারটি দারুনভাবে অনুভূত হয়েছে। এতদ্সত্বেও আমি আমার নিরলস শ্রম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি পরিপূর্ণ ভাবে সম্পাদন করার প্রয়াস চালিয়েছি। পাশাপাশি আমার তত্বাবধায়ক অধ্যপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীনের সার্বক্ষনিক দিক নির্দেশনা আমার গবেষনা কর্মটি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে আলোর মুখ দেখবে বলে আমি আশা রাখছি।

- **গবেষনার সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায়ঃ**

আমার গবেষণাকর্মটি মোট সাতটি অধ্যায় বিভক্ত হয়ে আলোচিত হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে-১) ভূমিকা ২) গবেষণার পরিধি ৩) গবেষণার উদ্দেশ্য ৪) আনুষাঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা ৫) গবেষণার পরিচালনা পদ্ধতি ৬) গবেষনা এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতা ৭) গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো বা অধ্যায় ৮) গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৯) বাংলাদেশের মানচিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাসের প্রাথমিক পটভূমি ২)সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ৩)রাজনীতিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ৪) সন্ত্রাসের কারণ ৫) রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রকারভেদ ৬) বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস ও গতিধারা ৭) রাজনীতিতে আর্মড্ ক্যাডার।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস অবস্থায় পর্যালোচনা ২) বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস প্রবণতা ৩) বাংলাদেশের রাজনীতিক সন্ত্রাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনামলের প্রেক্ষাপট :১৯৭২-২০১০ সাল পর্যন্ত ৪) বাংলাদেশে স্বৈরচারী শাসকের আমলের সন্ত্রাস।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাস বিএনপির শাসনামল।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাস ও আওয়ামীলীগ শাসনামল ২) সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড :১৯৭৪-২০১০ সাল পর্যন্ত।

সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- ১) সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন ২) আন্তঃ মহাদেশীয় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ৩) ধর্মীয় সন্ত্রাস ও প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম ৪) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তথা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস ৫) বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

পরিশিষ্ট- ১

প্রশ্নমালা জরীপে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষনমূলক ফলাফল

পরিশিষ্ট- ২

জরীপ প্রশ্নমালার নমুনা

সন্ত্রাস নির্মূলে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, পদক্ষেপ ও দিকনির্দেশনা

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

- **গবেষণার সীমাবদ্ধতাঃ**

একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো একজন অভিজ্ঞ এবং দক্ষ গবেষক। যিনি তার দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নির্যাস তার গবেষণা কর্মে ফুটিয়ে তুলবেন। গবেষণা জগতের একজন শিশু শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে আমার সবচেয়ে সীমাবদ্ধতা আমি নিজেই। আলোচ্য গবেষণা কর্মটির মধ্য দিয়েই বাস্তব গবেষণা জগতের আমার হাতে খড়ি। ফলে গবেষণা কর্মের প্রতিটি পর্যায়ে আমার অনভিজ্ঞতা এবং অদক্ষতাজনিত কারণে গবেষণা কর্মের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সমাজ সম্পর্কিত গবেষণা ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যাবলী যাতে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হয় সেদিকে সর্বদা মনোযোগ দেয়া হয়ে থাকে। তবুও অনেক সময় দেখা যায় কতগুলো ভ্রান্তি এড়ানো সম্ভব হয় না। সদাসর্তক দৃষ্টি থাকা সত্বেও বারবার এজাতীয় ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়েছি। দু'একটি ক্ষেত্রে হয়ত এই জাতীয় ভ্রান্তি ঘটেও থাকতে পারে। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।

আমার গবেষণার বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। কিছু সংখ্যক কম শিক্ষিত উত্তরদাতা অসচেতনাতার কারণে আমাকে পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক মনে করে কিছুটা উত্তর প্রদানের বিব্রতবোধ করেছে বা বিব্রত থেকেছে তারা ধরে নিয়েছে আমার সংগৃহীত মতামত তাদের জন্য কিছুটা সমস্যার কারণ হতে পারে। এবং যার মাধ্যমে তাদের জীবন কিছুটা নিরাপত্তাহীন হয়ে দাড়াতে পারে বলে তারা অনুমান করে। যা কিনা আমার গবেষণার বিষয়ে স্বতঃস্ফুর্ত মতামত গ্রহণে অনেকটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

আমার গবেষণার প্রধান বিষয় সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী হওয়ায় তাদের খানা জরিপের মাধ্যমে তাদের সন্ত্রাসী হওয়ার ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস ও পটভূমি সংগ্রহের কাজটি সম্পাদন করা যায়নি। যা কিনা গবেষণা কর্মে কিছুটা ঘাটতি থেকে গেছে।

তথ্যনির্দেশিকা

১। কলীন কুমার দাস, দিক দর্শন- প্রিকাশনী দক দর্শন ঢাকা-২০০৭, পৃষ্ঠা ১৭৫ থেকে ১৭৮।

২। এমাজ উদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ রাজনীতি- কিছু কথা ও কথকতা- মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৯ সাল, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

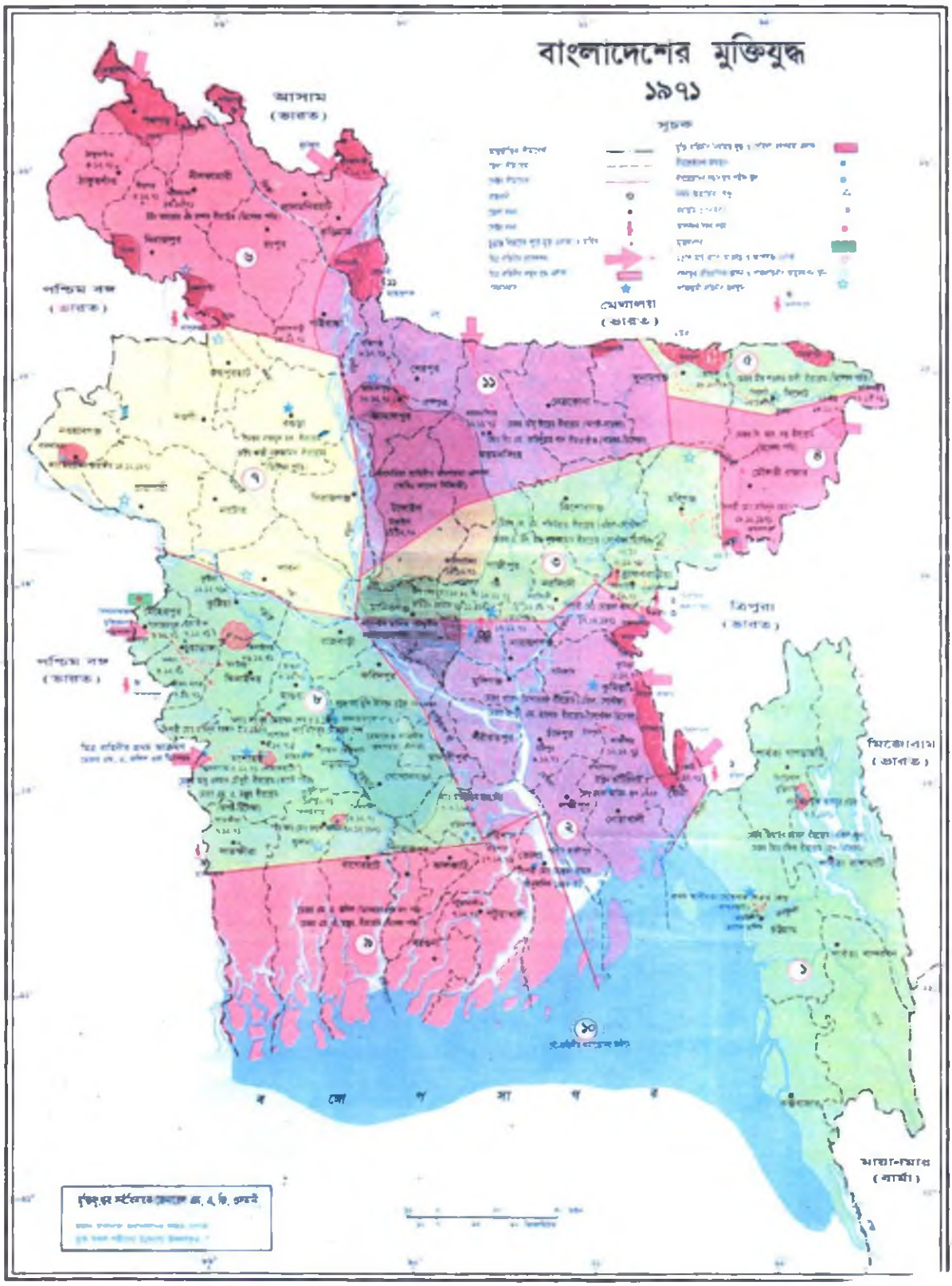

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

• সন্ত্রাসের তাত্ত্বিক পটভূমি ঃ

"সন্ত্রাসবাদ" শব্দটির উদ্ভব হয় ফ্রান্সের ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব চলাকালীন। এ সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু এবং জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে The Regime dela Terror (Reign to Terror) নামে একটি বিশেষ পরিষদ গঠিত হয়। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং সহিংস কর্মকাণ্ডের জন্য এ Terruer রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ঠিক এ সময় থেকেই Terror শব্দটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত অবশ্য শব্দটি পরিচিতি লাভ করেনি। উনিশ শতকের শেষের দিকে রুশ বিপ্লবীরা সারিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধেTerror- কে সহিংস সংগ্রামের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ শব্দটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অত্রএব সন্ত্রাসবাদ সরকারবিরোধী জনপ্রিয় আন্দোলনের জনপ্রিয় হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। যার ধারাবাহিকতা বাংলাদেশে বিদ্যমান।[১] *আবদুল মোতালেব সরকার, অ্যাসিওয়েঞ্জ বিসিএস বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। প্রকাশনী অ্যাসিওরেন্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা -২০০৬। পৃষ্ঠা :৭২৫।*

সন্ত্রাসবাদ বা 'terrorism' -এর সূচনাবিন্দু ফরাসি বিপ্লবের জ্যাকোবিয়ান রাজত্বে নিহিত রয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই শব্দের কোনও legal content বা আইনানুসারি বক্তব্য থাকতে পারে না বলেও অনেকের অভিমত। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রসংঘের ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসের প্রাক্তন বিচারপতি অর. বাক্সটারের মতে, 'We have cause to regret that a legal concept of 'terrorism' was inflicted upon us. The term is imprecise; it is ambiguous' and above all, it serves on operative legal purpose. (A skeptical look at the concept of Terrorism, 1974).

পেরেরা মারফৎ, ১৯৩৬ থেকে ১৯৮১ সাল, এই ৪৫ বছরে বিশ্বের নানা দেশে মোট যত সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে তার চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আলেক্স শ্মিট তাঁর 'পলিটিক্যাল টেররিজম: আ রিসার্চ গাইড' বইতে সন্ত্রাসবাদকে ১০৯ রকম সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, সন্ত্রাসবাদ একটি বা কয়েকটি সূত্রায়িত পথ ধরে চলাচল করছে না। তার পদ্ধতিগত বিকাশ ঘটেছে প্রায় নিত্যনতুন। এই কারণে সন্ত্রাসবাদ শব্দটি ইদানীং বেশি আলোচিত হলেও তা নিয়ে মানুষকে কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে এবং কখনও সমবেতভাবে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট লুই বোর্দোর হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের প্রস্তাবক্রমে এবং লিগ অব নেশনসের উদ্যোগে ১৯৩৭ সালের ১৬ নভেম্বর যে 'Convention of the Prevention and Punishment of Terrorism' অনুষ্ঠিত হয় তা 'সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম'কে সংজ্ঞায়িত করে এই শব্দবন্ধে 'criminal acts directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or group of persons, or the general bublic.'

১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের অ্যাডহক কমিটি অন টেররিজম সন্ত্রাসবাদকে ব্যাখ্যাত করে। 'Any act of violence endangerign or taking innocent human lives or jeopardizing their fundamental freedoms and affecting end.' সংজ্ঞার এই উপর্যুপরি অনুসন্ধান থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ১. সময়ের সাথে সাথে দেশে দেশে

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাসবাদের ছায়া দীর্ঘতর হয়েছে, ২. সন্ত্রাসবাদকে চিহ্নিত করা নিয়ে দোলাচলতাও বেড়েছে।

১৯৭০ দশকের গোড়ায় তদানীন্তন পশ্চিম জার্মানিতে উগ্র বামপন্থী তৎপরতা প্রচুর বেড়ে যায়, বিশেষত রেড আর্মি ফ্যাকশন ও ম্যাডেয়ার মাইনহফ গ্রুপের। স্পেন প্রত্যক্ষ করেছে বাস্ক জঙ্গিদের, ইতালি করেছে রেড ব্রিগেডকে এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে দ্রুত বিকাশ ঘটেছে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পৃথক 'ইলম' রাষ্ট্রের দাবিতে গড়ে ওঠে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকান্ড। ভারতের পাঞ্জাবে শোনা যায় 'খালিস্তান' ধ্বনি। এর পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে প্যালেস্তাইনের দাবিতে সংগঠিত মুক্তি-আন্দোলনের সমান্তরালে গড়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদী প্রয়াস। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর' নামে প্যালেস্তাইনি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর ৯ সদস্য মিউনিখ অলিম্পিকে ইসরায়েলের খেলোয়াড় দলের ৯ সদস্যকে অপহরণ ও বন্দী করেছিল ইসরায়েলে থাকা ২০০ আরব বন্দীর মুক্তির দাবিতে। দেখা যাচ্ছে, সন্ত্রাসের ছায়া ধরে এক দেশের মেঘ কখনও কখনও চলে যায় অন্য দেশেও। এক দেশের বিষয় সংকট সৃষ্টি করে অন্য দেশেও। প্রথম বিন্দুর চেষ্টা থাকে তৃতীয় কোনও বিন্দু দিয়ে দ্বিতীয় কোনও বিন্দুকে ঘায়েল করা।

আবার ভিন্ন চিত্রও আছে। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডনে প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের অন্যতম নেতা সাঈদ হাম্মামি নিহত হন প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই গঠিত আর এক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আবু নিদালের হাতে। এটা সন্ত্রাসবাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বৃহৎ হওয়ার প্রচেষ্টা অন্যর ভূমিতে। এইভাবে স্থানীয় সন্ত্রাস মিশে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসে, আবার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস মাথা গলাচ্ছে স্থানীয় সন্ত্রাসে, যেমন নাগাল্যান্ড বা মিজোরামে, পাঞ্জাবে বা কাশ্মীরে। কিছু মার্কিন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে যাদের হানা বা আক্রমণের শিকার হয়েছে ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন ও ইতালি। শ্রীলঙ্কার লিবারেশন টাইগার্স অব তামিল ইলম বা এল টি টি ই একবার হামলা চালিয়েছিল প্যারিসের বুকেও। লয়েটারপাখট ওপেনহাইম এই পরিপ্রেক্ষিতেই মন্তব্য করেছিলেন, legally, no place which is not the reign of war, may be made a theatre of war.' (International Law, Vol.II)

কোনও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেই দেশের কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তাদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী বা প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্রভূমিকে ব্যবহার করেছে এবং সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সরকার রাজনৈতিক মতলবেই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে মদদ দিয়েছে- এমন ঘটনার সংখ্যা প্রচুর। ১৯৪৫-৪৬ সালে উত্তর গ্রিসে এইরকম এক পরিস্থিতি দেখা দেয়। উত্তরাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলি গ্রিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীগুলিকে সর্বপ্রকার সহায়তা করতে থাকে। গ্রিক সেনাবাহিনীকে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে হয়। ভারও দীর্ঘকাল আগে, ১৯২০-র দশকে আমরা দেখেছি তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্বেতসন্ত্রাস, পশ্চিমা কয়েকটি দেশ অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধ সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলিকে সাহায্য দিয়ে সমাজতন্ত্রী সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করে। আমাদের দেশ ভারত ১৯৭০- এর দশকে শ্রীলঙ্কার জঙ্গি সংগঠন এল টি টি ই এবং ই পি আর এল এফ- কে প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই মদদ দিয়েছিল, তামিলনাড়ুতে তাদের আশ্রয় দিয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে। শ্রীলঙ্কা সরকার তখন এর প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু ভারত তা অগ্রাহ্য করেছে। ১৯৮০-র দশকে পাঞ্জাব এবং ১৯৯০- এর দশক থেকে অদ্যাবধি কাশ্মীরের প্রেক্ষিতে এই দৃষ্টান্তেরই অন্যতম সংযোজন হল পাকিস্থান, যে পাকিস্তানি জঙ্গি ও কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়ে, প্রশিক্ষিত করে, ঢালাও অস্ত্র সাহায্য দিয়ে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়েছে। আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদী তালিবানদেরও মদদ দিয়েছে পাকিস্তান। এইভাবে সন্ত্রাসবাদের শাখা-প্রশাখায় ঢুকে পড়ে 'ফরেন এলিমেন্ট'। এবং এই ফরেন এলিমেন্টকে চেনার জন্য একটু গভীর অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে, সেখানে সিংহভাগ জায়গায় ডানা মেলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনে কিংবা নানা বিশ্ব সম্মেলনে বারবার এই অন্য দেশের সন্ত্রাসবাদী দলদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রস্তাব উঠেছে, কিন্তু যখনই দেখা গেছে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই সন্ত্রাসের উৎসস্থল তখনই স্তব্ধ হয়ে গেছে সমস্ত কলরব।

পেরেরা অতঃপর সন্ত্রাসবাদ থেকে একটু সরে এসে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে চিহ্নিত করেন চতুর্থধারায়: (a) resort to indiscriminate forms of violence by individuals or groups, (b) for agitational purposes, to secure a political objective, (c) which endangers innocent civilians or states not parties to a conflict, (d) which is characterised by the presence of a foreign element.

এত কিছুর পরেও কিন্তু সন্ত্রাসবাদের নির্দিষ্ট কোনও 'সংজ্ঞা' উঠে আসেনি। কারণ কোনটাকে আমরা সন্ত্রাস বলব আর কোনটা স্বাধীনতাযুদ্ধ বা মুক্তিসংগ্রাম, এই বিভাজনরেখা টানা যায়নি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা চেষ্টাতেও। কারণ যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে 'বৈধ' (রাষ্ট্রসংঘের ভাষ্য অনুযায়ী) হতে পারে, তাহলে স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচিকে অমর্যাদা বা ঘৃণা করা হবে কেন, বিশেষত স্বাধীনতা যখন যে কোনও মানুষ, জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের পবিত্রতম অধিকার? সন্ত্রাস-চিহ্নিতকরণ নিয়ে এই ভ্রান্তি, জটিলতা, দ্বিধাগ্রস্ততা বেশি করে দেখা দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, এবং আরও ব্যাপকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে, যখন সারা বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মুক্তি সংগ্রাম। এর মধ্যে প্রখরতর প্রয়াস হল প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের বা পি.এল.ও.-র স্বাধীন প্যালেস্তাইন গঠনের জন্য লড়াই এবং সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকান পিপলস অর্গানাইজেশন বা সোয়াপোর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এবং গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এই দুই সংগঠনের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা অর্জন করে। 'According to their perception, such acts constitule legitimate acts of self-defence, and only acts committed for personal gain could constitute acts of terrorism. On the other hand, in view of the West European states and the United States, all violent acts, irrespective of cause, which endanger the non-combatant innocent civilian constitue acts of terrorism. Thus, according to this view, politically motivated violence, if it constitutes a danger to the innocent eivilian, constitutes an act of terrorism.' (A.R. Perera).

এশিয়ান-আফ্রিকান লিগাল কনসালটেটিভ কমিটি ১৯৮৯ সালে একটি রিপোর্ট তৈরি করে, যার বিষয় হল সন্ত্রাসবাদ এবং স্বাধীনতা বা জাতীয় মুক্তির জন্য গণসংগ্রামের মধ্যে পার্থক্যরেখা নিরূপণ করা। এই রিপোর্টে বলা হয় : 'Violent act or acts or attempts of such acts, perpetrated by states or individuals or groups of individuals against innocent civilian or national of states not involved in on-going conflict, calculated to cause fear and panic to the general public and intended to coercc a state or an institution to conform to a cause of conduct dictated by political considerations of the proparators.'

সন্দেহ নেই, এই দীর্ঘ শব্দবন্ধের মধ্যে যথেষ্ট কুশলতা এবং সূক্ষ্মতা রয়েছে যা পার্থক্যরেখা নিরূপণের পরিবর্তে দুইয়ের অবস্থানকে বেশ ঘোলা করে দেয়। এই সময়কালে একটি চমৎকার শব্দের আমদানি ঘটে এই পরিবৃত্তে, 'common crime'. যার উদ্যোক্তা

Dhaka University Institutional Repository

রবার্ট এ. ফ্রিডল্যান্ডার। তার মতে, সন্ত্রাসের কোনও বৈধ বা আইনি সংজ্ঞা হয় না। মুক্তিসংগ্রামও যদি সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় তাহলে সেটাও Common crime'. তার কথায়, It is not necessary to have an exact legal definition, if terrorism is dealt with as a common crime. Thus a precise legal formulation need not be required in order to confront the terrorist mensce, for the preservation of societal and world order.' (Terrorism- Encyclopaedia of Public International Law, 1986)

বলা বাহুল্য, এই তত্ত্ব-বাক্যকে পশ্চিমা দুনিয়া লুফে নিল, এবং এই তত্ত্বকে সামনে রেখে একের পর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে, যার প্রধান উদ্যোক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাউন্সিল অব ইউরোপ এবং সার্ক এই তত্ত্বকেই মেনে নিল, এবং একই ভাষায় কথা বলল ইন্টারন্যাশনাল ল অ্যাসোসিয়েশন। অতঃপর সন্ত্রাসবাদ, বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে মার্কিন ভাষ্যই হয়ে দাঁড়াল বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক ও আধিপত্যকামী দেশগুলির মুখের বুলি। মানুষকে মুক্তি দেওয়ার নাম করে মুক্তিসংগ্রামকে সন্ত্রাসবাদ নামে চিহ্নিত করে জন্ম নেয় আর এক সন্ত্রাসের ধারা। যাকে পরবর্তীকালে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' নামে।

তবে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার খোঁজপুর্বে এশিয়ান-আফ্রিকান লিগাল কনসালটেটিভ কমিটির দীর্ঘ রিপোর্টের একটি অংশ, কিছুটা দীর্ঘ মনে হলেও বোধহয় উদ্ধৃত করা দরকার: 'It may be observed that in the absence of an universally acceptable definition of terrorism. the recent trend in to spccity several international crime as terroristic act, and extraditable offences. Yet with all these frantic efforts an international level the world is still very far away from a general and universally acceptable convention on international terrorism. The difficulties arise from the emotive nature of the conecpt itself which has led to a fundamental disagreement on the difmition and the scope of the acts to be included, and in particular, whether and to what contxtent the concept should apply to regionally and internationally recognized national liberation movements. It has been very aptly observed that terrorism is historically misteading and politically loaded term which invited conceptual and ideological dissonance...'

কার্যত ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৭তম অধিবেশনে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যে গভীর মতপার্থক্য দেখা দেয় তার ধারা আজও প্রবাহমান। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমি সহযোগী দেশগুলি, অন্যদিকে নির্জোট দেশগুলি বাতিল করে দেয় এই যুক্তিতে যে, এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদের 'কারন' সম্পর্কে ন্যূনতম ব্যাখ্যা নেই। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের 'কারণসর্বস্ব' ব্যাখ্যায় পূর্ণ থাকার অভিযোগে আলজিরিয়া ও অন্যান্য নির্জোট দেশের খসড়া প্রস্তাবকে খারিজ করে দেয় মার্কিন জোট। তবে শেষপর্যন্ত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় (Resolution 3034) তাতে সন্ত্রাসবাদ ও মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে একটি বিভেদ স্পষ্ট উল্লেখিত হয় এবং মুক্তিসংগ্রামের বৈধতা স্বীকৃত হয়। ঔপনিবেশিক, বর্ণবাদী ও বিদেশি শক্তির শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির মরিয়া ইচ্ছা যে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম কারণ সে কথাও জানানো হয়। স্বভাবতই এই সূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ আবার এসে পড়ে। ১৯৭৩ সালে Ad Hoc Committee on International Terrorism গঠিত হয় ৩৫টি দেশ নিয়ে যার কাজ নির্দিষ্ট হয়: (১) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের

Dhaka University Institutional Repository

সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, (২) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কারণ অনুসন্ধান করা ও (৩) আন্তর্জাতিজ সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের উপায় সম্বন্ধে সুপারিশ জানানো। এখানেও বড় বিরোধ দেখা দেয় পশ্চিমি ও নির্জোট দেশগুলির মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে এবং এই সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়োজন আছে কি না, এই প্রশ্নে। প্রস্তাবের পর প্রস্তাব জমে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বিতর্কও, যা অমীমাংসিত থকে যায়।

তবে আলজিরিয়া, বারবাডোজ, ভারত, ইরাক, নিকারাগুয়া, মায়ানমার (তদানীন্তন বার্মা), সিরিয়াল আরব রিপাবলিক, তিউনিসিয়া, ভেনিজুয়েলা, যুগোস্লাভিয়া, জায়রে ও জাম্বিয়া, এই কয়েকটি নির্জোট দেশ সম্মিলিতভাবে যে ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ওয়ার্কিং পেপারে সন্ত্রাসবাদের কারণকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

1. Causes of political character-
   I. Colonialism and maintenance of colonial domination;
   II. Racism, racial discrimination, policy of apartheid and genocide;
   III. Aggression, use of the political independence, national sovereignty and territorial integrity of states; and
   IV. Occupation of foreign territories and foreign domination of the territories and their people.

2. Cause of and economic and social character-
   I. Resistence of an unjust and inequitable international economice order;
   II. Foreign exploitation of the natural resources of a country;
   III. Existing political, social and economic unjustices and exploitation; and
   IV. Poverty, hunger, misery, frustration etc.

১৯৭০- এর দশক থেকে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ কঠোরতর চেহারা নেয়, যার সূচনা ৬০-এর দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে। ফলে সন্ত্রাসবাদের কারণসমূহের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা তার সীমান্তবর্তী দেশ অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, বতসোয়ানা, লেসোথো, জিম্বাবুয়ের ওপর বেধড়ক আক্রমণ চালায়; প্যালেস্তাইন মুক্তিসংগ্রামের ওপর যুদ্ধাভিযান চালায় ইসরায়েল; নিকারাগুয়া ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিরুদ্ধ-মতবাদী সরকার পতনের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তারা সন্ত্রাসবাদী সেনা নামায়। এর প্রতিক্রিয়ায় দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সাথে সাথে সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপও বাড়তে থাকে। বিশেষত কূটনীতিক অপহরণ ও হত্যা, বিমান ছিনতাই ইত্যাদি। ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই ঘটনার উদ্বেগজনক প্রতিফলন ধরা পড়ে।

কিন্তু বিশ্ব তখন নানা নতুন ভূগোলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে ওয়েষ্ট ইউরোপিয়ান গ্রুপস বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমি দেশগোষ্ঠী, নির্জোট আন্দোলনভুক্ত দেশসমূহ, ইসলামিক কনফারেন্সভুক্ত দেশ, আফ্রিকান ইউনিটির কমিউনিটি, অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস, অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ- ইস্ট এশিয়ান নেশনস বা সার্ক, সাউথ- এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন। সন্ত্রাস আশ্রয় নিতে থাকে বিভিন্ন দুর্গের প্রকারেঃ মুক্তিসংগ্রাম, গোষ্ঠীকর্তৃত্ব, ধর্মীয়-আধিপত্য, বিচ্ছিন্নতাবাদ,

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িকতাবাদ ইত্যাদির শাখায় শাখায়। সর্বোপরি ক্রমস্ফীতকায় হতে থাকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।[২] *রথীন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। নাটমিত্রা। কোল লোকনাথ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-১১-১৮।*

- **সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ঃ**

আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদের সর্বজনস্বীকৃত কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণই করা যায়নি। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদের প্রকাশ ঘটেছে নানা সময়ে নানাভাবে। চরিত্রের সঙ্গে তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার চেহারাও পরিবর্তিত হয়েছে। মৃত্যু-হত্যা-আতঙ্ক-ধ্বংস, এগুরি সন্ত্রাসের সাধারণ উপাদান হলেও নিছক হিংসার প্রাকারে তাকে চিহ্নিত করা যায় না। বিশেষত কোনও দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ ও যুদ্ধে আমরা যে হিংসাকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। সন্ত্রাসবাদের মধ্যে যে হিংসা, যে হুমকি আছে তার মধ্যে যেমন পদ্ধতিগত প্রকরণের উপস্থিতি অত্যন্ত নিটোল, তেমনই তার পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক বিকাশও সুনিপুণ 'দ্যা পলিটিক্স অ্যান্ড ভায়োলেন্স (১৯৬৮) বইতে লিডেন ও শ্মিট লিখেছেন : সন্ত্রাসবাদ হল।

'The creation of an atmosphere of despair that breaks down the resistance of those who need to be persuaded they are to be shocked and numbered, so weakened and domoralized and so pessimistic of hope that they become amenable to anything that promises release from tension.'

হিংসার এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম পরিচয়। হত্যাকান্ডে হিংসা আছে, দাঙ্গায় হিংসা আছে, যুদ্ধেও হিংসা আছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের হিংসা বিস্তারিত নানা সর্পিল রেখায়।

'Terrorism which is of concern to the international community, deals with acts of violence:

(i) which are politically motivated and are directed towards the achievement of a political objective;

(ii) which involve indiscriminate violence on 'innocent' civilians' and

(iii) which involve a 'foreign element'; i.e. 'a foreign perpetrator' 'a foreign victim' or 'foreign territory ' (International Terrorism, A.R.Perera).

সন্ত্রাসবাদ সব সময়েই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রসংঘে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এক দীর্ঘ অধিবেশনে কানাডার ডেভিড এম. মিলার বলেছিলেন: 'However it should be

Dhaka University Institutional Repository

acknowledged thhat the acts of international terrorist which are the most intractable are those which are polititcally motivated and rooted in acute situation of misery, frustration, grievance and despair.'

শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি সি. ভব্লিউ পিল্টো বলেছিলেন : 'What me must consider here are acts of terrorism for the demonstration or achievement of political objectives..... the current initiative which finds expression in the item under discussion has to do with agitational terror.'

এই অধিবেশনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন বিদেশ সচিব জর্জ পি. শ্যলজ বলেন: 'We describe it as the use of threat or violence for political purpose to create a state of fear, which will cause individuals, groups or Governments to alter their behaviour or policies.'

শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি তাঁর ভাবণে জনৈক লেখকের উদ্ধৃতিতে বলেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ হল, 'a symbolic act disigned to influence political behaviour by extra-normal means, entrailing the use of threat of violence.'

শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি পিল্টোর ভাবণে একটা নতুন শব্দ আছে: 'agitational terror' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পেরেরা বলেছেন, 'Instances of such 'agitational terror' would be where terrorism is resorted to with a view to the rejeection or peaceful means of redress in political conflict, or the jeopardizing of ongoing political negotiations which have been set in motion to resolve political conflicts. In such instances 'agitational terror' becomes the chosen option of the terrorist to achieve maximum political concessions, rejecting the path of compromise and political accommodation.'

এই ব্যাখ্যার মধ্যে 'অ্যাজিটেশনাল টেরর'-এর সপক্ষে এক ধরনের বৈধতার সওয়াল যেন শুনতে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অ্যাজিটেশনাল টেরর (ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গি তৎপরতা) এবং অ্যাক্ট অব টেররের (নিউ ইয়র্কে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস) মধ্যে একটা স্বচ্ছ পার্থক্যরেখাও যেন দেখতে পাওয়া যায়। যদিও অ্যাক্ট অব টেররের মধ্যেও হালকা এবং গভীর দুটো পর্যায়কে আমরা প্রত্যক্ষ করি; একটি হল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন; অপরটি হল

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, কিন্তু ইনডাইরেক্ট অ্যাকশন। তবে সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সব সময়েই কিছু রাজনৈতিক উপাদান থাকে যা অন্যান্য হিংসা থেকে সরিয়ে তাকে পৃথক সংজ্ঞা দেয়।

এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সন্ত্রাসবাদীরা পদ্ধতি হিসাবে অবলম্বন করে থাকে 'indiscriminate violence' বা নির্বিচার হিংসা। আর লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে 'innocent civilian' বা নিরীহ নিরপরাধ নাগরিকদের । এই দুইয়ে মিলে যে, 'indiscriminate use of violence on innocent civilians' ঘটে থাকে তা যে শুধু হিংসাশ্রয়ী অপরাপমূলক কাজ থেকেই সন্ত্রাসবাদকে পৃথক করছে তা নয়, বৈধ সামরিক ক্রিয়াকলাপ এবং সাধারণ যুদ্ধ থেকেও স্বাতন্ত্র্যে ও ভিন্নতায় চিহ্নিত করছে।[৩] *রঞ্জীন চক্রবর্তি, সম্পাদক। নাটচিন্তা। বেঙ্গল লোকনাথ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-৯-১১।*

ম্যাসাচুসেট্সের হ্যাম্পশায়ার কলেজের একদা এমিরিটাস অধ্যাপক ইকবাল আহমদ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদীরা বদলায়। আজকের নায়ক গতকালের সন্ত্রাসবাদী। আবার গতকাল যে নায়ক ছিল, আজ সে সন্ত্রাসবাদী। এটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার যে, প্রতিনিয়ত ভোল পালটানোর দুনিয়াতে আমাদের মাথা উঁচিয়ে রেখে বুঝে নিতেই হবে, কোনটা সন্ত্রাসবাদ, কোনটা নয়। ১৯৯৮ সালে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে এই ভাষণ দিতে গিয়ে ইকবাল আহমদ বলেন, ১৯৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর তদানীন্তন মার্কিন বিদেশ সচিব জর্জ শ্যলজ নিউ ইয়র্ক পার্ক অ্যাভেনিউ সিনাগগে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা থেকে সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা উঠে আসে, শ্যলজের ভাষায় তা হল:

১. সন্ত্রাসবাদ হল একটি আধুনিক বর্বরতা।

২.সন্ত্রাসবাদ হল রাজনৈতিক হিংসার একটি রূপ।

৩.সন্ত্রাসবাদ হল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এক হুমকি।

৪.সন্ত্রাসবাদ হল পশ্চিমি নৈতিক মূল্যবোধের পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদ।

ইকবাল আহমদের সঙ্গে এখানে আমদের দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই যে শ্যলজের এই ব্যাখ্যার কোনওটাই সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার ন্যূনতম প্রকাশ ধারণ করে না। বরং সন্ত্রাসবাদের প্রতিরোধের জন্য আবেগসর্বস্ব সাম্প্রদায়িক কিছু প্রচার আছে যা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদেরই প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তোলে। এই প্রচার অত্যন্ত পরিকল্পিত। দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ তীব্র ও তীক্ষ্ণতর হয়েছে। বাধা এলেই, প্রতিবাদ তুললেই তা চিহ্নিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদে । প্রতিবাদী ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের এই যে সুসংগঠিত প্রচার তার বৈশিষ্ট্য হিসাবে ইকবাল আহমদ ছ'টি বিষয়কে চিহ্নিত করেন: ১.

Dhaka University Institutional Repository

আবেগকে উস্কে দেওয়ার মতলব, ২. সন্ত্রাসবাদের কারণ অনুসন্ধান না করা, ৩. সন্ত্রাসবাকে নির্মূল করার জন্য বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পাশ্চাত্য দেশসমূহই তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে পৌঁছে যাওয়া দরকার তা প্রতিষ্ঠা করা, ৪. কে সন্ত্রাসবাদী ও কে সন্ত্রাসবাদী নয় তা নির্ধারণ করবে পশ্চিমি শক্তিধরবা, ৫. সরকার অনুমোদিত সন্ত্রাসবাদকে প্রশংসা করতে হবে। যেমন এক প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট গর্বের সাথে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি একজন কন্ট্রা'। কন্ট্রা অর্থাৎ কোনও দেশের কোনও বিরুদ্ধবাদী সরকারে পতন ঘটানোর জন্য যারা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দেয় এবং সন্ত্রাসে নিযুক্ত হয়। এই সন্ত্রাস সৃষ্টি করা অন্যায় নয়।

সংক্ষেপে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, সন্ত্রাস হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আতঙ্কিত করা। ল্যাটিন শব্দ 'টেরির' যার সাধারণ অর্থ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে (১৭৯৩-৯৪ সালে) ফরাসি রাজনীতির ভয়ঙ্কর শাসনকাল হিসেবে অভিহিত সন্ত্রাস।

দি টার্ম 'টেরিজম' বা সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞায় আরো বলা যায় যে, ক্ষমতা ও প্রভাবের বলয় তৈরির উদ্দেশ্য কতিপয় গ্রুপ কর্তৃক ধ্বংসাত্মকমূলক সহিংসতার প্রচেষ্টা সন্ত্রাসী গ্রুপের সদস্যরা যদিও সরকারি পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর অনুপাত অনুযায়ী ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে না। তথাপি তাদের সংখ্যায় আদর্শগত লক্ষ্য, অভবিতব্যতোর কারণে তারা প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি সাধনের শক্তি অর্জন করে থাকে।[৪] *রঞ্জিন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। পাঠচিত্রা। বেঙ্গল লেকচার প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-১৮-১৯।*

- **রাজনীতিতে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ঃ**

রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের আলোচনায় বলা যায় যে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে- স্বাধীনতা যুদ্ধে কৌশল এবং গেরিলা যুদ্ধের নীতি। গেরিলা প্রত্যয়টি স্প্যানিশ যা মূলত নির্দেশ করে অবৈধ লোকের গোষ্ঠী যারা আঘাতসহ কৌশলে জীবনযাপনে বাধা বিঘ্নতায় সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগকৃত। অধিকন্তু, জাতীয় নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিকে দিকভ্রান্ত ও আঘাতসহ অন্তর্ঘাতমূলক কার্যাদিও সম্পন্ন করে থাকে।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় আরও বলা যায়, সন্ত্রাস হচ্ছে-রাজনৈতিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য এবং যথোপযুক্ত জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্তে অগ্রণী হয়েই রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা কাজ করে থাকে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা প্রায়শই রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান করতে জোরপূর্বক ভয়ভীতির বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সাধন করে থাকে।

সন্ত্রাস এখন বাংলাদেশের সমাজে এক নশ্বর সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ত্রাসের কথা বলছেন, বলছেন বণিক ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিরাও। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রাসের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এরই মধ্যে পত্র-পত্রিকায় সন্ত্রাস সম্পর্কে অসংখ্য লেখাও প্রকাশিত হয়েছে। সন্ত্রাস লাভ করেছে প্রবল পরাক্রমশালী এক দানবের রূপ। হাজারো আন্তরিক উদ্যোগ উপেক্ষা করে সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। প্রবল প্রতাপে সব কিছুকে তছনছ করে ফেলছে। সবাই এর প্রতিকার চাই, কিন্তু কিছুই করতে পারছেনা সন্ত্রাসের কাছে সবাই যেন অসহায়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সন্ত্রাসকে কি বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়? দেখা কি সঙ্গত ? জানি না। এ নিয়েও রয়েছে নানা মতভেদ। রাজনৈতিক সাহিত্যে সন্ত্রাস (Violence) সম্পর্কেও গড়ে উঠেছে বিস্তৃত এক অধ্যায়। খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হান্টিংটনের (Samuel P. Huntington) মতে, সন্ত্রাস হলো এক প্রকার সামাজিক বিচ্যুতি।

এ ধরনের সমাজে বিধি বিধানের মূল শিথিল। নিয়ম নীতি ভঙ্গুর। আইনের প্রতি আনুগত্য অত্যন্ত নিম্নমানের। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। জনগণের আশা আকাঙ্খা ধারণ করতে সক্ষম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এখনো প্রাথমিক স্তরে। সর্বজনস্বীকৃত মূল্যবোধ ক্ষয়িষ্ণু। ফলে সামাজিক শক্তিগুলো পরস্পরের মুখোমুখি । প্রতিযোগিতায় যেহেতু নেই সর্বজস্বীকৃত বিধি, তাই প্রত্যেক সামাজিক গ্রুপ নগ্নভাবে তার প্রভাব খাটায় । নিজের প্রকৃতিগত পন্থায় প্রয়োগ করে তার নগ্নশক্তি। এমনি সমাজে হান্টিংটনের কথায়, বিত্তবানরা উৎকোচ দেয়। ছাত্ররা হাঙ্গামা বাধায়। শ্রমিকরা ধর্মঘটের আশ্রয় নেয়। জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সামরিক বাহিনী অবৈধভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে।

আজকে বাংলাদেশ সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, দেখবেন, আইনের প্রতি আনুগত্য নেই। নেই ব্যক্তি এবং সমষ্টি পর্যায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। শিল্পপতিরা শিল্পঋণ নিয়ে ফেরত দেন না। শ্রমিকরা উৎপাদন বৃদ্ধি না করেই চান মজুরি বৃদ্ধি । কিছু ছাত্র পাস করতে চায় বই দেখে লিখে। বেকাররা বেঁচে থাকতে চায় অপরের উপার্জনকে ছিনিয়ে নিয়ে। লেখাপড়া শেখার পরেও তরুণদের কর্মসংস্থান হয় না। রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়। নিরাপদ নয় অফিস আদালত ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার প্রতি আবেদন হ্রাস পেয়েছে।

সমাজে সন্ত্রাস দমন অভিযানে সমাজপতিদের দৃষ্টি এদিকে পড়বে কি? সন্ত্রাসকে তারা সামাজিক বিচ্যুতি হিসেবে দেখবেন কি? দেখবেন কি এটিকে সামাজিক প্রবণতা হিসেবে? সন্ত্রাসের মূলে আঘাত করতে হলে এদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সন্ত্রাসকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই। বিচ্ছিন্নভাবে এর সমাধান সম্ভবনও নয়।

রাজনীতির জন্ম হয়েছে সমস্যার সমাধানমূলক উদ্যোগ হিসেবে রাজনীতি টিকে রয়েছে। সামাজিক প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বকে সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্যে সমাজের বিভিন্ন গ্রুপ এবং শক্তিগুলোর প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতার প্রবাহকে অনুমোদিত বিধিমালার আবর্তে রাখার জন্যে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল জন এবং গ্রুপের দাবি দাওয়াকে ধারণ করে অগ্রসর হবার জন্যে এদিক থেকে বলা যায়, সামজিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে রাজনীতিই প্রধান নিয়ামক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোই প্রধান নিয়ন্ত্রক। সুস্থ রাজনীতির ছায়ায় প্রশাসন হয়ে উঠে নিপুণ, দক্ষ, কর্মতৎপর। অন্যথায় তাদেরও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়।

রাজনীতি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু কার্যকর হয় নিয়মের সুষ্ঠু গণ্ডিতে, সুনির্দিষ্ট বিধি বিধানের কাঠামোয়। বিধি বিধানের মূল আলগা হলে, নিয়ম নীতির প্রতি জনগণ এবং সামাজিক গ্রুপগুলোর আনুগত্য হ্রাস পেলে সমাজ, হান্টিংটন বর্ণিত প্রিটোরিয়ান সমাজে রূপান্তরিত হয়। সমাজজীবন তখন হয়ে উঠে সন্ত্রাস কবলিত।

আসলে সন্ত্রাস কিন্তু ব্যাধি নয়। সন্ত্রাস মৌলব্যাধির লক্ষণ মাত্র। তাই সমাজে সন্ত্রাসবোধে সন্ত্রাসের প্রতি যেমন দৃষ্টি দিতে হয়, তেমনি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন সন্ত্রাসের মূলে। সন্ত্রাস রোধের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সমাজের বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির আইনের প্রতি সামাজিক ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধা এবং আস্থা সৃষ্টির। ক'জন আইন ভঙ্গকারীকে আইন-শৃঙ্খলা

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষাকারী সংস্থা অতি অল্প সময়ে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম। কিন্তু সমাজে ব্যাপক জনগোষ্ঠী আইনের প্রতি উদাসীন হলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাও অসহায় হয়ে পড়ে।

আজকের বাংলাদেশে সন্ত্রাসের যে প্রবল দাপট পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান করণীয় একটিই এবং তাহলো রাজনৈতিক পর্যায়ে সকল রাজনৈতিক দল, সকল গ্রুপ এবং জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল অংশের মধ্যে আইনকে শক্তিশালী করার জন্যে এক ধরনের সহমত রচনা। আইনের প্রতি সবার আনুগত্যের মাত্রাকে আরো উন্নত করা। প্রয়োজনবোধে সকল দলের ও গ্রুপের মধ্যে এমন ধরনের আন্তরিক বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত দাবি আদায়ের জন্যে ধর্মঘট, আন্দোলন থেকে বিরত থাকা যায়। আইনকে কার্যকর করার পরিবেশ তৈরি হয়।

বাংলাদেশ সত্যি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এ সময়ে সর্ব মহলের সংযত কার্যক্রম নিশ্চিত না হলে দীর্ঘদিন পরে পাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই শুধু ব্যাহত হয়ে না, সামাজিক জীবনের বন্ধনগুলো পর্যন্ত শিথিল হয়ে উঠবে। মুক্তিযুদ্ধের পরে নিজেদের ঘর সামলানোর জন্যে পেয়েছিলাম এক ঐতিহাসিক সুযোগ তা কাজে লাগাতে এ জাতি ব্যর্থ হয়েছে। স্বৈরাচারের পতনের পর একানব্বই এ আবারো এসেছে এ জাতির নিকট এক বিরাট সুযোগ। এ সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে এর পরিণাম হতে পারে আরো মারাত্মক ও আরো ভয়ঙ্কর । সন্ত্রাসের নিকট রাজনীতির পরাজয় এড়াবার জন্যে তাই প্রয়োজন আইনের বন্ধনকে শক্তিশালী করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীর হাতকে আরো সুদৃঢ় করা।[৫]

এমাজ উদ্দিন আহমেদ, রাজনীতির গতিধারা- ঝিনুক প্রকাশ, ঢাকা-২০০২ ইং। পৃষ্ঠা -২৬৬-২৬৮।

• মাস্তানীর উৎপত্তি :

একযুগ আগেও মাস্তান শব্দটি এত পরিচিতি লাভ করেনি। ১৯৮১ সালে প্রথম মাস্তান নিয়ে পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি হয়। যদি আরো পেছনে যাই, দেখা যাবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ছিনতাই রাহাজানি খুন ডাকাতির মতো নৈরাজ্যকর ঘটনা কিছুকাল মানুষের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছিল বটে, কিন্তু মাস্তানির কথা শোনা যায়নি। মাস্তান শব্দের সঙ্গে সাধারণের তেমন পরিচয়ই ছিল না। তদানীন্তন ক্ষমতাসীন মহলের একজন অতি ক্ষমতাবান রাজ পুরুষের গুনধর পুত্র নাকি মাঝে মাঝে ব্যাংক অপারেশনেও যেতেন এবং সুন্দরী মেয়েদের ছিনতাই করতেন। এ নিয়ে মানুষের মধ্যে গুজ গুজ ফিস ফিস হতো, কিন্তু এটাকে কেউ মাস্তানি অভিবাদ চিহ্নিত করেনি। সে সময় ছিল বখাটেদের দৌরাত্ম্য স্কুলের সামনে আড্ডা দেয়া, মেয়েদের উত্যক্ত করা, ঢিল ছোঁড়া, জোর জুলুম করে চাঁদা তোলা, উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে প্রতিবেশিদের বিরক্ত করাই ছিল তাদের কর্মকাণ্ড। এ নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হতো। নির্বাচনের সময় এ কিশোরদেরই ব্যস্ততা হঠাৎ বেড়ে যেতো। এরা চুঙা ফুকতো, চিকা মারতো, এক দলের হয়ে আরেক দলের বিরুদ্ধে মারামরি করতো এবং নির্বাচনের দিন ডিউটি পালন করতো। ক্রমে ক্রমে এরা ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের, প্রতিপত্তিশালী সমাজপতিদের অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালো। ক্ষমতার জন্য, প্রতিপত্তির জন্য, পতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হাতিয়ার শান দেয়া চাই। হলোও তাই। বখাটে কিশোরদের হাতে অস্ত্র এলো, অর্থ এলো, বশীভূত রাখার জন্য তাদের হাতে মাদকদ্রব্য তুলে দেয়া হলো। এরা নির্বাচনী কাজে লাগে, আন্দোলনে কাজে লাগে, জমি দখলের লড়াইয়ে কাজে লাগে, প্রতিপক্ষকে ঠেঙানোর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দ্রুত আধুনিকায়নের ফলে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছেন অধিক সুবিধাভোগী অপরদিকে বাকিদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অসন্তোষ এবং সন্ত্রাসের। সন্ত্রাস দূরীকরণে পদক্ষেপ প্রতিটি সুস্থ মস্তিকের মানুষ সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে। এমন কি সন্ত্রাসী নিজেও সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তারা বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। তাই যে সকল পরিস্থিতির কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্মটা হয় সেসব বিষয় চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেই কেবল সন্ত্রাস বন্ধ করা সম্ভব। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমন দপ্তরের কর্মকর্তা Dr. Alex p-Schmid সন্ত্রাস দমনে ৮টি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন-

১। রাজনৈতিক এবং সরকারি ব্যবস্থা ঃ

সন্ত্রাসকে প্রথমে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। এজন্য সরকারি এবং বিরোধী দল উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মিলিতভাবে এগিয়ে না এলে সরকারের একার পক্ষে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব না। শুধু রাজনৈতিক দলগুলো নয় দেশের প্রতিটি মানুষকেও এ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করতে হবে। তাহলেই দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব হবে।

২। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ঃ

সন্ত্রাসকে দমন করতে হলে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, নতুবা সন্ত্রাস কমবে না । মি. এলস্ত্র UNDP (ইউ,এন,ডি,পি) ইউনাইটেড নেশন ডেবেলপমেন্ট প্রোগ্রাম দারিদ্র্য সূচক ও সন্ত্রাসবাদ সূচকের মধ্যে তুলনা করে পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে সন্ত্রাসের সঙ্গে আইনের শাসনের সম্পর্কের চেয়ে সন্ত্রাসের সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যদিও বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তথাপিও তা প্রয়োজনের তুলানায় খুবই নগণ্য।

৩. মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষমূলক ও যোগাযোগ ব্যবস্থ ঃ

সন্ত্রাসীদের দুর্বল করার জন্য প্রকাশ্য ও গোপনে প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক মনস্তাত্ত্বিক অভিযান চালাতে হবে যাতে করে সন্ত্রাসীরা গোপন থাকতে না পারে।

৪. সামরিক ব্যবস্থা ঃ

অনেক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সীমিত আকারে পুলিশি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তবে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়, কারণ মাত্রাতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে অর্থাৎ দ্রুত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে করে রাজধানীতে দুর্নীতি ও সন্ত্রাসগ্রস্ত এলাকায় সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয়।

৫। বিচার বিভাগীয় ও আইন ব্যবস্থা ঃ

বাংলাদেশ সরকারের সন্ত্রাস দূরীকরণের জন্য প্রথমেই বিচার বিভাগ ও আইনী ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। যাতে করে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত Counter Terrorism Committee এবং অস্টিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় গঠিত Global Programme against Terrorism এর কর্মকৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. পুলিশ ও জেলখানা পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশের পুলিশের ব্যাপারে জনগণের বিন্দু পরিমাণ আস্থা নেই। এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশের কাছে তথ্য জানাতে পারে। ঠিক একইভাবে আটককৃত সন্ত্রাসীদের কাজে লাগিয়ে অন্যান্য সন্ত্রাসীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে হবে।

৭. গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে উন্নত করা ঃ সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করতে এবং তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করাতে ও সন্ত্রাসীকর্মকান্ডের পূর্ব সতর্কতা অবহিত করাসহ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনে দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গোয়েন্দা সংস্থাকে আরো অধিক প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ করে গড়ে তুলতে হবে।

৮. অন্যান্য ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশের সন্ত্রাস দূরীকরণ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সামাজিক সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে হবে যাতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের মনোবল অটুট থাকে। একই সাথে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থাও কমিয়ে ফেলতে হবে।

সার্বিক আলোচনা ঃ সন্ত্রাস একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। আর সন্ত্রাসের কারণে দুর্নীতির চরম শিখরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। টিআই রিপোর্টে বাংলাদেশ পরপর ৪ বার দুর্নীতিতে ১ম অবস্থানে রয়েছে। দুর্নীতির কারণে বেড়েছে সন্ত্রাস। মানুষ কখনও সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম নেয় না, পরিস্থিতিই তাকে সন্ত্রাসী করে তোলে। তাই সন্ত্রাসের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়ে। সর্বোপরি দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, আইনের শাসন, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করলে সন্ত্রাস দমন সম্ভব হবে বলে অনেকেই আশাবাদী। পরিশেষে জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি "Wang Yingfan এর সাথে একমত হয়ে বলা যায়, An integrated approach involving political, Diplomatic econmoc, legal and other means should be adopted in his regard.[১] *আবদুল মোতালেব সরকার, অ্যাসিওরেন্স বিসিএস বাংলাদেশ প্রসঙ্গ। একাশনী অ্যাসিওরেন্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা - ২০০৬। পৃষ্ঠা -৭২৬-৭২৭।*

- **রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রকারভেদ ঃ**

ইকবাল আহমেদের অভিমত অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদ পাঁচ ধরনের ঃ

১। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ
২। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ
৩। অপরাধমূলক সন্ত্রাসবাদ
৪। বিকারগ্রস্ত সন্ত্রাসবাদ এবং
৫। বেসরকারি দলের রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ।

উপরোক্ত সন্ত্রাসবাদের প্রকরণ থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদকে বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী আজ ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের দায়ভার মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ মুসলিম বিশ্বকে বিশ্ববাসীর দরবারে

Dhaka University Institutional Repository

সন্ত্রাস যাদের তকমা চাপিয়ে দিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিলসহ মুসলিমবিশ্বকে অপদস্থ করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করছে। মুসলিম বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশও আজ ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের লালনভূমি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে হুমকির ডাক শুনতে পাচ্ছে। যেমনঃ বাংলাদেশের জেএমবি এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় চরমপন্থী গোষ্ঠীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এ সমস্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মদদদাতা, অস্ত্র ও অর্থের যোগানদাতা পশ্চিমা সাম্রাজ্যগোষ্ঠীই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ছত্রছায়ায় জঙ্গি বা চরমপন্থী গোষ্ঠীসমূহ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে অস্থিতিশীল করে রাখতে এবং দেশটির ইসলামি ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করতে মরিয়া।[৮] *রথীন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। নাটাজিরা। বেঙ্গল লোকনাথ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-১৯।*

• বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস ও গতিধারা

১৯৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যে কমিউনিজম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সীমিত পরসরে আইন বিরোধী কর্মকান্ড পরিচালিত হতে দেখা যায়। ১৯২৫ সালে ভারতে প্রথম কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারত বর্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এবং ক্রমান্বয়ে ১৯৬০ এবং ৭০এর দশকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সফলভাবে ইহার যাত্রা অব্যাহত থাকে। বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চায় পরিবর্তে বিভিন্ন রাষ্ট্রদ্রোহী, ধ্বংসাত্মক এবং অরাজকতামূলক কর্মকান্ড সাধিত করছে। উক্ত কর্মকান্ডে যাদের সংশ্লিষ্টতা বেশি পাওয়া যায় সে সমস্ত দল গুলো হচ্ছে- সর্বহারা পার্টি, জনযুদ্ধ, নিউ রিভ্যুলূশনারী কমিউনিষ্ট অব বাংলাদেশ, শ্রমজীবী আন্দোলন, মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইস্ট বেঙ্গল এবং কমিউনিষ্ট পার্টি অব পূর্ব বাংলা যাদের বেশির ভাগই দেশের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে একটি নতুন ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে ইসলামী শাসন কায়েম প্রতিষ্ঠার আদর্শ নিয়ে অসহিষ্ণু মনোভাবাপূর্ণ জঙ্গী সংগঠন প্রতিষ্ঠা । এ সমস্ত গ্রুপের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জামাআতুল মুজাহিদীন অব বাংলাদেশ (জে, এম, বি) বা হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী (হুজি), আহলে-হাদী, আল্লাহর দল, হিজবুত-তাহেরী এবং হিজবুল মুজাহিদীন। এ সমস্ত গোষ্ঠকে যদিও ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট কালো তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করেনি তথাপি পশ্চিমা বিরোধী সকল গ্রুপ বা জঙ্গীগোষ্ঠী এবং আল কায়েদার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি কড়া নজর দারিতে রেখেছে। বাংলাদেশের সন্ত্রাসী সংগঠন হুজির যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি অনুযায়ী। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলার অভিযোগে ৪ জন সন্দেহ ভাজন হুজি লিডারকে গত সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে গ্রেফতার করা হয়। উপরন্তু, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ্ এস এম কিবরিয়া, সিলেটের মেয়র বদরুদ্দীন আহমেদ কামরানকে হত্যার দায়ে তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়। গ্রেফতারকৃত হুজি নেতা মুফতি আব্দুল হান্নানকে তার কুখ্যাত কর্মসূচির জন্য দল থেকে বহিস্কার করা হয়। যে সব কুখ্যাত সন্ত্রাসী হামলার মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি ছিল তা হল উদীচি সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, রমনার বটমূল এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় জননেত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সভাস্থলে ৭৫ কেজি ওজনের বোমা পূঁতে রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এসব হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্রের যোগান ভারত থেকেই এসেছিল।

সন্ত্রাসী গ্রুপের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে ভারতের 'র' Raw গোয়েন্দা সংস্থার পৃষ্ঠপোশকতায় গড়ে উঠা বিদ্রোহী গোষ্ঠী। যাদের আর্বিভাব ৭০ দশকের শেষার্ধে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চল।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পি সি জে এস) গঠিত হয় ১৯৭২ সালে আর্বিভাব ঘটে কমিউনিষ্ট ভাবধারা পুষ্ট হয়ে। যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠাসহ সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর সংখ্যাগুরু চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রভুত্ব কায়েম করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মদদে গড়ে উঠে সশস্ত্র শান্তি বাহিনী এবং যারা কিনা গত দুই দশক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালিত করেছে। পার্বত্য জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামী সরকারের ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর নতুন জঙ্গী গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটে যারা কিনা শান্তি চুক্তি বর্জন সহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সহিংসতামূলক কর্মকান্ড পরিচালিত করছে 'ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' নামের সংগঠনটি তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে প্রায়ই সশস্ত্র সংঘর্ষসহ পাহাড়ি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইসহ পরিস্তিতিকে ঘোলাটে ও অস্থিতিশীল করে তুলছে এবং প্রশাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে। আরও বলা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এবং ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সুসংগঠিত ভাবে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা, কাঠব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে। আদর্শগত দিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি সন্ত্রাসী সংগঠন তাদের কর্মকান্ড পরিচালিত করে। সংগঠনগুলো হলো, বাংলাদেশী কমিউনিষ্ট পার্টি, ইসলামী গোষ্ঠী এবং কতিপয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। এছাড়াও নেক্সাস নামের একটি সন্ত্রাসী সংগঠন স্মাগলিং সিন্ডিকেট, বিদেশী বিদ্রোহী, অবৈধ সংগঠন, বিদ্রোহী গ্রুপ এবং রাজনৈতিক মদদপুষ্ট ক্যাডার সহিংসতা ঘটানোর জন্য। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে ১০২৭টি সন্ত্রাসী সংগঠন, ২ টি বিদ্রোহী গোষ্ঠী, ১২টি সহিংসতা ঘটানো গোষ্ঠী, কমপক্ষে ৪টি উগ্রচরমপন্থী জঙ্গী গোষ্ঠী, ১৬০৬২ টি ক্রিমিনাল গ্যাং, ৭৬২টি রাজনৈতিক মদদ পুষ্ট সন্ত্রাসী গ্রুপ বর্তমান রয়েছে।

- **জে এম বি এবং আহলে হাদী**

বাংলাদেশ ভূখন্ডে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জে এম বি এবং তার অঙ্গ সংগঠন আহলে হাদীর ধ্বংসাত্মকমূলক কর্মকান্ডে যাত্রা শুরু হয়। জে এম বি মূলত : ফরায়েজী আন্দোলনের আদর্শ এবং তিতুমীরের বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন আদর্শকেই বেছে নেয় তাদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে। আহলে হাদী তরীকা-ই-মুহাম্মাদীয়ার, অঙ্গ সংগঠন হিসেবে দীর্ঘ সময় তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে: যা কিনা ফরায়েজী আন্দোলনের সমসাময়িক তরীকা আন্দোলন ছিল মূলত: দিল্লীর ওয়ালীউল্লাহী স্কুলের ঐতিহলোলিভ এবং তা পরবর্তীতে শাহ্ সাঈদ আহম্মেদের নেতৃত্বে রায় বেরীলিতে উদ্দেশ্য এবং উৎসাহের দিক থেকে আন্দোলনে রূপ নেয়। এবং এটা বলা হয়ে থাকে যে, তিতুমীর মূলত শাহ্ সৈয়দ আহমেদ খান এবং অন্যান্য ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরুদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে ছিলেন। জে এম বি এবং আহলে হাদীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বই, এবং বিভিন্ন ডকুমেন্টস থেকে জানা যায় যে, তাদের কর্মকান্ড এবং আর্দশ মূলত ওয়াহাবীজম অনুসারে পরিচালিভ হয়।

জে এম বি এবং আহলে হাদী, ওয়াহাবী আন্দোলনের আদর্শে ইসলামকে ব্যাখ্যা করে থাকে, শরীয়াহ ভিত্তিক আইন বিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। তাদের মতানুসারে তাদের লড়াই সেক্যুলারিজম এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ফ্রেম ওয়ার্কের বিরুদ্ধে, কুরআন এবং হাদীস মোতাবেক দেশের শাসনভার কখনো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদী বা সেক্যুলারিজম আদর্শ মোতাবেক চলতে পারে না। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থা মনুষ্যসৃষ্ট যা কিনা কুফর বলে পরিগণ্য। যা কিনা আল্লাহর আইনের পরিপন্থী বলে তাদের অভিমত এবং এ সমস্ত রাজনৈতিক আর্দশ কাফির, মুসরিক, ইহুদী বলেও তাদের মতবাদ। তাই তাদের সকল মুসলিমদের প্রতি আহ্বান যে, সকল মুসলিম যেন বিষয়টি গভীর ভাবে উপলব্ধি করে।উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা বোমা বিস্ফোরণ হত্যা রাজনীতি বেছে নিয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং এভাবে তারা তিন বছরে ১৯ টি হামলার মাধ্যমে ২৮ জনের প্রাণহানি সহ উল্লেখযোগ্য হতাহতের ঘটনা ঘটিয়েছে। জে এম বি'র প্রধান শাইখ আবদুর রহমান এবং দ্বিতীয় প্রধান সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই। পরবর্তী সামরিক প্রধান আতাউর রহমান সানি এবং মজলিস-ই-সুরার সদস্য আব্দুল আওয়াল এবং খালেদ সাইফুল্লাহ। জে এম বি অপারেশন কার্যক্রম ৫টি ডিভিশনে বিভক্ত যথা রাজশাহী ডিভিশন, ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, বরিশাল ও খুলনা ডিভিশন এবং প্রত্যেক ডিভিশনের দায়িত্বে থাকে সংগঠনের একজন জৈষ্ঠ্য সদস্য। জে এম বি'র প্রধান শাইখ-ই-আব্দুর রহমান আরবি ভাষা ও ধর্মতত্ত্বে পড়াশুনা করেন। জে.এম.বি সদস্যদের প্রায় ৫৩% সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এদের অনেকেই গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রীধারী ৩৯% মাদ্রাসা শিক্ষার, এবং ৭% নিরক্ষর। জে এম বি সদস্যদের পেশায় ৬৭% চাকুরীজীবী, ২৪% ছাত্র। তাদের অধিকাংশের বয়স ২০ বছর এবং ৮৮% সদস্যের গড় বয়স ১৫-৩৯ বছরের মধ্যে। জে.এম.বি তে কোন নারী সদস্য নেই। ২০০৪ সালে জে এম বির সদস্য দাঁড়ায় ৬,৭৩৯ জন যাদের ২৪% প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। জে.এম. বির মোট সদস্য সংখ্যা ১০,৯৮৯ এবং আহলে হাদীর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। জে এম বির সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্যদের গড় বয়স সাধারণত ১৫-২০ বছরের মধ্যে যারা অবিবাহিত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড যারা কিনা শহীদের মর্যাদা পাওয়ার দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়।

উপরে বর্ণিত পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের সন্ত্রাসী গ্রুপ সমূহের আন্তজাতিক সন্ত্রাসী গ্রুপ সমূহের সাথে সংগঠনের কাঠামো এবং আর্দশ ছাড়া খুব সামান্যই যোগ সাজশ রয়েছে। বাংলাদেশের জে এম বির খুব সামান্যই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে এবং তাদের হামলাগুলো খুব কম ধ্বংসাত্মক মূলক হয়ে থাকে যেমন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন সমূহ ট্রাক বোমা, রাসায়নিক অস্ত্র বিমান হামলা চালানোর মত ধ্বংসাত্মকমূলক হামলা পরিচালিত করে থাকে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন সমূহের প্রধান ইস্যু হচ্ছে কাশ্মীর, ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি দ্বন্দ্ব, আমেরিকার আফগানিস্তান ও ইরাক আগ্রাসন ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠী সমূকে ধ্বংসাত্মকমূলক কর্মকান্ডে উস্কিয়ে দিচ্ছে। যার পশ্চাতে শুধুমাত্র জে এম বি কাজ করে। জে এম বিদের কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয় এরা বাংলার তরীকা আন্দোলন এবং ফরায়েজী আন্দোলনের সাথে মিল রয়েছে এবং তিতুমীরের বিদ্রোহী নীতি তাঁরা আদর্শ ধরে নিয়েছে। উপরোক্ত বিশ্লেষণ বাংলাদেশের জঙ্গী গোষ্ঠী সমূহের আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী সমূহের সাথে সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিকে অস্বীকারই করেছে। যদিও কতিপয় দেশের অভিযোগ রয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন সমূহের বাংলাদেশী জঙ্গী সংগঠন সমূহের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের শীর্ষ জঙ্গী নেতাসহ প্রায় ৯১৫ জন জঙ্গী সদস্যকে গ্রেফতার করে তাদেরকে মৃত্যু দন্ড সহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদানের মাধ্যমে জঙ্গী সংগঠন সমূহকে নির্মূল করে দেশের নিরাপত্তা হুমকি থেকে খুব শীঘ্রই বের করে আনতে সক্ষম হবে বলে আপাতত মনে হচ্ছে।[৯] *Countering Terrorism In Bangladesh. Edited by Farooq Sobhan Bangladesh Enter Prise Institute. The University Press limited 2008. পৃষ্ঠা -২৪-২৯।*

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘটে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার মধ্যদিয়ে। আততায়ী দ্বারা দুই কন্যা ব্যতীত সপরিবারে নিহত হয়েছিলেন জাতির জনক। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে চলে আসছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বহুবিদ কর্মকান্ড। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও নেতার উদ্যোগে এদেশের রাজনীতিতে পেশীশক্তির ব্যবহার ঘটেছে বহুদিন। এই প্রক্রিয়ায় গুন্ডা মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের পর সবশেষে এসেছে আর্মড ক্যাডাররা। দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লালন করলেও লালনকারী দলগুলোই এক পর্যায়ে আর্মড্ ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে নেতারা হন জিম্মি, বিপন্ন হয় দেশ এবং অসহায় হয়ে পড়েন জনগন।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষভাবে সত্যে পরিণত হয়েছে। সারা দেশব্যাপীই আজ চলছে আর্মড্ ক্যাডারদের দাম্ভিক ও অনিয়ন্ত্রিত তৎপরতা। কারা এই আর্মড্ ক্যাডার, কিভাবে তাদের উত্থান ও বিকাশ ঘটে, কোন-কোন উৎস থেকে অস্ত্রপায় তারা? কারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে? আশ্রয় দেয় এবং জীবনযাপনই বা কোথায় কিভাবে করে তারা? এসব নিয়েই রচিত হয়েছে এবারের বিশেষ প্রতিবেদন।

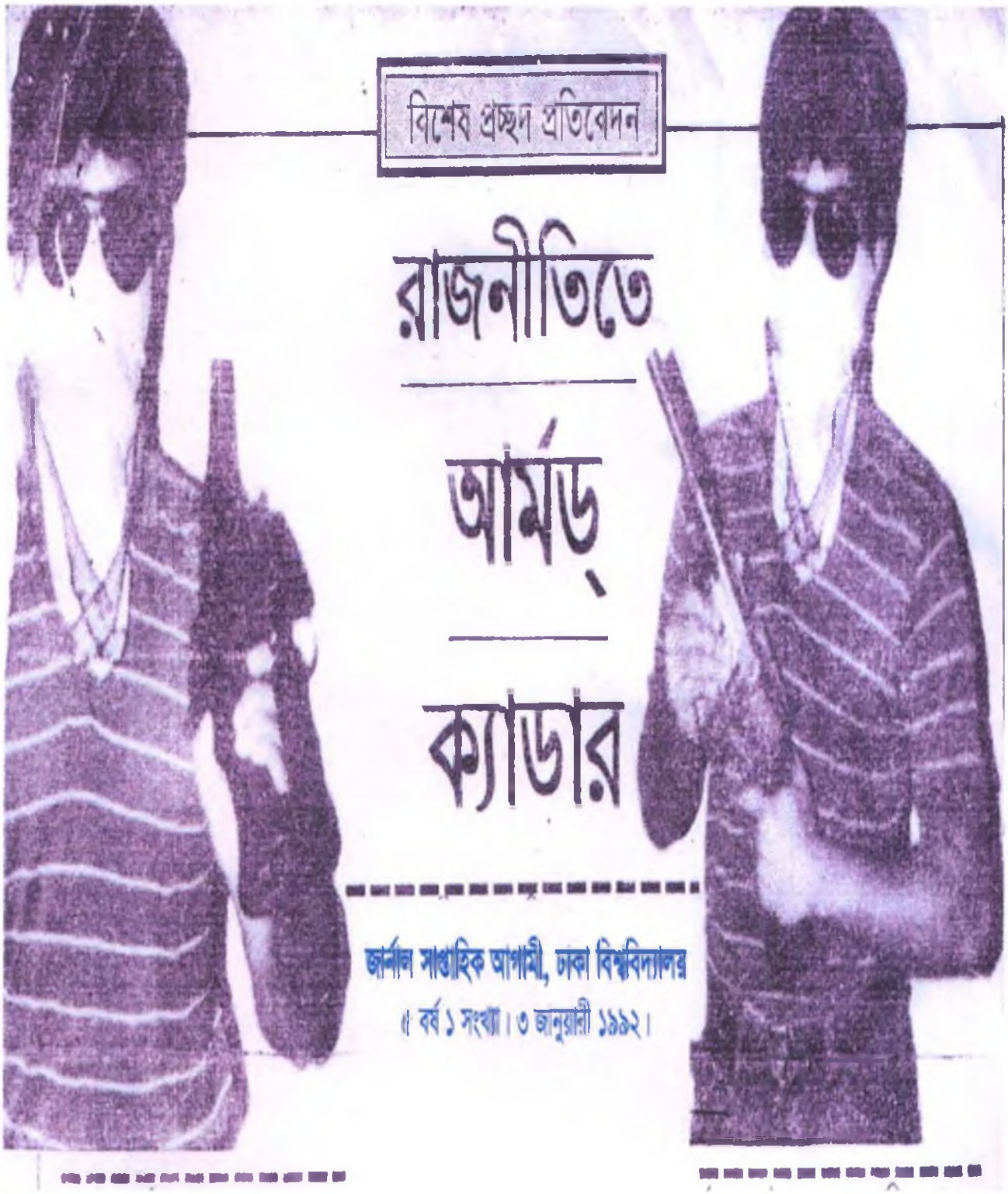

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে আর্মড্ ক্যাডার

দশ-বারোজনের একটি দল। সবার চোয়াল শক্ত। শকুন-চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে দীপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে দশ- বারো জোড়া পা। পায়ে হাইটেক্স কিংবা নাইক কেডস। পরনে জীন্স এবং ঢোলা গেঞ্জি, মেড ইন ব্যাংকক। মাথায় ঈষৎ বাকানো আর্মিক্যাপ। কারো কোমরে বৃটিশ কারবাইন, সেলফ-লোডেড বুক মেলে হাটছে তারা। মহড়ায় যাতে কোন খুত ধরা না পড়ে। চারপাশে বসে উৎসুক চোখে ফিরে ফিরে ওই দলকে দেখছে সকলে। অনেকের শরীর ইতিমধ্যে হিম হয়ে গেছে। সন্ত্রস্ত ছাত্রদের কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে সালাম জানাচ্ছে। কেউ বা পথ ছেড়ে দিচ্ছে। ক্যাম্পাস জুড়েই তাদের সদর্প দাপট। কি তাদের পরিচয়? এদের বিচরণে কেন আশে পাশের পরিবেশ আতংকিত হয়?

ওরা 'আর্মড্ ক্যাডার'। বর্তমান রাজনীতির অনিবার্য শক্তি। রাজনৈতিক 'গড ফাদার'-দের ইশারায় মুহূর্তেই ওরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নেতাদের আশার সন্তান ওরা। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের বিকৃতির শিকার। দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ থেকে মফস্বলের কলেজ চত্বর পর্যন্ত ওদের কার্যক্রম বিস্তৃত। ফ্যান্টাসী, সাসপেন্স আর থ্রীল নিয়ে অনিশ্চিত জীবনের সাথে ওরা মিতালী করে। ঝুঁকিবহুল এই বলয় থেকে বেরোনোর কোনো পথ নেই আত্মহননের নেশায় আসক্ত হয়ে একদল প্রাণোচ্ছল তরুণ এই সময় মৃত্যুর খেলায় নিজেদের 'উৎসর্গ' করছে।

দেশের বিদ্যাপীঠগুলোতেই আর্মর্ড, ক্যাডারদের জন্ম এবং বিকাশ। একদা 'ক্যাডার' শব্দটি ব্যবহৃত হতো বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির সাবক্ষনিক কর্মীর বিকল্প নাম হিসেবে। যে পরিচয় এখন বিলুপ্ত। একদা পার্টির বিশ্বস্ত কর্মীর প্রতিশব্দ 'ক্যাডার' সময়ের বিবর্তনে এখন রাজনীতির অস্ত্রধারী শক্তি 'আর্মড্ ক্যাডারে' পরিণত হয়েছে। এরা মহল্লার ছিঁচকে মাস্তান বা পেশাদার ক্রিমিনাল নয়। আর্মড্ ক্যাডাররা সাধারণত লালিত হয়ে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায়। গ্রামীণ আটপৌরে জীবনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। গ্রামীণ আটপৌরে জীবনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ওরা আশ্রয় নেয় শহরের সাসপেন্সপূর্ণ রাজনৈতিক জীবনে। নিরাপদ ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কিংবা নেতার আবাসস্থলকে। বইপত্রের জটিল বিবরণে এদের কোনো উৎসাহ নেই। ধাতব অস্ত্রের ট্রিগারেই এদের জীবন জড়িয়ে আছে। প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্যাপীঠে আগমন ঘটে গোবেচারা ভাবে। তারপর বেপরোয়া জীবনের হাতছানি। সুযোগ-সুবিধার অফার। অ্যাকশন। হুলিয়া, ওয়ারেন্ট। অনিশ্চিত এবং উদ্দেশ্যহীন জীবন, তবু ভারী রোমান্টিক মনে হয় নিজেদের কাছে।

• ক্যাডারদের ট্রেনিং ঃ

চকচকে ধাতব অস্ত্রের স্পর্শে প্রথমেই পুলকিত হয়ে যায় ওরা। এই পুলকের পরিণতি চরম আগ্রহ। আগ্রহীরা ঘিরে বসে। রাতে বা দুপুরে হলের গেস্টরুমে অথবা কোনো সিনিয়ার ক্যাডারের রুমে ধাতব অস্ত্র উল্টেপাল্টে দেখানো হয়। কাটা রাইফেলে কিভাবে ম্যাগজিন ভরতে হয়, কিভাবে তাক করতে হয়, ফায়ারিং- এর সময় কতটুকু ঝাকি লাগবে তার আগাম সংবাদ শোনানো হয় নতুন রিক্রুট করা আগামী দিনের ক্যাডারদের। আগ্রহীরা থ্রীল ও উত্তেজনা অনুভব করে। একে একে জেনে নেয় ষ্টেনগান দিয়ে কিভাবে সিঙ্গেল শর্ট করা যাবে কিংবা ব্রাশ ফায়ারিং। এভাবে শিক্ষার্থীর তালিকায় আসে বৃটিশ কারবাইন, রিভলবার, পিস্তল ও বন্দুকসহ মলোটভ ককটেল এবং গ্রেনেড।

Dhaka University Institutional Repository

ফায়ারিং করার সময় পজিশন নেয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার। কমান্ডো ট্রেনিং- এর মতো করে নব্য ক্যাডারদের দিয়েও হলের ভেতরে নকল মহড়া দেয়া হয়। যাতে সত্যিকার অ্যাকশনের সময় ফাইটাররা দুর্বল না হয়ে পড়ে। গভীর রাতে হাতে কলমে শেখানো হয় গুলি বর্ষণ। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে নতুন ক্যাডাদের অ্যাকশনে পাঠানো হয়, ফাইটে নামানো হয়। লব্ধ প্রশিক্ষণ কাজে লাগায় ক্যাডাররা। গর্জে ওঠে হাতের কাটা রাইফেল, এসএলআর, শর্টগান। অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হতে থাকে ফাইট, ফাইট এবং ফাইট। একদা নব্য ক্যাডার কিছুদিনের ব্যবধানেই ক্যাম্পাসের পরিচিত ত্রাস হয়ে ওঠে।

• অভি: ক্যাডার রাজনীতির কিংবদন্তির নায়ক ঃ

সন্ত্রাস যদি শিল্প হয় তাহলে আমি সেই শিল্পকে আধুনিক রূপ দিয়েছি। সাহসভরে যিনি এই দাম্ভিক উচ্চরণ করেন তার নাম গোলাম ফারুক অভি। আর্মড্ রাজনীতিতে অভি মুহূর্তেই চমক সৃষ্টি করতে পারতেন। চমৎকার বাচনভঙ্গি, নাটকীয় মহড়া এবং দুর্দান্ত অ্যাকশনের কারণে অভিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যেত। অভিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ওয়াকিটকি ব্যবহার করেন। দলের সিনিয়ার ক্যাডারদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য এবং সংঘর্ষ বা ফাইটের সময় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে অভি ওয়াকিটকি ব্যবহার করতেন। দূরে প্রতিপক্ষের অবস্থান নিশ্চিতভাবে জানার জন্য ব্যবহার করতেন শক্তিশালী বাইনোকুলার। এখানেই শেষ নয়। ভিডিও-তে বিভিন্ন অ্যাকশনধর্মী গান ফাইটিং এর ছবি দেখা অভির নিয়মিত অভ্যাস ছিল। অবসরে জুনিয়ার ক্যাডারদের রাজনৈতিক দীক্ষা দিতেন তিনি। বিশেষ করে ফাইটের আগ-মুহূর্তে তিনি দলীয় ক্যাডারদের দীপ্ত ভাষণে জাগিয়ে তুলতেন। ভাষনে থাকতো নানা ধরণের নাটকীয় সংলাপ। এক সময় তিনি বলতেন, 'আফ্রো-এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত গন মানুষের প্রতিনধি মহান নেত্রী এর আপোষহীন নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে আমি বলতে চাই, স্বৈরাচারের দালালদের শহীদ এর আদর্শের সৈনিকদের এই সংগঠনের সাথে বেঈমানী করার কোন সুযোগ আমি বেচে থাকতে দেবো না। এরকম ভাষণে এবং আচরণে চমক লাগাতেন অভি। সাধারণ কর্মীরা অভির এই স্টান্টবাজিতে মুগ্ধ হয়ে পড়তো। সেই সময়ে প্রতিপক্ষের মুখে মুখে অভির নাম উচ্চারিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে আসে তার অধঃপতন এবং শেষ দৃশ্যে অভি একক শক্তি হিসেবেই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ডাঃ মিলন হত্যার আসামী হয়েও অবাধে বিচরণ করেন পরবর্তীকালে। এমনকি মিলন হত্যার অভিযুক্ত আসামী হয়েও অভি গত ২৭ নভেম্বর ডাঃ মিলনের স্মৃতি ফলকের পাদদেশে একটি পুষ্পস্তবক অর্পন করেন। এতে লেখা ছিল, আপনার আত্মাই বলে দিক কে প্রকৃত হত্যাকারী।' আর্মড্ ক্যাডার রাজনীতির কিংবদন্তির নায়ক এই অভি এখন ব্যাংকক ম্যানিলায় ঘুরে ফিরছেন শুধু নিরাপত্তার আশায়।

• ৯০- এর গণঅভ্যুত্থানে ক্যাডারদের ভূমিকা ঃ

৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য। অভি নীরু চক্র আরশাদের সাথে একজোট হলে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতা কর্মী সবাই আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত থাকেন। বলা বাহুল্য, অভি-নীরুর সহিংসতার পাল্টা জবাব দেয় সরকার বিরোধী ছাত্র ঐক্যের আর্মড্ ক্যাডাররা। সত্য উচ্চারণ করলে বলতে হবে, ছাত্র ঐক্যের আর্মড্ ক্যাডাররাই সরকারী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করে আন্দোলনকে এগিয়ে দেন। বিশেষ করে নভেম্বরের ২৫, ২৬ ও

Dhaka University Institutional Repository

২৭ তারিখে ছাত্র ঐক্যের আর্মড ক্যাডারদের প্রতিরোধ সফল আন্দোলনের পেছনে মূল প্রেরণা হিসেবে অবদান রাখে। ছাত্র ঐক্যের ক্যাডাররা নেপথ্যে থেকে শহরময় প্রতিরোধের দেয়াল গড়ে তোলেন।

২৫ নভেম্বর অভি একটি সাদা মাইক্রোবাস নিয়ে ক্যাম্পাসে এসে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে গুলিবর্ষন করলে ছাত্র ঐক্যের আর্মড্ ক্যাডাররা পাল্টা গুলি চালিয়ে অভিদের পিছু হঠাতে বাধ্য করেন। শুধু অভির আক্রমণের পাল্টা প্রতিরোধ নয় মন্ত্রীসহ দালালদের বাসা ঘেরাও, সরকারী বাহিনীর সমাবেশ ভেঙে দেয়া এবং পুলিশ বিডিআর এর বাধা ডিঙিয়ে রাজপথে মিছিল নামানো সহ বহু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বিভিন্ন দলের তেজঃদীপ্ত আর্মড্ ক্যাডাররা। একতা আজ অনস্বীকার্য।

• মেধা ও মনন বনাম অস্ত্র ঃ

নষ্ঠ সময়ে অসুস্থ রাজনীতির প্রশ্রয়ে শক্তিমান হচ্ছে আর্মড্ ক্যাডাররা। রাজনৈতিক 'মুরুব্বী'র অত্যাবশ্যকীয় শক্তি হয়ে এরা শুধু হুকুম পালন করে। বিনিময়ে কেউ কফিনে শুয়ে মাটির কোলে আশ্রয় নেয়। কেউ বেছে নেয় ফেরারী যৌবন। যে তরুণের বলিষ্ঠ হাতে এখন অস্ত্র শোভা পায় একদা সেই হাতেই বই-খাতা আলোর প্রতীক হয়ে ফুটে থাকতো। স্রেফ থ্রীল, সাসপেন্স কিংবা বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হয়ে ঝুকিবহুল এই ক্যাডারের জীবন। অনুসন্ধানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের এমন অনেক আর্মড্ ক্যাডারের নাম জানা যায়-যারা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র এবং বিরল গুনাবলীর অধিকারী। গোলাম ফারুক অভির কথাই ধরা যা। অভি মাধ্যমিক পরীক্ষায় বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান লাভ করায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাকে পুরস্কৃত করেছিলেন। মেধার পরিচয় দিয়ে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হন তিনি। অভির পারিবারিক ঐতিহ্যও খুবই বর্ণাঢ্য। আটজন ভাই-বোনের প্রত্যেকেই প্রতিভাধর এবং সে কারণেই প্রেসিডেন্ট অভির মা-কে রত্নপ্রসবিনী জননীর সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

২৭ অক্টোবর নিহত ছাত্রদলের মির্জা গালিব ছাত্রজীবনে দারুন মেধাবী ছিলেন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পান। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ষ্টার মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হন। সাহসী এই তরুণ গোপনে কবিতা লিখতেন। আড়াল করা কষ্টগুলো কবিতার খাতায় সযত্নে তুলে রাখতেন। জাসদের মুকুলও মেধাবী ছাত্র। এখন অবশিষ্ট জীবন নিয়ে একটি দৈনিকে কাজ করছেন। 'আ'-আদ্যাক্ষরযুক্ত জাসদের আরেকজন ক্যাডার অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র। বক্তৃতা-আবৃত্তিতে তার যোগ্যতা উজ্জল হলেও তিনি ক্রমশ: সম্ভাবনাহীন মানুষে পরিণত হয়ে ছিলেন।

ছাত্রলীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড গ্রুপের (আ-আ) বিশ্বজিৎ বাণিজ্য বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। একই সংগঠনের ক্যাডার মাঈনুদ্দীন দুটো প্রথম শ্রেণী নিয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করেন।

এভাবেই সময়ের সাহসী ও সম্ভাবনাময় সন্তানেরা হাতে গোনা 'গড ফাদার'দের পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। আর্মড্ ক্যাডারদের নির্মমতা ও তৎপরতায় ক্রমশ: কলুষিত হচ্ছে দেশের শিক্ষাঙ্গন। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির সীমানা কোন পর্যন্ত যাবে আমরা কেউ জানি না। আর্মড্ ক্যাডারদের প্রতিরোধ নিয়ে নেতৃবৃন্দের টেবিলে অনেক মহাজনী বাক্য বিনিময় হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বৈঠকের পর বৈঠক বসেছে। ফলাফল শূন্য। ছদ্মবেশী রাজনীতির আড়ালে সন্ত্রাস নতুন পথে নতুন নিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এখনো

Dhaka University Institutional Repository

কেউ দেয়াল তোলেনি। প্রতিরোধ আর প্রতিকারের বেষ্টনী নির্মাণে কেউ কি এগিয়ে আসবে না? এ প্রশ্ন দেশের সকল শান্তিকামী মানুষের।

• অস্ত্র ও মূল্য

মাত্র সেদিন, ১৯৬০ এর দশকেও দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বলতে ছিল কেবল হাতাহাতি, মারামারি। খুব বেশি হলে গজারীর লাঠি, হকিষ্টিক কিংবা লোহার রড, চেইন, সেভেন গিয়ারের ট্রিগার আর পাঞ্জা শোভা পেত পেশীবানদের হাতে। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে যায় স্বাধীনতার পর। স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে প্রথম অস্ত্রের ব্যবহার হয় '৭৩ সালে। এ সময় ডাকসু নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় ঠেকাতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নির্বাচন ষানচাল করে দেয়। এই ছিনতাই' কর্মে ব্যবহৃত হয় কয়েকটি সাধারণ পিস্তল এবং হালকা বোমা। ব্যবহৃত হকিষ্টিক কিংবা লোহার রড বর্তমান সময়ের আর্মড ক্যাডারদের কাছে স্রেফ খেলার উপকরণ মাত্র। সে সব অস্ত্রের কথা শুনলে এরা উপহাসের হাসি হাসে। দেশের তাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাডারদের হাতে এখন কাটা রাইফেল থেকে শুরু করে আধুনিক ট্রেজার হাওয়াই পর্যন্ত শোভা পায়। বহনযোগ্যতা এবং সহজে ব্যবহারযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে ক্যাডাররা তাদের প্রিয় আর্মস নির্বাচন করে। ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রের বিবরণ ও মূল্যমান সম্পর্কে ধারণা নেয়া গেলেই সহজে অনুমান করা যাবে, আর্মড্ ক্যাডাররা কতটা আধুনিক এবং শক্তিমান ছিল।

• লাইট গান (এল.জি)

লাইট গান। সংক্ষেপে এল.জি. নামে পরিচিত। এল.জি. এক ধরনের হালকা বন্দুক। এই অস্ত্রে কার্তুজ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ শ্রেণীর অস্ত্র বলে এল.জি- র ব্যবহার মফস্বল এলাকায় অধিক। তবে বার্মিজ এল.জি. গুলোর চাহিদা অনেক। বার্মিজ এল.জি-র পাইপ খুবই পুরু। কয়েকবার ফায়ার করার পরও পাইপ গরম হয় না এবং ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমাদের দেশীয় লেদ মেশিনে তৈরি এল.জি- ফায়ারিং-এ বিকট শব্দ হয়। একটি বার্মিজ এল.জি-র দাম অবৈধ বাজারে ৭ থেকে ১০ হাজার টাকা এবং দেশীয় এল.জি-র দাম ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা ছিল।

• পিস্তল

আকারে ক্ষুদে হওয়ায় ক্যাডারদের কাছে পিস্তল একটি প্রিয় অস্ত্র। তবে শীর্ষ পর্যায়ের ক্যাডাররাই শুধু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে সাধারণত পিস্তল ব্যবহার করে। মুখোমুখি গোলাগুলিতে পিস্তলের ব্যবহার খুবই কম। দেশীয় লেদ মেশিনে তৈরি পিস্তলের ব্যবহার ও গ্রহনযোগ্যতাও কম। ঢাকার ধোলাইখাল, যশোর, বগুড়া ও ফরিদপুর সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় লেদ মেশিনে তৈরি পিস্তলের দাম ৫ থেকে ৭ হাজার টাকা ছিল। স্পেয়ার ম্যাগজিনের সুবিধা থাকলে অনেক ক্যাডার পিস্তল ব্যবহারে আগ্রহী হয়। ক্যাডারদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় পিস্তল পয়েন্ট টু-টু। কারণ পয়েন্ট টু-টু থেকে বোরের গুলি সহজলভ্য। এ পিস্তলের দাম ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা ছিল। পয়েন্ট টু-টু গ্রুপের আরেকটি আধুনিক অস্ত্র ওয়ালথার পিপিকে। দাম ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা ছিল। স্প্যানিশ পয়েন্ট টু ফাইভ পিস্তলের দাম ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা ছিল। পিস্তলের মাঝে শক্তিশালী হিসেবে সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ, সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু বা ফাইভ ষ্টার এবং নাইন এমএম খুবই দুর্লভ এবং শক্তিশালী।

Dhaka University Institutional Repository

দু'টি ছাত্র সংগঠনের দু'জন শীর্ষস্থানীয় ক্যাডার এই শ্রেণীর পিস্তল ব্যবহার করে । এই নাইন এমএম পিস্তলগুলোর দাম মাত্র ৩৫ হাজার টাকা ছিল।

• রিভলবার

এক হাতে ব্যবহার এবং বোল্ট টানার ঝামেলা পোহাতে হয় না বলে অনেক ক্যাডার রিভলবার ব্যবহার করে। ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের সূচনা মুহূর্তে একটি দলের তিনজন ক্যাডার প্রথমে রিভলবার দিয়েই গুলি করে। তবে পিস্তলের মতো মুখোমুখী ফাইটে রিভলবার সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। পাকিস্তানী পয়েন্ট থ্রী টু বোরের রিভলবার ১৬ থেকে ২৫ হাজার টাকা, জার্মান মেড পয়েন্ট থ্রী টু বোরের স্মিথ এন্ড ওয়েসনের রিভলবার ৩৫ থেকে ৪২ হাজার টাকা, আমেরিকার তৈরি পয়েন্ট থ্রী টু কোল্ট রিভলবার প্রায় ৪০ টাকা, থ্রী এইট শর্টের মূল্য প্রায় ৩৫ হাজার টাকা, পয়েন্ট টু-টু বোরের ওয়েবলী এন্ড স্কটের মূল্য প্রায় ২৮ হাজার টাকা ছিল। তবে আমেরিকায় তৈরি পয়েন্ট ফোর ফাইভ রিভলবার খুবই শক্তিশালী এবং দুষ্প্রাপ্য। এই রিভলবারে থ্রী নট থ্রীর গুলিও ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে পয়েন্ট ফোর ফাইভের এটি রিভলবার মালিবাগে অবস্থানরত এরশাদের জাতীয় যুব সংহতির উচ্চপর্যায়ের এক নেতার কাছে আছে বলে জানা যায়। এই রিভলবারের দাম অবৈধ বাজারে প্রায় ৬৫ হাজার টাকা ছিল।

• রাইফেল

আর্মড্ ক্যাডারদের সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র কাটা রাইফেল। সহজেই পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে বহন করা যায় বলে কাটা রাইফেলের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহার অধিক। আরেকটি সুবিধা হলো, কাটা রাইফেলের ফায়ারিং- এর শব্দ প্রচন্ড- যা নিমিষেই চারপাশে আতংক সৃষ্টি করে। এর গুলিও সহজলভ্য। থ্রী নট থ্রীর কর্তিত সংস্করণ একটি কাটা রাইফেলের মূল্য ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা।

রাইফেলের মাঝে আরেকটি আধুনিক নাম সেলফ-লোডেড রাইফেল। সংক্ষেপে এসএলআর। এই রাইফেলের সুবিধা হলো, বারবার তাক করতে হয় না। এর দাম প্রায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। রাইফেলের অন্য এক নতুন সংস্করণ সেভেন এমএম। এর দাম প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া মার্ক ফোর রাইফেলের মূল্য ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা ছিল। বছর পাঁচেক আগে দুর্লভ হলেও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাইনিজ রাইফেলের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। এই রাইফেলের সুবিধা হলো, বারবার বোল্ট টানতে হয় না। ৮৭ সালের সংঘর্ষে ৯০-এর অভি-নীরু চক্রের সাথে সংঘর্ষে এবং ৯১ এর ২৭ অক্টোবরের সংঘর্ষে চাইনিজ রাইফেলের গুলির আওয়াজ শোনা গেছে।

• ষ্টেনগান, শর্টগান, মেশিনগান

ব্রাশ ফায়ারিং এবং সিঙ্গেল শর্টের জন্য ক্যাডারদের কাছে ষ্টেনগান, শর্টগান এবং মেশিনগান খুবই আদৃত অস্ত্র। জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিবদ্যালয় ক্যাম্পাসে ষ্টেনগানের প্রথম ব্যবহার করেন ছাত্র দল থেকে বহিস্কৃত নেতা নীরু। এরপর থেকে ছাত্রসংগঠনগুলোর আর্মড্ ক্যাডাররা আধুনিক অস্ত্র হিশবে ষ্টেনগান, শর্টগান ও মেশিনগান, সংগ্রহ শুরু করে। ষ্টেনগানের মূল্য প্রায় ৬০ হাজার টাকা। শর্টগান ও মেশিনগানের মূল্য যথাক্রমে প্রায় ৬০ হাজার থেকে এক লাখ এবং ৭০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা ছিল। এই শ্রেণীর আরেকটি আধুনিক অস্ত্র বৃটিশ কারবাইন। এই অস্ত্রেও সিঙ্গেল শর্ট এবং ব্রাশফায়ার করা যায়। আর্মড্ ক্যাডারদের কিংবদন্তীর নায়ক অভির প্রিয় অস্ত্র এই বৃটিশ কারবাইন। দাম ৬০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

• জি-থ্রী রাইফেল

সাধারণ রাইফেলের চেয়ে অধিক রেঞ্জের অধিকারী জি-থ্রী রাইফেল অত্যন্ত শক্তিশালী। একটি ছাত্র সংগঠনের দু'টি অঞ্চলভিত্তিক গ্রুপের কাছে একটি করে এবং অন্য একটি বিপ্লববাদী ছাত্র সংগঠনের কাছে একটি জি-থ্রি রাইফেল আছে। কআর কোনো সংগঠনের কাছে এটা নেই। এই রাইফেলের দাম প্রায় ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ছিল।

• ট্রেজার হাওয়াই, রকেট লাঞ্চার

আর্মড্ ক্যাডাররা দিন-দিন আধুনিক হচ্ছে। বৃটিশ কারবাইন, জি-থ্রী শর্টগানের ব্যবহার ছাপিয়ে ক্যাম্পাসে মাঝে-মাঝেই আরো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের নাম শোনা যাচ্ছে। এরকম দু'টি অস্ত্রের নাম ট্রেজার হাওয়াই এবং রকেট লাঞ্চার । ট্রেজার হাওয়াই- লক্ষ্য স্থির করে অটোমেটিক বাটনে চাপ দিলেই একটি শেল বেরিয়ে মুহূর্তে লক্ষ্যস্থল ধ্বংস করে দেবে। একই পদ্ধতিতে রকেট লাঞ্চারও ব্যবহৃত হয়। এ দু টো অস্ত্র ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে ব্যবহৃত না হলেও একটি বৃহৎ ছাত্র সংগঠন দাবি করে থাকে যে অস্ত্র দু'টো তাদের দখলে আছে। এই স্বীকারোক্তি প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে দেয় বলে আর্মড্ ক্যাডাররা একে গুজব হিসেবে মনে করে।

• বোমা

আশির দশকেও আর্মড্ ক্যাডাররা ব্যাপকহারে বোমাবাজির মাধ্যমে সন্ত্রাস চালাতো। চলতি সময়ে বোমার প্রচলনক নিতান্তই কালে-ভদ্রে লক্ষ্য করা যায়। তবে ৮৯ সালে দু'টি ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে ভারি ধরনের বোমা ব্যবহৃত হয়। ৯১ -এর ২৭ অক্টোবরের সংঘর্ষেও একটি সংগঠন ক্যাম্পাসে গ্রেনেড এনেছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা ব্যবহার করার সুযোগ আসেনি। একটি গ্রেনেডের মূল্য ১ হাজার থেকে ২৫০০ টাকা এবং ককটেলের মূল্য একশ থেকে দেড়শ টাকা।

• অস্ত্রের গুলি

অস্ত্র থাকলে গুলি সংগ্রহ করা কঠিন কিছু নয়। বিভিন্ন উৎস থেকে গুলি সরবারাহ বন্ধ হলে মাঝে-মাঝে গুলি দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। যেমন গত ২৭ অক্টোবরের সংঘর্ষের শেষ মুহূর্তে একটি ছাত্র সংগঠনের গুলির মজুদ প্রায় শুন্যের কোঠায় এসে ছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বিরতি দেয়া হয়। অস্ত্র বুঝে গুলির দাম নির্ধারিত হয়। ৩৮ বোর রিভলবারের গুলির দাম প্রতি গুলি ৫০ টাকা, কাটা এসএমজি-র গুলি ৮০ টাকা, জি-থ্রী রাইফেলের গুলি ৪০ টাকা, এসএলআর-এর গুলি ৭০ টাকা, কাটা রাইফেলের গুলি ৫০ টাকা এবং বন্দুকের কার্তুজ ২০ থেকে ২৫ টাকা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

• অস্ত্রের উৎস বা সোর্স

অস্ত্র সংগ্রহ এবং নতুন নতুন উৎস সৃষ্টি করা আর্মড্ ক্যাডারদের অন্যতম দায়িত্ব। শীর্ষ পর্যায়ের ক্যাডাররা সব সময় নির্দিষ্ট সূত্র বা চেইন এর মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করে। অস্ত্রের উৎসমুখ সম্পর্কে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। উৎস প্রকাশিত হলে সমূহ বিপদ। গোয়েন্দা পুলিশের ঝামেলা তো আছেই, প্রতিপক্ষের কাছেও জানাজানির ভয়ে ক্যাডাররা অস্ত্র সংগ্রহের নিজ-নিজ উৎস গোপন করে রাখে। আন্ডারগ্রাউন্ডে গোপন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অস্ত্র সংগ্রহের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে চমকপ্রদ কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে- যা রীতিমতো বিস্ময়কর।

শুরুতেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, গুটিকয়েক আর্মড্ ক্যাডার ছাড়া অধিকাংশেরই মনে-প্রাণে সমর্থিত কোনো রাজনৈতিক দল নেই। বিভিন্ন দলের আড়ালে এরা বিচরণ করে। বলা বাহুল্য, আন্ডারগ্রাউন্ডে সবার সাথে সবার নিবিড় যোগাযোগ থাকে। যেমন একটি ছাত্র সংগঠনের কোনো এক গ্রুপের সঙ্গে আপাত-বিরোধী অন্য একটি সংগঠনের ক্যাডারদের গোপন সম্পর্ক ও লেনদেন হতে পারে, হয়ও। জানা যায়, অভি নাকি এক সময় বিরোধী একটি সংগঠনের ল-আদ্যাক্ষরযুক্ত একজনের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করতেন।

দেশের সাধারণ সন্ত্রাসীরা যেভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে তার বিবরণ আমরা উল্লেখ করবো না। সাম্প্রতিক সময়ে আর্মড্ ক্যাডারদের অস্ত্র সংগ্রহের উৎস নিয়েই এখানে আলোচনা হবে।
স্বাধীনতার পর মূলত ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন এবং পরবর্তীকালে সে দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি দলের কাছে কিছু অস্ত্র সংরক্ষিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর অজমাকৃত অস্ত্রগুলোই এ সময় সংরক্ষণের তালিকায় ছিল। এছাড়া কোনো একটি দল তার এক গোপন বাহিনীর জন্য দেশীয় যন্ত্রপাতি এবং কলাকৌশলে কিছু হালকা ধরনের অস্ত্র তৈরি করতো। একটি ছাত্র সংগঠনের আর্মড্ ক্যাডারদের শীর্ষ নেতা ছিলেন আ-আদ্যাক্ষরযুক্ত একজন। এ সময় রাজধানীতে তার বিরোধী আরো একটি গ্রুপ ছিল। ৭৭ সালের দিকে এই দু'গ্রুপের মধ্যকার সংঘর্ষে ইনু, গোগা নামের দু'জন এবং ছাত্রলীগ নেতা আওরঙ্গের ভাই রন্টু মারা যায়। এর পর হুলিয়া নিয়ে মূল নেতা ভারতে পালিয়ে গেলে একটি ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রের উৎস দুর্বল হয়ে পড়ে বলে জানা যায়। ওই মূল নেতার অবর্তমানে ছাত্র সংগঠনটির আর্মড্ ক্যাডারদের নেতৃত্ব দেন একজন শীর্ষস্থানীয় যুবনেতা।

• যেখানে থেকে আসে

অর্ডিন্যান্স ডিপো, বিভিন্ন থানা, জেলখানার মালখানা ও অস্ত্র ট্রেজারী থেকে দুর্নীতিবাজ কর্ম চারীদের যোগসাজশে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। এসব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের জমাকৃত অকেজো অস্ত্র থাকে। ডিপো, থানা বা ট্রেজারীর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীদের সাথে ক্যাডারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। অস্ত্রের অকেজো বিভিন্ন অংশ বাইরে পাচার হয়ে যায়। পরে অকেজো অস্ত্রের একটির অংশ আরেকটির শরীরে লাগিয়ে একটি সম্পূর্ণ সক্রিয় অস্ত্র তৈরি করা হয়। ৮৫ সালের দিকে এই পদ্ধতিতে যশোরের একটা ডিপো থেকে একজন শীর্ষ পর্যায়ের আর্মড্ ক্যাডার ১৭ টি ফাইভ ষ্টার পিস্তল সংগ্রহ করে। অবশ্য শেষ সময়ে ডিপোর কর্মচারী ধরা পড়ে শ্রীঘরে যায়। সুযোগ বুঝে এসব স্পট থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়

থ্রী নট থ্রী এবং কাটা রাইফেল সংগ্রহ করা হয় লুট করা অস্ত্র ভান্ডার থেকে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন গোপন পার্টি এবং ডাকাত দল থানা, লঞ্চ, ব্যাংক এবং টহল পুলিশদের আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

করে যেসব অস্ত্র সংগ্রহ করে সেগুলোর অধিকাংশ থ্রী নট থ্রী রাইফেল। এই সব রাইফেলের কর্তিত সংস্করণ হয়ে কাটা রাইফেল চড়া দামে অবৈধ বাজারে চলে আসে। পূর্ব যোগাযোগের ভিত্তিতে উৎসমুখে অস্ত্র পৌঁছে যায়। একটি ছাত্র সংগঠনের ফরিদপুর ও বরিশাল গ্রুপে এই নিয়মে বেশ কয়েকটি কাটা রাইফেল এসেছে বলে জানা যায়।

• সীমান্ত এলাকার সোর্স

দেশের সীমান্ত এলাকা অস্ত্র সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ স্পট। আধুনিক এবং তুলনামূলক ভাবে সস্তা বলে ক্যাডাররা সীমান্ত এলাকায় অস্ত্র লেনদেনে অধিক আগ্রহী। রাজশাহী, বগুড়া, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, যশোর ও বরিশাল এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকায় পেশাদার অস্ত্র ব্যবসায়ীরা মিডলম্যান হিশেবে অস্ত্র সরবরাহ করে। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু 'সিক্রেট' অঞ্চল অস্ত্র সংগ্রহের মূল উৎস। এসব এলাকায় বসবাসকারী শান্তিবাহিনীর নিষ্ক্রিয় অংশটি গোপন চেইনে অস্ত্র বিক্রি করে। এই সোর্স থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্মড্ ক্যাডাররাও অস্ত্র সংগ্রহ করে। ইসলামী ছাত্র শিবির এবং মুলত চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি দলের ই-আদ্যাক্ষ রযুক্ত আর্মড্ ক্যাডারের সঙ্গে ওই অঞ্চলের সোর্সগুলোর ভাল যোগাযোগ আছে বলে জানা যায়। এই যোগাযোগের ভিত্তিতে ঢাকার আর্মড্ ক্যাডাররাও যোগাযোগ রক্ষা করে। এসব সোর্স থেকে ৯০ সালের দিকে ক্যাম্পাসের দু'টি সংগঠন একটি করে জি থ্রী এবং চাইনিজ রাইফেল কেনে। কিছুদিন আগে আরেকটি সংগঠন একটি জি-থ্রী রাইফেল সংগ্রহ করে। শান্তি বাহিনীর নিষ্ক্রিয় অংশ ছাড়াও বার্মা থেকে বিতারিড়ত রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটি অংশ অর্থের প্রয়োজনে মাঝে আধুনিক কিছু অস্ত্র বিক্রি করেছে বলে জানা যায়।

চট্টগ্রামে অস্ত্রের উৎসের প্রধান স্পটগুলোর মধ্যে কাঠগড়, গহীরা, সীতাকুন্ড, আনোয়ারা ও আগ্রাবাদের 'সিঙ্গাপুর মার্কেট' অন্যতম। স্থানীয় ভাষায় 'বারখাড়ী' বলে পরিচিত এলাকাগুলো অস্ত্র লেনদেনের সুবিধাজনক ক্ষেত্র। এসব অঞ্চলে সাধারণত মালবাহী জাহাজ নোঙর করা হয়। নানান ধরনের জিনিসপত্রের মোড়কে অস্ত্র পাচার হয়ে যায়। আনোয়ারা অঞ্চলের 'শিকলবাহা' এলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পট।

• রাইফেল ক্লাব

দেশের রাইফেল ক্লাবগুলোর অস্ত্র সংগ্রহের আরেরকটি উৎস। রাইফেল ক্লাবের দুর্নীতিবাজ ও অর্থলোভী কর্মচারী এবং সদস্যরা লাইসেন্সের সুযোগ নিয়ে অস্ত্র ও গুলি পাচার করে। এভাবে ৮৯ সালে ঢাকা রাইফেল ক্লাবের ১৭ টি রাইফেল পাচার হয় এবং এক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। রাইফেল ক্লাব ছাড়াও ইদানীংকালে শুটিং ফেডারেশনকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। প্রতি বছর শুটিং ফেডারেশন লাখ-লাখ টাকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমদানী করে। সূত্র মতে জানা যায়, বিগত কয়েক বছরে এই ফেডারেশন থেকে বহু অস্ত্র ও গোলাবারুদ অবৈধ পন্থায় বিভিন্ন গ্রুপের দখলে গেছে। সম্প্রতি শূটিং ফেডারেশনের এক অডিট রিপোর্টে দেখা যায়, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিপুল পরিমান গোলাবারুদ ও অস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, ভূয়া সদস্যদের মধ্যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিতরণ করা হয়েছে এবং শূটিং ক্লাবের সাথে কোনো কালেই জড়িত নয় এমন সব ব্যক্তি ক্লাব থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে। নিরীক্ষা দল এদের কয়েক জনের না উদ্ধার ও উল্লেখ করেছে। এদের মধ্যে শূটিং ক্লাবের একজন সদস্যের স্ত্রী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছাড়াই একটি একনলা ১২ বোর বেরেটা বন্দুক সংগ্রহ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

• ভারত ও বুড়িগঙ্গার তীর

ভারতের কিছু অঞ্চলের আন্ডারগ্রাউন্ড নেতাদের সাথে আমাদের দেশের নেতৃপর্যায়ের আর্মড ক্যাডারদের 'গুড রিলেশন' আছে। ভারতে তৈরি অস্ত্রের দাম কিছুটা কম এবং যন্ত্রপাতিও দেশে সহজলভ্য বলে অনেক ক্যাডার ভারতীয় অস্ত্র ব্যবহার করে। কোনো একটি সংগঠনের প্রাক্তন নেতা ভারতে থাকাকালে অনেকেই গোপন চেইনে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করত। বিনিময়ে সময়মতো প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে যেতো, তিনিও পেতেন নগদ অর্থ।

শহর অঞ্চলের আর্মড্ ক্যাডারদের অন্যতম উৎস হলো মফস্বলের বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ। মফস্বলের চেইনের সাথে শহরের ক্যাডাররা সব সময় সম্পর্ক রক্ষা করে। অ্যাকশনের সময় শহরে খবর চলে যায়। নিরাপত্তার খাতিরে মফস্বল এলাকায় অস্ত্র মজুদ করা হয়।

বিপ্লবপন্থী একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের অস্ত্র সরবরাহের প্রধান উৎস ঢাকার গুলবাগ এলাকা। গুলবাগের বিশেষ দু'জনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে অস্ত্র চলে যায়। অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের একটি গ্রুপের অস্ত্র আসে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত কেরানীগঞ্জ থেকে। এছাড়া কিছুদিন আগে পুলিশের হাতে গ্রেফতারবরণকারী রাসু ও তনাই একটি ছাত্র সংগঠনের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী ছিল। রায়েরবাজারের একজন সন্ত্রাসী সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়ার পর জানা গেছে যে, সেও ক্যাম্পাসে বিভিন্ন দলের ক্যাডারদের কাছে ব্যবসায় খাতিরে অস্ত্র সরবরাহ করতো।

উল্লিখিত উৎসগুলো ছাড়াও ক্যাডারা কিছু লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিককে ব্যবহার করে। সি-আদ্যাক্ষরযুক্ত একজন চিকিৎসক সম্প্রতি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তার তিনটি অস্ত্রের লাইসেন্স একটি সংগঠনের ক্যাডাররা ব্যবহার করতো বলে একটি সূত্রে জানা যায়।

• ক্যাডারদের গ্রুপিং- লবিং

গ্রুপিং ও লবিং না করে কোনো ক্যাডার শক্তি ও ক্ষমতা বাড়াতে পারে না। নিজ সংগঠনের নতুন রিক্রুট করা কর্মীদের সহ বাইরের নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্ক বজায় না রাখলে অস্ত্র ও অর্থের দু'টি উৎসই ম্লান হয়ে যায়। আঞ্চলিকতা , ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক, অস্ত্রের লেনদেন এবং পারস্পারিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই লবিং করা হয়। দলের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে গ্রুপিং লবিং অনিবার্য হয়ে দাড়ায়। এমন বহু সংগঠনের আর্মড্ ক্যাডারদের গ্রুপিং লবিং এখানে উল্লেখ করা হলো।

• জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলে দুর্ধষ কোনো আর্মড্ ক্যাডার ছিল না। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দলের কর্মীদের কাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে দু'টি নাম। নীরু ও বাবলু। প্রাথমিক অবস্থায় নীরু বাবলু ঢাকা কলেজে নিজ সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য সাহসী ভুমিকা পালন করেন। নীরু-বাবলুর সাহসিকতা প্রশংসিত হয় সাধারণ কর্মীদের মাঝে। এর পর পতিত সরকার এরশাদের রোষানলে পড়েন ছাত্রদল নেতা সানাউল হক নীরু। ৮৭ সালে মহসীন হলে আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন বাবলু। ছাত্রদলের আন্ডারগ্রাউন্ডের রাজনীতি কিছু দিনের জন্য ধীর হয়ে ওঠে। এই অন্তিম সময়ে গোলাম ফারুক অভি সশস্ত্র গ্রুপের নেতৃত্ব দিতে জেগে ওঠেন। অভি। ছিলেন নীরু-বাবলুর অন্যতম

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগী। বরিশাল জেলার অধিবাসী অভি প্রথমেই নিজ অঞ্চলের ক্যাডারদের দলে বেড়াতে থাকেন। একে-একে সজল, মাসুদ, জুয়েল প্রমুখ, অভির সাথে হাত মেলান। অভির বুদ্ধিমত্তা এবং দুর্ধর্ষতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক তরুণ ক্যাডার অভির দলে নাম লেখান। বিভিন্ন চেইন থেকে অভির কাছে অস্ত্র জমা হতে থাকে। ছাত্রদলের মাঝে তখন অভিই ছিলেন টপ আর্মড্ ক্যাডার। কিন্তু কলাবাগানের এক কমিশনার নির্বাচন নিয়ে ছাত্র-ক্যাডারদের মাঝে বিভক্তির সূচনা হয়। ছাত্রদলের আরেকজন ক্যাডার বরাবর অভি-বিরোধী ছিলেন। কলাবাগানের কমিশনার নির্বাচনকে কেন্দ্র কের অভির সাতে তার দ্বন্দ্ব ঘটে। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী দুই কমিশনার প্রার্থীকে সমর্থন করেন। এভাবে পরবর্তীতে বিভিন্ন ঘটনায় অভি এবং ওই ক্যাডারটির দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ক্যাডাররাও দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। অভি ছাত্রলীগের লিয়াকতের সাথে চেইন রক্ষা করেন। দু'পক্ষের কাছেই প্রায় একই ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আসতে থাকে। এক পর্যায়ে গুজব ওঠে যে, অভির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাডারটি এরশাদের সাথে হাত মিলিয়ে নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ সংগঠিত করছেন। এসময় কিছু ক্যাডার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। কিন্তু ৮৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী হিশেবে চিহ্নিত ১১জন ছাত্রকে বহিষ্কার করলে দেখা যায়, তালিকায় দু'জনের নামই রয়েছে। প্রথম অবস্থায় অভি কারাবরণ করলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী সুযোগ বুঝে কাম্পাসেক্যাডাদের সংগঠিত করতে থাকেন। ৯০ এর ভাকসু নির্বাচনের প্যানেল নিয়ে গ্রুপিং চরম পর্যায়ে পৌঁছে। নীরু ও অভি সমর্থন দেন একটি বিশেষ প্যানেলকে। এ নিয়ে সংঘাত-সংঘর্ষ কম হয়নি। এ সময় খবর ছড়ায়, অভি নীরু মূলত এরশাদ সরকারের পক্ষে কাজ করছেন। ক্যাম্পাসের কর্মীদের মাঝে এই সংবাদ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ২৪ নভেম্বর ছাত্রদল থেকে অভি ও নীরুকে বহিস্কার করা হয়। অপমানিত অভি-নীরু চক্র ২৫ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সমাবেশে হামলা চালান। পরবর্তী উত্তাল দিনগুলোতে সেই তরুণ দু'জন আর্মড্ ক্যাডারদের সংগঠিত করেন। অপরদিকে অভি-নীরুর সাথে সজল, মাসুদ, জুয়েল এবং পুরনো ঢাকার সগীর সহ কয়েকজন ক্যাডার একাত্ম হয়ে অ্যাকশনে অংশ গ্রহণ করে। গণঅভ্যুত্থানের দিনগুলোতে অভির প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কারাবন্দী থাকায় পরবর্তীকালের দু-জন আর্মড্ ক্যাডার ক্যাম্পাসে জনপ্রিয়তা পেয়ে যান। কিন্তু অভির প্রতিদ্বন্দ্বী জেল থেকে মুক্তি পেলে পরবর্তী দু' জনের গ্রুপের সাথে শীতল সম্পর্ক তৈরি হয়। অভির দল থেকে কিছু ক্যাডার এসে যোগ দেন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে। কিন্তু ২৭ অক্টোবরের সংঘর্ষের পর ছাত্রদলের ক্যাডার রাজনীতিতে যথেষ্ট রদবদল হয়। এখন ক্যাম্পাসে একটি গ্রুপ সম্পূর্ণ নীরব হয়ে আছে। আর অভির সেই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাডারটি ঘোষণা করেছেন যে তিনি ছাত্র রাজনীতি থেকে সরে দাড়াচ্ছেন। ফলে তরুণ একটি আর্মড্ ক্যাডার গ্রুপ মাথা তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে এখন। এই গ্রুপটি ছাত্র দলকে আশ্রয় করলে বিস্মিত হওয়ার কারণ থাকবে না। ছাত্রলীগের অব্যাহত উস্কানী ও আক্রমণের মুখে ছাত্রদলও বাধ্য হয়ে সশস্ত্র রাজনীতির পথে পা ফেরতে পারে।

• ক্যাডারদের নেটওয়ার্ক

আর্মড্ ক্যাডারদের নেটওয়ার্ক যে কত বিস্তৃত সে কথা হঠাৎ করে ধারণা করা যাবে না। খোদ রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এমনকি বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও ক্যাডারদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। অস্ত্র সংগ্রহ ও রাজনৈতিক শেলটার এর জন্যই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পেশাদার সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে অস্ত্র ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী এবং সাধারণ মাস্তান শ্রেণীর সাথে 'কানেকশন' রক্ষা করা হয়। এই নেটওয়ার্ক মহল্লা থেকে শুরু হয়, কিন্তু এর শেষ কারো জানা নেই। পুলিশের গোপন খাতায় এদের নাম আছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে এদের পরিচয় আছে। তবে তারা থাকে ধরাছোয়ার বাইরে। শহরব্যাপী বিচরণ করে দাপটের সাথে। এদের মুষ্টিমেয় রাজনীতি সচেতন, অধিকাংশ পেশাদার সন্ত্রাসী। বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত শহর জুড়ে নেটওয়ার্কের সক্রিয় সদস্যদের একটি খন্ডিত চিত্র উল্লেখ করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

পুরানো ঢাকার সিংটোলা এলাকার দুই সহোদর লোটন-ঝোটন জাতীয় পার্টির পক্ষে কাজ করতেন। ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে অভি-নীরু চক্রের সাথে এই দুই ভাই সদলবলে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে হামলা চালান। পাতলাখান এলাকায় আছেন টিটু, মুন্না, শফিক, সাঈদ ও টনি। রাজার দেউড়িতে নান্টু, ইসলাম, মোহসীন, গোলাপ ও স্বপন। বংশাল রোডে শীর্ষ তিনটি নাম হলো হোসেন, মোল্লা, তনাই মোল্লা ও আকবর শেঠ। শেষোক্ত দু'জনের প্রথম জন সম্প্রতি পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছেন এবং শেষজন প্রতিপক্ষের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন । লালবাগে নেওয়াজ ও সোহেলের নাম আন্ডারগ্রাউন্ডে সবার জানা। রায়েরবাজার এলাকার সৈয়দ সেলিম আহমেদ অশ্রু, জাভেদ, কালা ও লিয়াকত শীর্ষ শ্রেণীর। এদের মধ্যে সেলিম সম্প্রতি অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। ক্যাম্পাসে অস্ত্র সরবারাহের অভিযোগেও তিনি অভিযুক্ত।

গুলবাগে জাসদের একদা আর্মড ক্যাডার জিন্নাহ, মোতাহার ও শিপনের বসবাস। ক্যাম্পাসের ক্যাডাররা এই এলাকার সাথে সর্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন। মোহাম্মাদপুরের টিপু অনেক দলের কাছেই বিশ্বস্ত নাম শাহজাহানপুরে আছেন মাইকেল টিটু, শাহীন, জর্জ মামুন, আমান, সোহেল, সারোয়ার, কাজন। এই এলাকায় এবং খিলগাঁও- বাসাবোতে একটি পার্টির অনেক ক্যাডারের বসবাস। যাত্রাবাড়ির লিফটন, মুন্না ও বেলায়েত খুবই দুর্ধর্ষ। গোপীবাগের আসলাম, মহী, আলাউদ্দিন, শাহজাহান, মিঠু, পছলা বাবু এবং জাতীয় পার্টির ময়না অপরিচিত নয়। ঠাটারী বাজারে থাকেন হামিদ, ইকবাল, কামরুল। যোগীনগরের তানজীল এবং কলতাবাজারের সাগীর, বীনা, ইসহাক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রদের কাছে রীতিমতো ত্রাস।

রাজাবাজারের আনওয়ার মালা, সূত্রাপুরের শহীদ, পোস্তগোলার শাহাদাত কেউই আন্ডারগ্রাউন্ডে অপরিচিত নন। এরা ভিন্ন ভিন্ন গড ফাদার' এর হুকুম পালন করলেও একে অপরের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখেন এবং পরস্পরকে বিশ্বাস করেন। অনেকেই অ্যাকশনের সময় ক্যাম্পাসে পৌছেযান কিংবা নির্দিষ্ট চেইনে পৌছে দেন অস্ত্র। পূর্ব যোগাযোগের ভিত্তিতে বিপদের মুহূর্তে ক্যাম্পাসের ক্যাডাররা নিরাপদ আশ্রয় দেন। ধীরে ধীরে আন্তরিকতা গাঢ় হয়। গড়ে ওঠে দৃঢ় সম্পর্ক। (নামা ও তথ্যগুলি স্থানীয়ভাবে প্রচারিত পোষ্টার লিফলেট এবং বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত)

- **ট্যাক্স: বিপুল অর্থের উৎস**

আপিন একজন লাইসেন্সধারী ঠিকাদার কিংবা কোনো দোকানের মালিক। বিপুল অর্থ আছে, কিন্তু গোবেচারা। ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করেন না। অথবা অবৈধ ব্যবসা করে প্রচুর কালো টাকা উপার্জন করেছেন। সময়মতো পৌছে যাবে ওরা। ইনিয়ে বিনিয়ে নয়, সরাসরি রুক্ষ কণ্ঠে উচ্চারণ করবে তাদের দাবির কথা। ট্যাক্স হ্যা আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে। আপনার খেয়াল-খুশি এক্ষেত্রে কাজে আসবে না। ওদের দাবি শুনতে হবে এবং মানতেও হবে। প্রতি সপ্তাহে, মাসে কিংবা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আপনার মুখোমুখি হবে ওরা। ট্যাক্স আদায় আর্মড ক্যাডারদের রুটিন বাধা কাজ। বিলাসী জীবন যাপন এং অস্ত্র-গোলাবারুদ কেনার অর্থ যোগাড় করতে ট্যাক্স আদায় ক্যাডাদের বিকল্পহীন দায়িত্ব। এই ট্যাক্স আদায়কে কেন্দ্র করে ঘটে যায় প্রাণঘাতী সংঘর্ষ। একই লোকের কাছে একই সময়ে পৃথক দুই পক্ষ অর্থ দাবি করলে সংঘাতের সূচনা হয়। পরিণতিতে এই বিরোধ রাজনৈতিক রূপ নিয়ে নিশ্চিত লড়াইয়ের পথকে সুগম করে। ক্যাম্পাসে সংঘটিত বহু সংঘর্ষের নেপথ্য কারণ এই ট্যাক্স আদায়, শুধুমাত্র ট্যাক্স। বেশি

Dhaka University Institutional Repository

দিনের কথা নয়। গত বছরের ২৫ অক্টোবর। একটি ছাত্র সংগঠনের এক ক্যাডার সূর্যসেন হলের ক্যান্টিনে রাতের খাবার খাচ্ছেন। এমন সময় প্রতিপক্ষ অতর্কিত আক্রমণ করে তাকে ছুরিকাঘাত করে। দু'পায়ে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করে। কারণ ট্যাক্স, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের একটি ঠিকাদারী নিয়ে দু'পক্ষের মাঝে দ্বন্দ্বের নির্মম পরিণতি।

১৯ অক্টোবর। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাণাধীন ভবনের জন্য একটি ছাত্র সংগঠনের একজন ক্যাডার ঠিকাদারের কাছে ট্যাক্স দাবি করে। ঠিকাদারের পক্ষে ট্যাক্স না দিয়ে তাকে বন্দী করে রাখে। এ খবর পেয়ে জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের শীর্ষ স্থানীয় একজন তার মুক্তির দাবি জানিয়ে ঠিকাদারের কাছে চিঠি পর্যন্ত লেখেন। এ ঘটনায় ক্যাম্পাসের চারপাশে একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ৮/১০ টি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। দীর্ঘদিন বুয়েট বন্ধ থাকে।

ক্যাম্পাস এলাকায় উদয়ন স্কুলের উন্নয়নের কাজ শুধু বিভিন্ন গ্রুপের ক্যাডারদের অযৌক্তিক ট্যাক্সের দাবিতে ৮৬ থেকে ৮৯ সাল পর্যন্ত একটানা তিন বছর স্থগিত তাকে। ৯১ এর জুন মাসে মাহবুব হত্যার নেপথ্যেও ওই ট্যাক্স। বুয়েটের এক ঠিকাদারের কাছে ট্যাক্স দাবি করে একটি রাজনৈতিক দলের এক গ্রুপ, সেই সাথে কোনো একটি ছাত্র সংগঠনেরও একজন। দু'জনেরই নামের শুরু'ম' দিয়ে। একজন শেষ পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় করতে সফল হয়। কিন্তু অন্যজন ১৯ জুন বিকেলে টি.এস.সি-তে এসে এ নিয়ে বাদানুবাদ করেন। এক পর্যায়ে একজন 'ম' প্রতিপক্ষের এক হ এর গালে চড় মারলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন অন্য 'ম' তার ক্যাডারদের সংগঠিত করে বন্দুক যুদ্ধে নেমে পড়েন। এই যুদ্ধেই মাহবুব নিহত হন। ৮৭ সালে ছাত্রদল ও জাসদ ছাত্রলীগের সংঘর্ষের কারনও ওই ট্যাক্স। ঠিকাদারী ব্যবসার ট্যাক্স নিয়ে ছাত্রদলের নীরু ও জাসদের আকরামের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের রূপ নেয়।

ট্যাক্স আদায়ে অভিও কম যাননি। এলিফ্যান্ট রোডের এক ভবনের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান আজহার কন্সট্রাকশনের কাছ থেকে অভি একবার পাঁচ লাখ টাকা আদায় করেন। ট্যাক্স নিয়ে নিজ দলের মধ্যেও বিরোধ ঘটে। ৯১ এর জানুয়ারীতে ট্যাক্স নিয়ে সংঘর্ষ ঘটে মহসিন হলে। ট্যাক্স আদায় এবং এ নিয়ে সংঘর্ষের এরকম বিস্তর উদাহরণ আছে যা এখনো আড়ালে পড়ে আছে এবং রহস্যজনকভাবে আড়ালেই রয়ে যাবে।[১০] *জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৩ই জানুয়ারী থেকে২৫শে ডিশেম্বর ১৯৯২ইং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩ই জানুয়ারী ১৯৯২। ৫বর্ষ এক সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১৩-১৮।*

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১। আবদুল মোতালেব সরকার। অ্যাসিওয়েন্স বিসিএস বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।প্রকাশনী, অ্যাসিওয়েন্স পাবলিকেসন্স ঢাকা-২০০৬ পৃষ্ঠা- ৭২৫।

২। রথীন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। নাট্যচিন্তা। বেঙ্গল লোকনাত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১১-১৮।

৩। রথীন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। নাট্যচিন্তা। বেঙ্গল লোকনাত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩, পৃষ্ঠা-৯-১১।

৪। রথীন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। নাট্যচিন্তা। বেঙ্গল লোকনাত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৮-১৯।

৫। রাজনীতির গতিধারা- এমাজ উদ্দিন আহমেদ। ঝিনুক প্রকাশ ঢাকা-২০০২ ইং। পৃষ্ঠা-২৬৬-২৬৮

৬। জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৪ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৮ ই নভেম্বর ১৯৯১। পৃষ্ঠা- ১১-১২।

৭। আবদুল মোতালেব সরকার। অ্যাসিওয়েন্স বিসিএস বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।প্রকাশনী, অ্যাসিওয়েন্স পাবলিকেসন্স ঢাকা-২০০৬ পৃষ্ঠা-৭২৬-৭২৭।

৮। রথীন চক্রবর্তি, সন্ত্রাসবাদ। নাট্যচিন্তা। বেঙ্গল লোকনাত প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ২০০৩ ইং, পৃষ্ঠা-১৯।

৯। Countering Terrorism In Bangladesh. Edited by Farooq Sobhan Bangladesh Enter Prise Institute. The University Press limited 2008 পৃষ্ঠা-২৪-২৯।

১০। জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৩ই জানুয়ারী থেকে২৫শে ডিশেম্বর ১৯৯২ইং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা ৩ ই জানুয়ারী ১৯৯২। পৃষ্ঠা- ১৩-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

• বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস অবস্থা পর্যালোচনা ঃ

প্রায় তিন দশক যাবত দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি বিশ্বাস রোপণ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনেই শুধু সন্ত্রাসীদের রাজত্ব চলে। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে থেকেই এসব কথা সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে । সন্ত্রাস এখন আমাদের জীবনে মৃত্যুর মতো নিকটবর্তী । কখন কে সন্ত্রাস বা হত্যাকাণ্ডের মুখোমুখি হয় অথবা মৃত্যু বরণ করে অথবা সর্বস্ব লুণ্ঠনের শিকার হয়, সে সম্পর্কে ঘটনার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কোন পূর্বাভাস দিতে পারে না। বর্তমানে আমাদের জীবন ধারার সঙ্গে সন্ত্রাস যেন আপন প্রতিবিশ্বের মতো প্রতিনিয়ত অনুসরণ করছে। এখন আর সন্ত্রাস অর্থ এ নয় যে, কাউকে হুমকি দেয়া, অস্ত্র দেখিয়ে কারও অর্থ সম্পত্তি লুণ্ঠন করা এবং মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ডাকাতি করা। এ সীমাবদ্ধতার মধ্যে সন্ত্রাস আজ আর নেই। সমাজে এখন গোপনে অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং সেই অস্ত্র হত্যাকারী ও লুটেরাদের ব্যবহারের জন্য ভাড়া দিয়ে একটি নতুন ব্যবসা শুরু হয়েছে। এমনও দেখা যায় কিছু কিছু হত্যাকারী তৈরি হয়েছে যাদের নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থে শত্রুকে হত্যা করার জন্য নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত ভাড়াটিয়া হত্যাকারী নিজের সম্পত্তি বা নিজেদের পারিবারিক কলহ অথবা নিজেদের স্বার্থে কোনো হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয় না। নগদ অর্থের বিনিময়ে এ জাতীয় ভাড়াটিয়া ব্যক্তিরা হত্যার জন্য নিয়োজিত হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক স্বার্থ মোটেই বড় কথা নয়। তবে আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে হত্যার ঘটনা ঘটে। সংঘবদ্ধভাবে যে সকল হত্যাকাণ্ড হয় তার বেশিরভাগই অর্থ ও সম্পত্তির লোভে। বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষালয়ে যে হত্যা সংঘটিত হয়, অথবা সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমে পঙ্গুকরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তার পশ্চাতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য দলগত সমর্থন সুস্পষ্ট ।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী ঢাকা শহরেই বিপনি এলাকায় তালাবদ্ধ দোকানে প্রধান রাস্তার দিকের জানালায় কাচ থাকতো। অনেক সময় মানুষ বৈকালিক বা সান্ধ্য ভ্রমণের সময় বিপনি এলাকায় অনেকটা রাত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার সময় দোকানের জানালা দিয়ে প্রদর্শিত দ্রব্য দেখতে পেত যাকে পশ্চিম দেশসমূহে বলা হয় উইন্ডো শপিং সময়। বিপনি এলাকায় অনেকটা রাত পর্যন্ত নির্বিঘ্নে চলাফেরা করার সময় দোকানের জানালা দিয়ে প্রদর্শিত দ্রব্য দেখতে পেত যাকে পশ্চিম দেশসমূহে বলা হয় উইন্ডো। কিন্তু ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই অথার্ৎ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের অল্প পরেই এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী এই ঢাকা শহরে এবং অন্যান্য বড় শহরে প্রকাশ্যে কাচ ভেঙ্গে লুণ্ঠন করত। তখন থেকেই অতি সাধারণ দোকান ও বড় বিপনিগুলোতে রাতারাতি লোহার পাতের শার্টার লাগান শুরু হয়ে যায়। এখন কোনো বড় শহরে আর একটি দোকানও পাওয়া যাবে না যেখানে লোহার শার্টার দিয়ে দোকান বা বিশেষ বিশেষ অফিস আবদ্ধ না থাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা বাধ্য হয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন, দুর্বৃত্ত ও সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন শার্টার বানিয়ে এখন আর উইন্ডো শপিং বলে কিছু নেই । কিন্তু আশির দশকে দেখা গেল লৌহ শার্টার দিয়েও দোকান নিরাপদ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

কোলাহলপূর্ণ রাজপথে দিনের বেলা প্রকাশ্যভাবে সন্ত্রাসী দুবৃর্ত্তরা অস্ত্র উঁচিয়ে দোকান থেকে ব্যাংক পর্যন্ত লুন্ঠনের সিদ্ধহস্ত। কেউ তাদের বাধা দিলে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে তারা কুন্ঠাবোধ করে না। সকল হত্যাকাণ্ডের মামলার ভগ্নাংশ হয়ত কোর্টের উচ্চপর্যায়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচার তো হয়ইনি বরং সচক্ষে ঘটনা দেখার পরও সন্ত্রাসীদের হত্যার হুমকির মুখে কেউ সাক্ষী হতে রাজি হয়নি। এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিচার তো হয়নি বরং স্বচক্ষে ঘটনা দেখার পরও সন্ত্রাসীদের হত্যা হুমকির মুখে কেউ সাক্ষী হতে রাজি হয়নি। এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থানা পুলিশের সঙ্গে হত্যাকারী ও সন্ত্রাসীদের সমঝোতা রয়েছে। সরকারি বা বেসরকারি কোন ইমারত বা অট্টালিকা নির্মাণ বা কারখানা, সড়ক, ব্রিজ নির্মাণ এমনকি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সংস্কার করতে গেলেও কন্ট্রাকটারগণ সন্ত্রাসীদের টাকা না দিলে তারা হত্যার হুমকি পেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাঙ্গনে সম্প্রসারণ কাজের জন্য অট্টালিকা নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করলে ছাত্রদের নামে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের সঙ্গে পূর্বাহ্নেই চুক্তিবদ্ধ হয় এবং টেন্ডার বাক্সে যাতে অন্য প্রতিযোগীরা টেন্ডার দিতে না পারে তার জন্য অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেয়। অর্থাৎ অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের এ সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে জড়িত হয়ে অনেকে প্রাণ দিয়েছে। বৃহৎ টেন্ডার দখলের এ পদ্ধতি এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ বা সরবরাহ কার্যে বহু নতুন ও পুরনো সন্ত্রাসীরা জড়িত হয়ে পড়েছে। ঢাকার প্রধান বাস টার্মিনালগুলো দখলের ব্যাপারেও শ্রমিকদের নামে রাজনৈতিক টাউটরা টাকা দিয়ে সন্ত্রাসীদের নিয়মিত ব্যবহার করছে। এদেশে এরা মাফিয়া। তাদের কারণে অনেক নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়েছে এবং উন্নয়ন মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সন্ত্রাসীরা এখন রাত ও দিনের মধ্যে কোনো তফাত রাখে না এবং তারা প্রকাশ্য দিবালোকে লঞ্চ, বাস ও ট্রেনে স্বচ্ছন্দে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে। কয়েকদিন আগে একটি ট্রেন থামিয়ে সন্ত্রাসীরা দীর্ঘ সময় ধরে পাঁচ শতাধিক যাত্রীর সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে। ঢাকার প্রায় কেন্দ্রস্থলে নিয়মিত চলন্ত বাসের মধ্যে ডাকাতরা প্রবেশ করে যাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গে আন্তঃজেলা রুটে রাতের বেলা সন্ত্রাসীরা প্রায়ই দলবদ্ধভাবে একটির পর একটি বাস আটক করে যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে। কোথাও কোন ক্ষেত্রে বাধা এলে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের আঘাতে বাস যাত্রীদের স্তব্ধ করে দেয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট দেখা যায়, দিন বা রাত বলে কিছু নেই, যেকোন সময় সন্ত্রাসীরা অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাস ভবনে উপস্থিত হয়ে ডাকাতি করছে। এ সন্ত্রাসীরাই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসে আছে। সকল শ্রেণীর সন্ত্রাসীদের পিছনেই বৃহৎ শক্তিধর ব্যক্তি বা রাজনৈতিক শক্তির আড়ালে থেকে তাদের রক্ষা করে আসছে অর্থবোধক কারণে।

এখন আমাদের দেশে সন্ত্রাস একটি রুজির পন্থা। বেকারত্বের অভিশাপ ও অর্থের লোলুপতা প্রধানত এক শ্রেণীর যুবককে এ পথে টেনে এনেছে। এদের অনেকেই এক বিশেষ ধরনের সংশ্রবের ফলে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। হেরোইন, হাশিশ বা কোকেন জাতীয় মারাত্মক নেশা আমাদের দেশের এ শ্রেণীর যুবকদের সামাজিক সমস্যাজনিত কলঙ্কময় জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে এ সমস্ত সন্ত্রাসী টাকার জন্য রাস্তাঘাটে যাকে পাচ্ছে নেশার তীব্র আকর্ষণে তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে গ্যাং রেপিস্ট বা দলবদ্ধ ধর্ষণকারী হিসাবে রাষ্ট্রে মহাকলঙ্কময় অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। আইয়ুব খাঁর আমলে মোনায়েম খাঁ যখন এ অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন তখন থেকেই অস্ত্রের ব্যবহার, নারীর সম্ভ্রমহানী ও অর্থ লুন্ঠনের প্রবণতা শুরু হয়। এ সকল সুযোগ দিয়ে তখনকার শাসকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্ধর্ষ চরিত্রহীন ছেলেদের হাতে রেখে বিরোধী দলগুলোকে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ সময় কার্যকর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সাহস পেত না। সরকারি আশ্রয়প্রাপ্তদের মধ্যে কাউকে কাউকে নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার পতিতালয়ে মদ্যপান করে পড়ে থাকতে দেখা গেছে বলে সে সময়ের পত্র পত্রিকায় খবর বের হতো গুলিস্তান সিনেমা হল সংলগ্ন রেস্টুরেন্টে এবং শাহবাগের নিকট একটি বারে প্রধানত তাদের ছিল মধ্যপানের সুরক্ষিত আশ্রয়। শিক্ষাঙ্গনে তথা দেশে সামাজিক চরিত্রের এ অবক্ষয় তখন থেকেই শুরু হয়।

আজ আমরা তার চাইতেও অনেক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছি। কে যে নিরাপদ সে কথা কেউ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম। এখন এ দুস্কৃতকারীরা সন্ত্রাসীর রূপ নিয়েও বিদেশি মদ সংগ্রহ করতে না পেরে ভারত থেকে চোরাচালানকৃত ফেন্সিডিল বা অন্যান্য নেশাদ্রব্য সুরক্ষিত বর্ডারের ধরা পড়ে না বললেই চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশও সামাজিক অপরাধের সঙ্গে জড়িত। কোন অপরিচিত যুবতী বা মহিলাকে কোথাও পৌছে দেয়ার প্রশ্ন উঠলে অপরিচিত যুবককেও তারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু পুলিশকে নয়। সমাজের রন্ধে রন্ধে যে সন্ত্রাসী অনাচার প্রবেশ করেছে তা দূরীকরণের দায়িত্ব যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তার উপরে এ কলুষিত সমাজের প্রতি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে সচল করে কঠোরভাবে কোনো পরিকল্পনা কার্যকর করা না হলে আমরা অচিরেই সভ্যতাবর্জিত একটি জাতিতে পরিণত হয়ে পড়ব যার রাষ্ট্রীয় শাসন ও সাংস্কৃতিক গৌরবের ঐতিহ্য অতীতে সকল প্রজন্মকে গৌরবান্বিত করেছে।

সম্প্রতি মুক্তিপণ আদায়ের জন্য ধনী ব্যবসায়ীদের এবং এমনকি ক্ষুদ্র দোকানদারদের পর্যন্ত অপহরণ করা হচ্ছে। এ অপহরণের সঙ্গে কখনই একজন মাত্র অপরাধী জড়িত থাকে না। একটি সংঘবদ্ধ দল বিশেষ বিশেষ সহায়তায় এ মুক্তিপণ আদায়ের ব্যবস্থা করে থাকে। যারা ভুয়া পাসপোর্ট দিয়ে মিথ্যা আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুবকদের বিদেশে পাঠিয়ে দেয় এবং যে অপরাধীচক্র শিশুদের অপহরণ করে সীমান্ত দিয়ে পাচার করে তারাও সন্ত্রাসী। এ অস্ত্রধারী ব্যক্তিরাই মুক্তিপণ আদায় করে শিশু পাচায় করে, নেশাদ্রব্য পাচার করে আনে এবং ভুয়া পাসপোর্ট দিয়ে মানুষের সর্বস্ব হরণ করে। আমাদের দেশের অপরাধ জগতের সম্রাটরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের লোকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে অপরাধে লিপ্ত হয়। এ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের জীবন এখন নানা আশঙ্কার মধ্যে নিমজ্জিত।[১] *ফয়েজ আহমেদ, রাজনীতি "৯৫"। প্রকাশনা মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৯৬। পৃষ্ঠা-৯৫- ৯৭।*

• বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সন্ত্রাস প্রবণতা ঃ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দিতে ধর্মীয় সন্ত্রাসের এক নবতর ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। ঈশ্বরকেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনীতিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ৫টি ইসলামিক ভাবাদর্শের মৌলবাদ গোষ্ঠী রয়েছে এগুলো হচ্ছে-

ক) জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)
খ) জামিয়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)
গ) আল হারাসাইসন ফাউন্ডেশন
ঘ) হরকত উল জিহাদী ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিব) এবং
ঙ) শাহাদাত-ই-আল হিকমা যা কিনা বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত গোষ্ঠী গুলো সরকার কতৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ ইসলামিক গোষ্ঠি। ইতিমধ্যে জঙ্গি গোষ্ঠির প্রধান দুই নেতাসহ আরো সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় বিচারের মাধ্যমে।
বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে সেকুলার রাজনৈতিক চর্চার সূত্রপাত ঘটায় যেখানে ধর্ম ও ধর্মভিত্তিক দলকে বাইরে রেখে রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটানো হয়েছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয় সামরিক সরকার ক্ষমতা আরহণের মধ্যদিয়ে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনের মাধ্যমে সেকুউলার রাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস যার আরবী শব্দ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করা হয় এবং ধর্ম ও ধর্মীয়ভিত্তিক সকল রাজনৈতিক পার্টির রাজনৈতিক শাসকরাই মূলতঃ বাংলাদেশে ইসলামিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চর্চার সুবিধা পাইয়ে দেয়, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক ইসলামী দলগুলো তাদের রাজনীতিবিদ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের এবং তাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায় যখন কিনা দ্বিতীয় মেয়াদের সামরিক সরকার বাংলাদেশকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে সংবিধান সংশোধন করে ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশের সামরিক জেনারেলরা মূলতঃ ১৯৭৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামিক দলগুলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারায় সম্পৃক্ত করে। বাংলাদেশে ১৯৭৫-১৯৯০ সাল এ দীর্ঘ ১৫ বছরের সামরিক শাসন, বাংলাদেশে সেকুলার রাষ্ট্রীয় শাসনের পরিবর্তে ধর্মীয় রাজনৈতিক শাসনের এক সুদৃঢ় কাঠামো দাঁড় করিয়ে দেয় এবং সেই প্রক্রিয়া একটি শক্ত মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যায় যখন কিনা দুটি ইসলামিক দল জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট সমর্থিত চারদলীয় ঐক্যজোট ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে জয় লাভ করে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসের নবতর ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেশের বেসামরিক প্রশাসনকে পঙ্গু, বহু বছরের পুরনো বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস, প্রচার মাধ্যমকে ভীত সন্ত্রস্ত করা, পুলিশ প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করা ইত্যাদি নানা ধরনের অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বিচারকদের ওপর বোমা হামলা, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, পুরো জাতিকে আতঙ্কগ্রস্ত এবং জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। জঙ্গি ইসলামিক গোষ্ঠী দেশে অস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক আইন প্রতিষ্ঠা করতে নতুন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে, নতুন দেশ গঠনের শপথে তারা অবিচল।

ধর্মীয় রাজনৈতিক সন্ত্রাস বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক চর্চার পথে পাহাড়সম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সন্ত্রাসের মূলে রয়েছে ধর্মীয় রাজনৈতিক মৌলবাদের শক্ত ভিত্তি, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বাধা গ্রস্ত করছে।[২] *Countering Terrorism In Bangladesh. Edited by Farooq Sobhan Bangladesh Enter Prise Institute. The University Press limited 2008. পৃষ্ঠা-১১-১২।*

• বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল সমুহের সন্ত্রাস বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাসনামলের প্রেক্ষাপট- ১৯৭২-২০১০

বাংলাদেশের পত্রিকার পাতা উল্টালেই যে বিষয়টি সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলে, তা হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতের চরম অবনতি ও সাধারণ মানুষের ঘরে-বাইরে নিরাপত্তার অভাব। চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, সংঘর্ষ, খুন প্রভৃতি বিষয়ের অসংখ্য খবর পত্রিকার পাতার একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে এসব অপরাধ আগেও ছিল, তবে বর্তমানে তা শতগুন-বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও সরকারি কর্মকর্তারা অবশ্য তাদের

Dhaka University Institutional Repository

চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির কথা স্বীকার করেন না, বরং উল্টো দাবি করেন, বর্তমান সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিরি গুণগত উন্নতি হয়েছে এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা তারা নিশ্চিত করেছেন। পরিস্থিতির চাপে কখনো বা যদি স্বীকার করেন, তখনই আবার ব্যাখ্যা দিতে চান যে, বিরাজমান বিশৃঙ্খলা পরিবেশের জন্য দায়ী হচ্ছে শুধু বিরোধী দলের ইস্যুবিহীন হরতাল স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্র তথাকথিত মৌলবাদী তালেবানদের তৎপরতাকে ঢেকে রাখতে চায়। উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেয়ার একটি প্রবাদ আছে বাংলা ভাষায় বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কর্তাব্যক্তিদের কথাবার্তা বিচার করলে এ প্রবাদ বাক্যটির যথার্থতা সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

নতুন দিনে হেডলাইন দিয়ে সিলেট ও ছাতকে দুটো সন্ত্রাসী ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়। একটি খবরে জানা যায়, সিলেট শহরে জুটন নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে ঘর থেকে টেনে এনে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ তাদের প্রতিপক্ষকে দায়ী করে ও দুটো জঙ্গি মিছিল বের করে, মিছিলটি ছিল সশস্ত্র এবং অংশগ্রহণকারীরা অনেকগুলো দোকানপাট ভাংচুর করে। ফলে সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ছাতকের খবরটাও গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়, ছাতকের চেচনবাজার এলাকায় সরকারি এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের একটি জনসভাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুটো গ্রুপের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে অনেক ব্যক্তি আহত হয়। জনাব মানিক দাবি করেন, তার গ্রুপের ২০ ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সন্ত্রাসী গ্রেফতারে প্রশাসনের একতরফা আচরণের ও তিনি নিন্দা করেন। প্রকাশ থাকে, জনাব মানিক একজন সরকার দলীয় এমপি এবং কয়েক মাস আগে তার বাসায় বোমা তৈরি করতে গিয়ে ১ ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। ছাতকের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে সুরমায় লেখা হয়েছে, গত ২২ নভেম্বর ছাতক থানায় বিভিন্ন পক্ষের সংঘর্ষের পৃথক ৪টি ঘটনায় একজন ঘটনাস্থলে নিহত ও কমপক্ষে ১৫০ জন আহত হয়েছে। একজনের দু' হাতের কব্জি কেটে দেয়া হয়েছে। ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে টেন্ডার ও স্থান নির্বাচন নিয়ে দুপক্ষের বিরোধের ফলেই এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়। সাধারণভাবে বর্তমান সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে পরিচিত জনমত ৬ কলামব্যাপী হেডলাইন দিয়ে সিলেটকে আখ্যায়িত করা হয় একটি খুন আর রক্তের জনপদ, হিসেবে। একটি খবরে বলা হয়, ২২ নভেম্বর সিলেট শহরতলীয় পশ্চিম দুর্গা নাম স্থানে ৫ জন পুলিশ ও তাদের ৪ জন সহযোগী মিলে সমর আলী নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ছিনতাই করে ও তাকে গুলি করে হত্যা করে। পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে সমর আলীর বৃদ্ধ মাতাও মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

নতুন দিন এর উল্লিখিত সংখ্যায় আরো কিছু সন্ত্রাস সম্পর্কিত খবর প্রকাশিত হয়েছিল। একটি খবরে বলা হয়েছে, মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্য পুলিশের ধাওয়া খেয়ে জুয়েল নামক এক যুবক দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকার কমলাপুর এলাকায় স্যুয়োরেজ লাইনের আবর্জনাপূর্ণ পানিতে ডুবে গিয়ে মর্মান্তিক ভাবে নিহত হয়। অনেক কাকুতি-মিনতি করা সত্ত্বেও উপস্থিত পুলিশ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি।

আরেকটি সংবাদে বলা হয়, সম্প্রতি মাত্র ১ ঘণ্টার ব্যবধানে ফেনীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ২ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিকে দায়ী করেছে, তবে বিএনপির স্থানীয় নেতারা সে অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, এলাকার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে এসব সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'নতুন দিন' এর এ সংখ্যা থেকে আরো জানা যায়, খুলনার বর্বর ঘাতক ও সন্ত্রাসের শীর্ষস্থানীয় গড়ফাদাররা এরশাদ শিকদারকে প্রশ্রয় দান ও তার কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের কারণে স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা খুলনাবাসীর কাছে চরমভাবে বিতর্কিত ও নিন্দিত হয়েছে। জনগণ এজন্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদেরও দায়ী করেছে। এখানে একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, খুলনা অঞ্চলে আওয়ামী লীগ রাজনীতির অন্যতম প্রধান হোতা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর আপন চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এমপি। কুখ্যাত এরশাদ শিকদারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল কি না একথা কিন্তু কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তবে এ বছরের প্রথমদিকে আওয়ামী লীগের আরেক নেতাকে হত্যা করার পরিণতিতেই এরশাদ শিকদারের প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি পড়ে এবং দীর্ঘসময় ধরে তার কৃত অপরাধের কীর্তিকাহিনী জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। তবে শেষ পর্যন্ত এ আত্মস্বীকৃত খুনির সাজা হয়। মূল বক্তব্যটি উপস্থাপন করার আগে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত মাত্র একদিনের সন্ত্রাস সম্পর্কিত ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করছি। ২৭ নভেম্বর প্রভাবশালী ইংরেজি পত্রিকা 'ডেইলি স্টার' নিম্নোক্ত খবরগুলো প্রকাশিত হয় ঃ

১. গতকাল নারায়ণগঞ্জের বাউদন থানায় দেওয়ানবাগ দরবাগ শরীফ ও চরমোনাই পীরদের মুরিদ ও সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে অন্তত ২০ ব্যক্তি আহত হয়। বাংলাদেশের অনেক তথাকথিত ধর্মীয় গুরুরাও যে সাধারণ মানুষের ধর্মবোধকে ব্যবহার করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে অন্য গড়ফাদারদের মতো সন্ত্রাসী পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন না এ ঘটনা তারই প্রমাণ।

২. অক্টোবর ২০০০ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ৭ ব্যক্তিকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। উপাচার্য আজাদ চৌধুরী বলেছেন, এসব অপরাধীদের সঙ্গে কিছু ছাত্রও জড়িত থাকতে পারে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার জনাব সামসুদ্দিন বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে পাহারারত পুলিশ সংখ্যায় অপর্যাপ্ত এবং তাদের কোনো প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র নেই।

৩. গত ২৫ নভেম্বর হরতাল চলার সময়ে একজন ট্রাক ড্রাইভারের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সরকার ঢাকা শহরের প্রাক্তন মেয়র মির্জা আব্বাস ও তার ভাই মির্জা খোকনসহ আরো ৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। এদের মির্জা আব্বাসের পরিবারের একজন ঘটনার দিন অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন এবং একজন অনেকদিন ধরে আমেরিকায় আছেন।

৪. ২৫ নভেম্বর খুলনার আলতাপোল লেনে পুলিশ ও ছিনতাইকারীদের মধ্যে গুলিবিনিময়ের ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও অন্য একজন আহত হয়। পুলিশদের মধ্যেই কেউ কেউ এ চিহ্নিত ছিনতাইকারীদের সহায়তা করতো বলে অভিযোগ আছে।

৫. ২৬ নভেম্বর রাঙামাটির রিজার্ভ বাজারে দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মিদের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ ব্যক্তি আহত হয়। এতে বেশকিছু দোকান ভস্মীভূত হয়, আওয়ামী লীগ মিছিল বের করলে রাঙামাটি শহরে অবস্থিত যুবদলের নেতা আকবর আলীর দোকান আক্রমণ করে ও তাকে মারাত্মকভাবে জখম করে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে।

৬. আগামী উপজেলা নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের দ্বন্দ্বে বরিশালের মুলাদী উপজেলায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে এক সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। এ সংঘর্ষের সময়ে কমপক্ষে ৩০ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। পুলিশের কাছে কোনো মামলা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ফেনী মিউনিসিপ্যালিটির নব নির্বাচিত কমিশনারগণ ২৮ নভেম্বর হরতাল আহ্বান করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে- গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা। প্রকাশ থাকে যে, ফেনী হলে অঘোষিত সম্রাট জয়নাল হাজারী কুখ্যাতি সারা দেশের মানুষই জানে। গত ১৭ নভেম্বর ও হাজারী সমর্থকরা ফেনীতে হরতাল করেছিল।

পত্রিকার পাতায় আরেকটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, গত অক্টোবর মাসে মতিঝিলে যে সন্ত্রাসীরা একজন পুলিশ সার্জেন্টকে খুন করেছিল তারাই এ পুলিশ অফিসারকে নিয়মিত টাকা দিতো, তারা আরো দাবি করে, পুলিশটি সন্ত্রাসী দলটিকে অন্যান্য পুলিশের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং আরো বেশি টাকা দাবি করায় তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

পাঠকদের ধৈর্য্যচুতির আশঙ্কায় সন্ত্রাস সম্পর্কিত আর কোনো ঘটনার উল্লেখ করতে চাই না। তবে এটুকু বলা দরকার, উপরে উল্লিখিত ঘটনাবলী বাংলাদেশে বিরাজমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির খণ্ডচিত্র মাত্র, কোনোক্রমেই সার্বিক অবস্থার পুরোপুরি চিত্র তুলে ধরে না। সংবাদপত্রে সকল খবর প্রকাশিত হয় না। শুধু যেসব অপরাধের কোনো 'নিউজ ভ্যালু' আছে, সেগুলোই প্রকাশিত হয়। এছাড়া সীমিত কলেবরের পত্রিকার পাতায় সকল ঘটনা প্রকাশ করাও সম্ভব হয় না। অনেক খবর চাপা পড়ে যায়, অথবা কম প্রাধান্য দিয়ে ছাপা হয়। তবে যে খবরই ছাড়া হয়, তার আলোকেই বুঝা যায়, বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কি সাংঘাতিক অবনতি হয়েছে আর সাধারণ মানুষ কি নিদারুণ অনিশ্চয়তায় জীবন কাটাচ্ছে।

লেখাটির শুরুতেই উল্লেখ যে, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সন্ত্রাস দমন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারেও শুধু বিরোধী দলের হরতাল, ষড়যন্ত্র, মৌলবাদী তৎপরতা প্রভৃতিকে দায়ী করে নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখতে চাইছে। সরকারের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বাংলাদেশকে তালেবানী রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র এমনকি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কথা শুনতে শুনতে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকার নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে সক্ষম হয়নি। এসব অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই, তাই এগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না কেন? আর জনগণকেই বা কেন অন্ধকারে রাখা হচ্ছে? সরকারের ষড়যন্ত্র ম্যানিয়া অথচ সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম না নেয়া থেকে কি আমরা এ বুঝে নেব যে, অন্যান্য কথার মতো ষড়যন্ত্রের কথাও তাদের একটি বাহুল্য বাতিক অথবা ষড়যন্ত্রকারীরা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী এবং সরকারের ভেতরেই আছে?

বিরোধী দলের হরতাল, মৌলবাদী তৎপরতা আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অনেক অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। তবে এ ব্যাপারে বিএনপির সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের ভূমিকাও কম নয়। ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতিকে সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না, তবে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সখ্যতা করতে আওয়ামী লীগও পিছপা হয়নি। ঘন ঘন মক্কায় যাওয়া, হেজাব পরা, জায়নামাজে বসে ও হাতে তসবি নিয়ে ফটো তুলে পত্রিকায় ছাপানো, বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও খালেদা জিয়াকে যথাক্রমে মুরতাদ ও কাফের নামে চিহ্নিত করা ইত্যাদি কোনোক্রমেই আওয়ামী লীগের তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং নয়া ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির পরিচায়ক। এসব করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দলের কিছু অসৎ, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসের মদদদাতা হিসেবে চিহ্নিত নেতারা নামের আগে আলহাজ টাইটেল লাগিয়ে ও মাথায় গোলটুপি পরে নিজেদের পাক্কা মুসলমান হিসেবে জনসম্মুখে হাজির

Dhaka University Institutional Repository

করতে চাইছেন। সাধারণ মানুষের ধর্মবোধকে এভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করে শেখ হাসিনা ও তার দলের কিছু নেতা কি তথাকথিত মৌলবাদীদের সঙ্গে একই কাতারে হাজির হয়নি এবং তালেবানী রাজনীতিকে প্রকারান্তরে জায়েয করেননি?

হরতাল সম্পর্কে বলা যায়, আজ বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়েত মিলে যে হরতাল করছে, তা কি আওয়ামী লীগ থেকেই শেখা নয়? আজ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি হরতালের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না এবং ভবিষ্যতে বিরোধী দলে থাকলেও আর কখনো হরতাল করবেন না। কিন্তু তিনি যে ভবিষ্যতে তার কথা রাখবেন, অথবা তার অবর্তমানে আওয়ামী লীগের অন্য নেতা-নেত্রীরা সে কথা রাখবেন তার নিশ্চয়তা কি? তাছাড়া ওপরে উল্লিখিত খবর অনুসারে তার দলীয় স্থানীয় অথচ প্রভাবশালী নেতারা নিজেদের অঞ্চলে এখনো হরতাল চালিয়ে যাচ্ছেন। হরতাল করা যদি অপরাধ হয়, তবে এদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না কেন? আওয়ামী লীগ আহত হরতালে কি জনজীবন বিধ্বস্ত হয় না? তাছাড়া বিরোধী দলের হরতাল ও মিছিল ঠেকাতে, বিরোধী দলের নেতা-কর্মিদের ঠেঙ্গাতে যখন হাজার হাজার আওয়ামী সমর্থক সশস্ত্র হয়ে তথাকথিত শান্তি মিছিল বের করে, দোকান-পাট ও গাড়ি, যানবাহন ভাঙ্গচুর হয়, মেয়ে মানুষকে বিধস্ত্র করা হয়, সাদেক হোসেন খোকার মতো জনপ্রিয় নেতাকে গুলি করার পরে রক্ত নিয়ে মশকরা করেন স্বয়ং স্বরাষ্টমন্ত্রী তখন কি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিকাশ হয় না সন্ত্রাসের প্রসার পায়? এসব কর্মকাণ্ড কি বিরোধী দলকেও সহিংস পথে ঠেলে দেয় না?

বিরাজমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য যাই হোক না কেন, এ লেখায় উল্লিখিত অপরাধজনিত সংবাদগুলো পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসে।

১। আগের তুলনায় বর্তমানে দেশের শহর বন্দর গ্রাম সর্বত্র অপরাধের সংখ্যা ও অপরাধীদের শক্তি অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছে।

২। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও অবৈধ সম্পদ আহরণ করা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রকটি প্রধান উদ্দেশ্য।

৩। বর্তমানে বিরোধীদের তুলনায় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দিচ্ছে।

৪। রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে আওয়ামী সরকার বিভিন্ন দমননীতি ও সশস্ত্র পন্থায় মোকাবেলা করতে চাইছে। ফলে বিরোধীরাও অনেকক্ষেত্রে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করছে।

৫। পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ টাকার বিনিময়ে অপরাধীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। রাজনৈতিক কারণেও তারা অনেক ক্ষেত্রে সরকারি দলের সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দিচ্ছে এবং বিরোধী দলের নেতা কর্মিকে অভিযুক্ত করেছে।

৬। মানবিক ন্যায় নীতি ও আইনগত ব্যবস্থার বদলে পাশবিক পেশীশক্তিই আজ আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে।

বলা বাহুল্য, বিরাজমান পরিস্থিতি আমাদের কারো কাম্য নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের জনগণের দুর্ভোগের কথা বলে জনসভায় মায়াকান্না কয়েন কেউ কেউ নিজেদের মিষ্টি কথার আড়ালে জনগণের আসল কষ্টের কথাটি গোপন করে রাখেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্য একটাই হয় ক্ষমতায় থাকা, নয় ক্ষমতায় যাওয়া। সারাদেশ গোল্লায় গেলেও তাদের কিছু আসে যায় বলে মনে হয় না। তাই অনেকের সঙ্গে আমিও মনেকরি, দেশে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সত্যিকার অর্থেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিবিদদের ওপর নির্ভর করলেই চলবে না, সকল নাগরিকের সম্মিলিত চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে হবে। চিহ্নিত গড়ফাদারকে গণশত্রু হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এদেরকে দলে নিয়ে অথবা তাদের সহযোগিতায় যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকেও আমাদের অস্বীকার করতে হবে। সচেতন জনতার প্রতিরোধই হচ্ছে সন্ত্রাস দমনের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

এ সকল ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে আবার ক্ষমতা দখল। ক্ষমতা হারানোর ব্যথায় তারা যেনো মাঝে মাঝে দিকশূন্য হয়ে প্রলাপ বকে সে ব্যথা নিরসনের চেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

এমনি এরা ১৯৭৫-এর জাতির পিতা ও তার পরিবারের সদস্যসহ আত্মীয়-স্বজন এবং জাতীয় নেতার আত্মস্বীকৃত খুনিদের পর্যন্ত আশ্রয় প্রদান করে এদের বিচারের ক্ষেত্রেও বাধার সৃষ্টি করেছে।

রাজনৈতিক অর্থনীতি দুটি সম্পর্কিত বিষয়। এর একটির সাফল্য অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম নির্ভরশীল। যা বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের ইতিকথা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনামের কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বিদেশি বহু বিনিয়োগকারী আসা শুরু করেছে এবং অনেক দেশ বিনিয়োগের প্রত্যাশা প্রকাশ করছে। এ সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে হরতাল কর্মসূচি দেয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

তাই বাজেটে কর প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্র থেকে হ্রাস বা প্রত্যাহার করা হলেও এবং নির্বাচন কমিশন ও সরকারের নিরপেক্ষ অবস্থান আর দৃঢ়তার কারণে মানিকগঞ্জ উপনির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলেও এরা তাদের হরতাল কর্মসূচি না করে একে পুঁজি করেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত করার মাধ্যমে বর্তমান ঐকমত্য সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এর বিচার বিশ্লেষণের ভার দেশের জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেয়াই সমীচীন বলে রাজনৈতিক অভিজ্ঞমহল মনে করেন।[৩] *ড. আবদুল মল্লিক.বাংলাদেশের রাজনীতি মুখ ও মুখোশ। প্রকাশনা জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা-২০০৩ ইং, পৃষ্ঠা-১৮১- ১৮৮।*

• বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসকের আমলের সন্ত্রাস

শিক্ষাঙ্গন থেকে মহল্লা, জনপথ থেকে গৃহকোণ পর্যন্ত সহিংসতা ছড়িয়ে দিচ্ছে এক শ্রেণীর সশস্ত্র মাস্তান। ছিনতাই, রাহাজানি, খুন-জখম, হানাহানি, চাঁদাবাজি, লুটপাট ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রতিরোধহীন। সমাজ জীবনে কেন এ নিরাপত্তাহীনতা ? অপরাধমূলক তৎপরতার পেছনে কি রয়েছে পেশাদার গোষ্ঠী না গভীর কোনো ষড়যন্ত্র ?

স্বেচ্ছাচারী এরশাদের শাসনামলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল সোচ্চার। দেশের সব রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয়েছিল। বিরোধী দলগুলি বলেছিল, রাষ্ট্র ক্ষমতায় মহাসন্ত্রাসকারী যতদিন ক্ষমতায় থাকবে সমাজ থেকে সন্ত্রাস দূর হবে না। তাই আসুন,

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলিতভাবে সন্ত্রাসী শাসক এরশাদের পতন ঘটাই। কারণ এরশাদ সন্ত্রাসের মাধ্যমেই একটি নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন বন্দুকের নলের মুখে।

১. উল্লেখ্য, এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে সরিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। দীর্ঘ ৮ বছর পর ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর জনগণের দাবির মুখে তিনি সেই ক্ষমতা ত্যাগ করেন। তবে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন ওঠে, যে দলের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল তাদের পক্ষ থেকেই এ মামলা দায়ের করা উচিত ছিল। বিচারপতি সাত্তার এখন নেই, তবে মৃত্যুর আগে প্রকাশ্য জনসভায় এবং বিবৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন, বন্দুকের নলের মুখে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। বিচারপতি সাত্তারের বিবৃতি সেদিন দেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি। তবে বিবিসিতে তা প্রচার করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে স্বৈরাচারী তথ্য সন্ত্রাসী এরশাদ বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সমাজে এখনো সন্ত্রাস চলছে এবং এ কারণেই এ নিবন্ধ।

বিটিভির একটি অনুষ্ঠানের আলোচনা সম্পর্কে এখানে পর্যালোচনা করার কারণ আর কিছুই নয়, স্বৈরাচারী এরশাদের বিদায়ের পর আজও সমাজের সন্ত্রাস নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে ভাবতে হচ্ছে এটিই হলো বিষয়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক খবর হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে অস্ত্র আসছে। একটি দৈনিকের একজন বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানালেন, এ অস্ত্রগুলি আনকোরা চকচকে। পুরনো অস্ত্র বাদ দিয়ে তারা চকচকে অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে প্রকাশ্যে। কাজেই টিভি পর্দার আলোচনার পাশাপাশি এ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া খুবই জরুরি। দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যদি দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অস্ত্রধারীরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে তাহলে সরকার পরিবর্তনের সুফল কি পাবে দেশবাসী? দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সামান্য কথা কাটা কাটি নিয়ে অস্ত্র প্রদর্শন হয়েছে। পরে শোনা গেল প্রেমঘটিত বিষয় নিয়ে ঐ ঘটনাটি ঘটে ছিল। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে একটি যুবক নিহত হয়। এর আগে দু'টি বহিরাগত কলেজ ছাত্রী ওই হল ত্যাগ করে। সেটিও এক প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। লক্ষণীয় রাজনীতি বিষয় ছাড়াও প্রেম ও প্রণয়জনিত বিষয় নিয়েও অস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসজনিত প্রাণহানি কম হয়নি। একসঙ্গেই ৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ ক্যাম্পাসে যারা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন তাদের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎকীর্ণ রয়েছে। সন্ত্রাসের কারণে যাদের প্রাণহানি হয়েছে তাদের তালিকা যোগাড় করলে তাও কম দীর্ঘ হবে না। যারা সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে তাঁরাও তো এদেশের সন্ত্রাস। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে এ সন্ত্রাস পুরো সমাজে যা একটি ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ফেলে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল জরুরি, সুষ্ঠু শিক্ষা ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্যই।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো অছাত্ররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র নিয়ে ঘোরে। তারা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়টির বিভিন্ন হলে রুম দখল করে রয়েছে। ডাইনিং হলে গিয়ে জোর করে খায় তাদের জিনসের প্যান্টের পকেটে গোঁজা পিস্তলের বাঁট দেখে কেউ তাদের বাঁটায় না। অথচ এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশের একটি শক্তিশালী ফাঁড়ি রয়েছে। প্রচুর সাদা পোশাকের পুলিশ সেখানে রয়েছে নিয়োজিত। তবু অস্ত্রমুক্ত হয় না কেন এ ক্যাম্পাস। পরাক্রমশালী এরশাদের পতন হয়েছে। ওই সন্ত্রাসীরা কি তার চেয়েও শক্তিশালী? বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ইচ্ছা করলেই তা পারেন বলে ওয়াকেবহাল মহলের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

যারা ত্রাস করে তারাই সন্ত্রাসী। দেশে বর্তমানে ত্রাস সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা কতো ? জাতীয় সংসদে এমন প্রশ্ন উঠেনি। কিন্তু উঠা উচিত। এর উত্তর দেয়াও তো কঠিন নয়। সন্ত্রাসের অভিযোগে এ পর্যন্ত যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং যাদের শাস্তি হয়েছে তাদের তালিকা থানাগুলিতে আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ সন্ত্রাসকারীদের নাম ধামও প্রকাশ করতে পারে। এটি তাদের না পারার কারণ নেই। কারণ এটিই তাদের কাজ। পদচ্যুত সরকারের লোকজনকে প্রোটেকশন দেয়া তাদের কাজ হতে পারে না। তবে তারাই শুধু এরশাদের সহযোগীদের প্রোটেকশন দিচ্ছে তাও নয়। রাজনৈতিক মহলেও নয়া এরশাদ প্রেমিকদের জন্ম হয়েছে। আগে যারা এরশাদ সরকারের তুমুল বিরোধিতা করেছেন, এমন লোকজনকেও এখন এরশাদের ব্যাপারে নমনীয় কথাবার্তা বলতে দেখা যাচ্ছে। ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগের এমপি আসাদুল হক খসরু আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রেসিডেন্ট সদস্য থাকা অবস্থাতেই অ্যাডভোকেট সিরাজুল হক এরশাদের পক্ষে ওকালতি শুরু করেন। ৮ দলের অন্যতম নেতা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টির প্রভাবশালী নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর পক্ষে কথা বলছেন। এরশাদের পক্ষেও তিনি কথা বললে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে পরিচিত গণতান্ত্রিক পার্টি এ নেতা একদা জাতীয় পার্টির মন্ত্রীদের সমালোচক ছিলেন।

সন্ত্রাস নিয়ে কথা হচ্ছিলো। কারা সন্ত্রাসী? যারা সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত তাদের শ্রেণী চরিত্র নেই। বস্তিতে থেকেও বিখ্যাত সন্ত্রাসীর জন্ম হয়, আবার অভিজাত ঘরের সন্তানও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ডাইনিং হলে একজন পিচ্চি কালক্রমে মাস্ত ান হয়ে প্রভাবশালী হয়ে পড়েছিল। সে শুধু হলেই না, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ভিসির মেয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল বলে শুনেছি। ধানমণ্ডি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময় করতে গিয়ে একজন তরুণ নিহত হলো। পরে জানা গেলো তার পিতা একজন ইঞ্জিনিয়ার, মা একটি কলেজের অধ্যক্ষ। সন্তান মাস্তান হওয়ায় অধিকাংশ পিতামাতাই লজ্জিত। কিন্তু অনেক মাস্তান পিতামাতার সংসার চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে অবস্থানকারী একজন ছাত্রকে চিনতাম। ছাত্র অবস্থাতেই সে বাড়িতে মাসে হাজার হাজার টাকা পাঠাতো। এ টাকার উৎস ছিল মাস্তানী। তার পিতা হয়তো জানতেন না, তাঁর সন্তান এ টাকা কোথা থেকে আয় করে।

ষাটের দশকে সাইদুর রহমান নামে একজন ক্রীড়াবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। স্বভাবে শান্তশিষ্ট। পরে তিনি সেকালে সেরা সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত হন। পাঁচ পাণ্ডু নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। পাস কোর্স পার্ট টু-এর ছাত্র বলে তার নাম বিকৃতির মাধ্যমে পাঁচ পাণ্ডু হিসেবে পরিচিত পায়। সাম্প্রতিককালে বরিশালের একজন মেধাবী ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিতি পায়। অথচ তাঁর মাতা একজন স্বর্ণগর্ভা হিসেবে পুরস্কার পান। তাঁর কয়েক ভাই পিএইচডিধারী। এক ভাই রয়েছেন বিবিসিতে। সমাজ পরিস্থিতির কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র কালক্রমে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিতি পায়। এদেরকে সংশোধন করবে। কারাগারে অপরাধিদের অপরাধ মোচন করে, নাকি ফরে তোলে আরো অপরাধ প্রবণ?

কথাগুলি এ জন্যেই বলা হলো, দীর্ঘ ৯ বছর স্বৈরাচারের আমলে শ শ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। এইসন্ত্রাসের ফলে দেশের নিক্ষাঙ্গন, শিল্পাঞ্চলসহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত জানমালের ক্ষতি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দিনে-দুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনায় গৃহবধূ সোগেরা মোর্শেদ প্রাণ হারান। রমনা থানার দুশ গজের মধ্যে সংঘটিত এ ছিনতাই ঘটনায় একজন

Dhaka University Institutional Repository

ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেও নাকি ছেড়ে দেয়া হয়। মাস খানেক আগে মরহুম সোগেরা মোর্শেদের শিক্ষক স্বামী আগামী কার্যালয়ে এসেছিলেন ওই মামলা সম্পর্কে কিছু জানা যায় কিনা তা তিনি জানতে চাইছিলেন। দুঃখ করে বলছিলেন, সরকার পরিবর্তন হলো, তবু হত্যাকারীরা শাস্তি পাবে এমন লক্ষণ দেখছি না। আরেক গৃহস্বামী মারিয়া ইসমাইলের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হলো সম্প্রতি। জানা গেছে এক বছর পার হয়ে গেলেও এ বিষয়ে কোনো মামলা আদালতে ওঠেনি। তারাও তো বলতে পারেন, সরকার পরিবর্তন হয়ে কি হলো?

এ ধরনের কত সোগেরা কত মাহিয়ারা হত্যাকারীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে তার খবর কে রাখে? এরশাদের আমলে যারা সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত ছিল তারা কি এখন ভালো হয়ে গেছে। মোটেও তা নয় কারণ বিগত দিনে সুযোগ বুঝে তারা নতুন নতুন সন্ত্রাস করছে। তারা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজ নিজ এলাকায় নিয়োজিত শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে তাদের মাখামাখি আগের মতোই বিদ্যমান।

সন্ত্রাসের রকমফের রয়েছে। সন্ত্রাস চলে স্থানীয় পর্যায়েও। মহল্লা ও পাড়ায় স্থানীয় সন্ত্রাস রয়েছে। ঢাকা মহানগীর বিভিন্ন এলাকায় মহল্লাভিত্তিক মাস্তান রয়েছে। এরা বিভিন্ন ইস্যু ধরে চাঁদার নামে অর্থ আদায় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূলে সর্বনাশা মহাঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়াল ছোবলে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে সারা দেশের মানুষ। সাধ্যমতো দুর্গতদের জন্য সাহায্য করতে তারা উদগ্রিব। পাড়ায় পাড়ায় কিশোর যুবকদের মধ্যেও সৃষ্টি হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহের উদ্দীপনা। তারা এসব ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে পৌঁছে দিচ্ছে দুর্গত এলাকায়। কিন্তু এ সুযোগ নিয়ে কিছু মুসলমান ত্রাণের নামে অর্থ সংগ্রহ করছে। ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করছে। এতে যারা সাহায্য দিতে মনস্থির করেছেন এমন অনেকেই মত বদল করেছেন।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ করে রাজধানী ঢাকাতেই ছিনতাই ঘটনা বেড়ে যায়। পুরো রমজান মাসে বেশ কিছু ছিনতাই ঘটনা ঘটে। ছিনতাইকারীদের হাতে বিদেশি নাগরিক ও সর্বস্ব খুইয়েছে। একই দিনে এ মহানগরীতে চাঞ্চল্যকর ছিনতাই ঘটনা ঘটেছে। ছিনতাই ঘটনার পর সর্বস্ব খুইয়ে সবুজবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করতে গিয়ে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা অবহেলিত হয়েছেন। এ খবর পত্রিকায় ছাপা হওয়ার পর অবশ্য মামলাটি নেয়া হয়। ছিনতাই পকেটমারের ঘটনা ছাড়াও বড় ধরনের অপরাধের এফআইআর গ্রহণে ও কোনো থানা অনীহা প্রকাশ করে।

মামলা না নেয়ার একটি কারণ হলো, স্ব স্ব থানার ছিনতাই অপরাধ ঘটনার জন্য ওইসব থানাকে জবাবদিহি করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ কারণে কোনো কোনো থানা তাদের এলাকায় ছিনতাই ঘটনা ঘটলেও তা থানায় রেকর্ডভুক্ত করছে না। দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এমন জঘন্য পন্থাও এদেশে অনুসরণ করা হয়। তাহলে ওই সব থানা ও থানার লোকজনের কি দরকার?

সারাদেশের কথা যদি বাদই দিই খোদ রাজধানীতে সন্ত্রাস কিভাবে ঘটে? কথায় আছে, ছাগল লাফায় খুঁটির জোরে। প্রকাশ্যে দিবালোকে ভাঙাচোরা চেহারায় যুবকরা যখন পিস্ত ল ঠেকিয়ে সন্ত্রাস করে তখন বুঝে নিতে হয় ওই পেশীহীন পেশী মানবের শক্ত খুঁটি আছে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে যারা তারাই অঘটন ঘটায়। তারা জানে ধরা পড়লেও তারা ছাড়া পাবে। এ কারণে তাদের কেউ ধরিয়ে দেয় না। সবার সামনে সন্ত্রাস চালালেও সে সম্পর্কে পুলিশের কাছে কেউ মুখ খোলে না। কারণ ছাড়া পেয়ে এসে তারা সাক্ষ্যদানকারীদের ধরবে। ফলে ছিনতাই ঘটনার সাক্ষি পাওয়া যায় না। মামলাও

Dhaka University Institutional Repository

জোরদার হয় না।[৪] *জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৪ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা-১৩। ৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা।*

তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধররাও সন্ত্রাসীদের ইন্ধন যোগায়। এরশাদ তখন এদেশের প্রধান সেনাপতি। ১৯৮২ সালের প্রথম দিককার ঘটনা। সোনালী ব্যাংকের এক কর্মকর্তাকে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল ট্রেড ইউনিয়নের নেতা লাঞ্ছিত করলেন। পুলিশ কিছু করতে পারছিল না। ঘটনাচক্রে ওই জি এম ছিলেন ক্ষমতাসীন একজন মন্ত্রীর আত্মীয়। কাজেই অ্যাকশন হলো। ধর্মী অপরাধীদেরকে ঢালাও ছাঁটাই করা হলো। অনেক নিরীহ কর্মচারী হলেন চাকুরিচ্যুত। নেপথ্যের ঘটনা হলো ষড়যন্ত্রকারী এরশাদের ইন্ধনে ওই ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বেআইনিভাবে ধর্মঘট ও একজন উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকতাকে লাঞ্ছিত করে একটি অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটি ছিনতাই ঘটনা ঘটে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। একজন প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে একজন হত্যা মামলার আসামিকে ঢুকিয়ে গ্রেফতার করানো হয়। সবগুলি ঘটনায়ই ঘটানো হয়েছিল একই লক্ষ্য থেকে। আসলে ওই সবের লক্ষ্য ছিল দেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।

ক্যাপ্টেন শহীদ তাঁর বইতে (সৈনিকের রাজনীতি) লিখেছেন, সোনালী ব্যাংকের এ ঘটনার সঙ্গে ক্যাপ্টেন নবাব হোসেন নামে এরশাদের এক বাল্যবন্ধুর যোগাযোগ ছিল। একজন শিল্পপতি এর জন্য টাকা পয়সা খরচ করেন। পরে তাঁরা এরশাদের আমলে লাভবান হন বিভিন্নভাবে। ক্ষমতাচ্যুত বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. মতিন এরশাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন।

১৯৮২ তে ক্ষমতাচ্যুত বিএনপি আবার ক্ষমতায় এসেছে। জনগণের ভোটে তারা সরকার গঠন করেছে। এদেশে এ প্রথম একটি ক্ষমতাচ্যুত দল আবার ক্ষমতায় আসতে পারলো। জনগণ তাদের পছন্দ করেছে বলেই তো সম্ভব হয়েছে। জিয়ার বিএনপি সরকারের সুফল হিসেবে খালেদা জিয়া আবার বিএনপিকে ক্ষমতার আসনে বসালেন। কিন্তু খালেদা জিয়া নিজে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পরও দেশে এমন কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে যা উদ্বেগজনক। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেক সময় নীরব ভূমিকা পালন করছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। জনরোষে ক্ষমতাচ্যুত জাতীয় পার্টির একজন নেতা নাকি এমন একটি প্রচারপত্র ছাপিয়েছিলেন যা নিরাপত্তাহানীকর। পরে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে খবর পাওয়া গেল ২৯ এপ্রিলের মহা ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের পর উদ্ভূত এলাকায় এক শ্রেণীর সন্ত্রাসীরা নেমেছে। তারা সেখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এদেশের অসম্ভব কিছুই নয় কারণ সন্ত্রাসীদের জন্য কিছুই অসাধ্য নয়। তারা দুর্গম এলাকায় গিয়ে সন্ত্রাস করলে তাদের ধরবে কে? বিশেষ করে ত্রাণ বিতরণে নিয়োজিত বিদেশিরা যদি ছিনতাইকারীদের হাতে পড়েন তাহলে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

রাজধানী ঢাকাতে যদি সন্ত্রাসীরা পিস্তল উঁচিয়ে ছিনতাই করতে পারে তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে তা তাদের জন্য আরো সহজ। তবে প্রশ্ন উঠে, এ সন্ত্রাসীরা কোন রিমোট কন্ট্রোলে পরিচালিত? কাদের ইন্ধনে এরা সক্রিয়? বিগত কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এরা বেশ সাহসী। পিস্ত লসহ তারা ধরা পড়ছে, অবৈধ অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও।

বর্তমানে দেশে যে প্রশাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরশাদীয় আমলের প্রশাসন। এ প্রশাসন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাজের উপযোগী নয়। তাই এর ঢালাও পুনর্বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

দরকার। দেশপ্রেমিক, মেধাবী, সৎ ও সাহসী কর্মিদের দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ঢেলে সাজাতে হবে, তা নাহলে গণতান্ত্রিক সরকারের সুফল জনগণ পাবেন না। জবাবদিহিমূলক প্রশাসন কায়েম করার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

মাস্তান শব্দটিই এখন জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। ছিনতাই, চাঁদা আদায় ও হত্যার মতো বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে মাস্তানরা ইতিমধ্যেই দেশবাসীকে জিম্মি করে ফেলেছে। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় এদের তৎপরতা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে প্রতি মুহূর্তে রাখছে তটস্থ, আতঙ্কিত০। একশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বসহ মহল বিশেষের পৃষ্ঠপোষকতায় এরা ক্রমাগত বাধাহীন হয়ে উঠছে। এ মাস্তানরা কারা, কিভাবে তারা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, কারা ওদের সহযোগিতা দেয় এবং কোন পন্থায় তাদের প্রতিহত করা সম্ভব সে দিকগুলিকেই এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন রায়হান মাসুম।

একজন মহিলা ব্যাংক অফিসার রিকশায় যাচ্ছেন। হাতে ব্যাগ, পরনে শাড়ি-গহনা, সাজ গোছে মনে হয় কোনো আত্মীয়ার বাসায় যাচ্ছেন। হঠাৎ তিনজন উঠতি বয়সের তরুণ এসে রিকশার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। ভদ্র মহিলা ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই একজন তাঁর কাঁধ বরাবর কিরিচ উঠিয়ে ধরলো। একটা ধাতব বস্তু পাঁজরে এসে ঠেকলো। আরেকজন দ্রুত সার্চ করতে লাগলো ব্যাগ। খবরদার! চিল্লাচিল্লি করবি তো গলায় কিরিচটা ছুঁইয়ে দিয়ে শাসিয়ে উঠলো কিরিচধারী। তৃতীয়জন ততক্ষণে ব্যাগ তল্লাশি শেষ করে গহনা খুলতে শুরু করেছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে নগদ টাকা ও অলঙ্কার মিলে প্রায় লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে অস্ত্রধারীরা চম্পট দিলো। রাস্তার মোড়ে আশপাশের কয়েকজন লোক হা করে তাকিয়ে দেখলো। যেন জিহবা তাদের তালুতে ঠেকেছে, হাত পা অসার হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলা একজন প্রভাবশালী লোকেরই স্ত্রী। ছাত্রজীবনে একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মকর্তা থাকার সুবাদে যথেষ্ট তেজ এবং সাহস রাখেন। তিনি ছিনতাইকারীদের চিনতে পেরেছেন। মহল্লারই ছেলে। অতএব নাম, ঠিকানা সনাক্ত করে থানায় এজাহার দিলেন। একদিন যায়, দু'দিন যায়। দুর্বৃত্তরা মহল্লার রাস্তায় আগের মতোই ফুলবাবু সেজে সিনা টান করে হাঁটে। ভদ্রমহিলা থানায় গিয়ে ওসি সাহেবকে খুব একচোট নিলেন। বকা-ঝকা হজম করে ওসি সাহেব টেলিফোনে ডায়াল করলেন। ক্ষীনস্বরে খানিক কথাবার্থা হলো। অতঃপর মহিলার দিকে টেলিফোন এগিয়ে দিয়ে বললেন- ধরুন।

ঃ হ্যালো, আপনি কি মিসেস 'ক'

ঃ জ্বি, আপনি কে?

ঃ আমি. 'খ' এর বাবা। কেসটা তাড়াতাড়ি উইথড্র করুন। ভদ্রমহিলা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

ঃ আপনার স্পর্ধা তো কম নয়? প্রকাশ্য দিনের বেলায় আপনার ছেলে আমার অলঙ্কার ছিনিয়ে নিলো, আর লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে আপনি কেস উইথড্র করার জন্য চাপ দিচ্ছেন আমাকে।

ঃ কেস করে কিছুই করতে পারবেন না, আমার খানিকটা পরিশ্রম বাড়বে, এ-ই যা।

ঃ জানিনে আপনি কে? অপমান আমি সহ্য করবো না। দরকার হলে বিচারের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে যাবো।

ঃ ভালো করে জানি, আপনি ব্যাংকে চাকরি করেন। আপনার মতো ডজন-ডজন অফিসার আমি মাইনে দিয়ে পুষি। এর পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ওই দুর্বৃত্তদের কেসও স্পর্শ করতে পারেনি। এটা এরশাদ যুগের ঘটনা। ঘটনাস্থল ঢাকার একটি সম্ভ্রান্ত আবাসিক এলাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত ঘটনার মধ্যদিয়ে মাস্তান এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব। চুরি করলে চোর, ডাকাতি করলে ডাকাত, ছিনতাই করলে ছিনতাইকারী, তাহলে মাস্তান কাকে বলে? মনে হচ্ছে, চুরি-ডাকাতি-ছিনতই-রাহাজানি-খুন-ধর্ষন যাই করুক বা যথেচ্ছ করুন, শক্ত খুঁটির কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ যায় টিকিট পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে না, সেই হলো মাস্তান। অন্যান্য অপরাধীদের সঙ্গে মাস্তানদের এটাই হলো বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য। অভাবে করুক বা স্বভাবে করুক, সাধারণ অপরাধীদের পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, ডান্ডাপেটা করে, হাজতে ফেলে রাখে, বিচারে জেল ফাঁসি পর্যন্ত হয়। কিন্তু মাস্তানদের ক্ষেত্রে তা হওয়ার নয়, কারণ মাস্তানদের পেছনে থাকে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি। আবার গডফাদার ধরনেরও হতে পারে। শেষোক্ত ধরনের অভিভাবকের সংখ্যাই বেশি। এ অভিভাবকরা কেউ ক্ষমতাধর রাজনীতিক, কেউ শিল্পপতি, কেউ ব্যবসায়ী বা কালোটাকার মালিক। সেকালের জমিদাররা লাঠিয়াল পুষে পরাক্রমশালী হতেন। আর এ কালের সম্পাদশালী ক্ষমতাবানরা নিজেদের প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখার জন্য বিকৃত ও অসুস্থ প্রতিযোগিতায় জিতে যাবার জন্য মাস্তান পোষেন। মাস্তানদের হাতে নগদ অর্থ দেন, অস্ত্র দেন, ওদের পেশিশক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কোপানলে পড়লে এরা তাদের রক্ষা করেন, আশ্রয় প্রশ্রয় দেন।
উপরোক্ত, পৃষ্ঠা -১১।

ছিনতাইকারীর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিলেন এক পঞ্চাশোর্ধ মহিলা ঢাকা শহরে ছিনতাই এখন এক নিত্যদিনের ঘটনা। প্রকাশ্যে দিবালোকে জনসম্মুখে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে পাশে বসা স্বামীর চোখের সামনে স্ত্রীর অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়া, সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে প্রত্যাবর্তনরত নারী পুরুষের সর্বস্ব কেড়ে নেয়া এ যেন সবার কাছেই খুব ছোটখাটো ঘটনা।

প্রায় সবাই বিনাবাক্যে হার মানলেও প্রতিরোধের উদ্দেশে আজকাল অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছেন ছিনতাইকারীদের ওপর। এর ফলে অস্ত্রের তপ্ত বুলেট কেড়ে নিচ্ছে কারো কারো প্রাণ। এমন ঘটনা একাধিক। কিন্তু পিস্তল উঁচিয়ে একজন পঞ্চাশোর্ধ মহিলা ছিনতাইকারীকে পরাস্ত করেছেন। এমন ঘটনা শুধু বিরল ও অবিশ্বাস্যই নয়, রীতিমতো চমকপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জকও।

১২ অক্টোবর শনিবার। খুব সকালে মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী সিদ্ধান্ত নিলেন পাশের বাসায় অবসরপ্রাপ্ত জজ সাহেবের স্ত্রীকে নিয়ে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে যাবেন দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান দেখতে। প্রতি বছরই তিনি দুর্গাপূজার উপলক্ষে সেখানে যান। পূজা শেষে মন্দির থেকে বের হতে তাঁর বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে যায়। আবারো একটি রিকশায় চড়ে দুজনে রওনা দেন বাসায় ফেরার জন্য। পূজা উপলক্ষে তাঁরা নতুন শাড়ির সঙ্গে পরেছিলেন স্বর্ণালঙ্কার। অন্যান্য দিন এমন সাজে পোশাক না পরলেও পূজার সময়টা পরেন। রিকশাচালক তেমন চালু ছিল না বলে ধানমন্ডির দশ নম্বর আসতেই বেজে যায় দুপুর একটা। চারদিকে নিস্তব্দ রাস্তায় তেমন লোকজনও নেই। গলিতে ভর দুপুরে অভিজাত বাড়ি থেকে আলিশিয়ান কুকুরের গালাফাটা ঘেউ ঘেউ ছাড়া যেন আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না। তখন দুপুরের খাবারের সময়। এরই মধ্যে ঘটলো সেই ঘটনাটি যা মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। তিনি বললেন, আমাদের রিকশা একটি দোতলা বাড়ির কাছে যেতেই পেছন থেকে একটি মোটর সাইকেল খুব জোরে ক্রস করে ঠিক দশ গজ সামনে ব্রেক করে থেমে যায়। মটরসাইকেল আরোহী দু'জনের চোখে কালো সানগ্রাস। তাদের বয়স খুব বেশি হলে ২৫/২৬। পরনে বেশ দামি কাপড় চোপড়। মোটর সাইকেলের পেছনে বসা ছেলেটি পেছনে ফিরে আমাদের রিকশাওয়াকে বললো এ ব্যাটা দাঁড়া। রিকশাওয়ালা থতমত খেয়ে ব্রেক কষে বসলো। ছেলেটি কথা বলেই রিকশার দিকে আসতে লাগলো। তখন কোনো চিন্তা ভাবনা আসেনি আমার মনে। ছেলেটি রিকশার কাছে এসেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, খুলে দিন। আমি হতবাক হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বললাম, কি খুলে দেব। তখন ছেলেটি বলছে আপনার গলার ওই হারটি। আমি না দেয়ায় তার ঢিলে ঢালা প্যান্টের পকেট থেকে একটি চকচকে পিস্তল বের করে আমাকে বললো এবার দিন। আমি তখনো ভয় পাইনি। একপর্যায়ে ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে বললো, খুলে দেন আপনার হার, না হলে গুলি করে মাথা গুড়িয়ে দেব। এবার যেন একটু ভয়ই পেলাম। যখন নিজে থেকে হার খুলে দিচ্ছি না তখন ছেলেটি নিজ হাতে আমার গলার হারটি টান মেরে ছিড়ে ফেলে। অমনি আমি হারটি আমার ব্লাউজের ভেতরে লুকিয়ে ফেলি। এরপরও ছেলেটি বলছে খুলে দিন সব বলছি। আমি শুধু বললাম, আমি তোমার মায়ের মতো, তোমার যদি অতটুকু সাহস থেকে থাকে তাহলে বুক থেকে হারটি নাও। ধস্তাধস্তি করতে করতে প্রায় ১০/১৫ মিনিট চলে যায়। আশেপাশের বাড়ির ছাদে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনেকেই আমার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছিলো কিন্তু একটি লোকও এলো না রক্ষা করতে। রাস্তায় একপাশে ভিডিও দোকানের কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে দেখছিল, তাড়াও এগিয়ে আসেনি। মোটর সাইকেলে বসা ছেলেটিও উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে আসতেই পিস্তলধারী যুবকটি ফিল্মি স্টাইলে পেছনের দিকে ফিরে বললো, তুই মোটর সাইকেলে স্টার্ট অবস্থায় থাক, আমি এদিকটা একাই সামলাবো। এবার যুবকটি গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে বললো, গলায় হাতের কানের সব গহনা খুলে দাও বলছি, না হলে গুলি করবো। এক, দুই, তিন করতে করতে যুবকটি এগিয়ে একবারে গলার কাছে পিস্তল ধরা মাত্র আমি আর দেরি করিনি। ডান হাত দিয়ে যুবকটির পিস্তলসহ মুষ্টিবদ্ধ হাত ধরে ফেলি। তখন পিস্তলটি আমার হাতে। তারপরও যুবকটি বলছে, সব খুলে দিন। আমি এবার বীরের মতো বললাম, তোর কাছে কি আছে এবার আমাকে বুঝিয়ে দে, নইলে গুলি করে মাথা গুড়িয়ে দেব। ইতিমধ্যেই মোটর সাইকেলসহ ওর সঙ্গী এ দৃশ্য দেখামাত্র পালিয়ে যায়। আশেপাশের লোকেরাও আমার সাহস দেখে একজন দুজন করে কাছে আসতেই পিস্তলধারী যুবকটি আমার হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। যুবকটিকে আমি আসলে একাই আটকে রাখতে পারতাম, কিন্তু পারিনি, কারণ মাস্তানটি আমার পাশে বসা প্রতিবেশি মহিলার পাশ থেকে আমাকে আক্রমণ করেছিল। তাই তার শরীরের ওপর দিয়ে মাস্তান যুবকটিকে ধরে রাখা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর নিজের খুব খারাপ লাগলো একটি কারণেই তা চোখে জল এসে গেল। লোকজনের ভিড় থেকে রিকশা বের করে চলে এলাম বয়সে এ ধরনের একটি পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে এমন কল্পনা করতেও যেন ভয়ে গা শিউরে ওঠে।

উল্লেখ্য, মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী এ দেশের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীপুর মা। তাঁর স্বামী কবির রায় চৌধুরী অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব হিসেবে অবসর নিয়েছেন। জাকির হাসান।

সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে (সংলাপ) এ সন্ত্রাস সম্পর্কে একটি বিদগ্ধ আলোচনা প্রচার করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধি গিয়াস কামাল চৌধুরী সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের নব নির্বাচিত সভাপতি ড. রফিকুর রহমান ও এডিশনাল আইজিপি এম শাহজাহান এতে অংশ নেন। এ আলোচনায় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিশেষ করে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচকরা মন্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক শিক্ষাঙ্গনে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণ কি এ সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর কিছু বিরূপ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী। এসব ছাত্রছাত্রীর অনেক অভিভাবক ঢাকাতেই থাকেন। একবার অভিভাবকদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হলে একজন অভিভাবকও আসেনি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র সংগঠন রয়েছে। এ সংগঠনগুলি বিভিন্ন দলের অঙ্গ। কাজেই ওইসব রাজনৈতিক দল তাদের ছাত্র সংগঠনের কর্মিদের সন্ত্রাস কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও খুব ভালো সহযোগিতা যে পাওয়া যায় তাও বলা যাচ্ছে না।

গিয়াস কামাল চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের একটি মহাসম্মেলন ডাকা যেতে পারে যাতে সন্ত্রাস বিরোধী একটি মতৈক্য প্রথিতযশা করা যেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের সন্ত্রাস থেকে বিরত রাখতে পারে, বিশেষ করে সন্ত্রাসী কাজে জড়িতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন কর্মিকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। চট্টগ্রাম সফরকালে তিনি লক্ষ্য করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অতি রাজনৈতিক মেরুকরণ পরিস্থিতিতে সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে।

এ আলোচনাকালে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি জনাব শাহজাহানকে অনেকটা আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে দেখা যায়। তবে তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গন এ সমাজেরই অংশ। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস তখনই থাকবে না, যখন সমাজের সকলেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। একা পুলিশের পক্ষে এ সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অনেক কমে আসছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এ আলোচনায় একটি প্রশ্ন উঠেছিল। ক্যাম্পাসে নতুন করে অস্ত্র আসছে কোথা থেকে? এ বিষয়ে সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী বলেন, বর্তমান বিশ্বে অস্ত্র নির্মাণ ও বেচাকেনা একটি লাভজনক ব্যবসা। আমাদের দেশের বাইরে থেকে অস্ত্র প্রবেশ করা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। তাছাড়া যাদের হাতে একবার অস্ত্র আসে তারা অস্ত্র ছাড়া চলতে পারে না। কাজেই বিষয়টি খুবই জটিল। ড. রফিক রহমান বলেন, সন্ত্রাস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে গেলে বেকারত্ব দূর করতে হবে। চোরাচালান বন্ধ করে দেশি শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানের উপস্থাপক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টির ওপর বার বার গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্যোগী হতে তাগিদ দেয়া হয়।[৫] *জানাল সাপ্তাহিক আগামী ৪ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা-১১-১৩। ৪বর্ষ ৪৫ সংখ্যা।*

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকা:

১। ফয়েজ আহমেদ, রাজনীতি "৯৫" । প্রকাশনা মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৯৬। পৃষ্ঠা-৯৫- ৯৭।

২। *Countering Terrorism In Bangladesh. Edited by Farooq Sobhan Bangladesh Enter Prise Institute. The University Press limited 2008* পৃষ্ঠা-১১-১২।

৩। ড. আবদুল মল্লিক, বাংলাদেশের রাজনীতি মুখ ও মুখোশ। প্রকাশনা জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা-২০০৩ ইং, পৃষ্ঠা-১৮১ - ১৮৮।

৪। জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৪ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪বর্ষ ৪৫ সংখ্যা। পৃষ্ঠা -১৩।

৫। জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৪ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪বর্ষ ৪৫ সংখ্যা। পৃষ্ঠা -১১-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

• সন্ত্রাস বিএনপি শাসনামল ঃ

সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়। বিষ্ণুদের একটি কবিতারচরণ "শক্তি বড়ো ভয়ানক, তার চেয়ে ভয়ানক শক্তির লব্ধতা। বিরোধীদলীয় নেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক জঙ্গি তৎপরতা প্রসঙ্গে কবিতার ঐ কথাগুলো মনে কড়ে গেলো। শক্তির লুব্ধতা কতখানি ভয়ানক হতে পারে তা আমদের জাতীয় ইতিহাস একাধিক ট্রাজিক ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। শক্তি লুব্ধতার হিংস্র জিঘাংসার কারণেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ম্যাডাম জিয়ার স্বপ্ন-সহচরদের হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে সপরিবারে। 'শক্তির লুব্ধতা' এমনকি জেনারেল জিয়ার হত্যাকাণ্ডের জন্যেও দায়ী। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায়, সে নাকি মানুষের রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে যায়। শক্তি, ক্ষমতার দম্ভ ও মদমত্ততা কী বেগম জিয়া তা দেখিয়েছেন; তার পাঁচ বছরের 'গণতান্ত্রিক' শাসনে 'রক্তের স্বাদ' ও তিনি পেয়েছেন। ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহের দাবি জানাতে গিয়ে ১৮ জন কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছিল ম্যাডাম জিয়ার শাসনামলে। মানুষের রক্তের স্বাদ তাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। ব্যাপরটা অবশ্য নতুন নয়। তার প্রয়াত স্বামী জেনারেল জিয়ার হাতে বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর কয়েক হাজার অফিসার সৈনিক নির্বিচারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। জিয়ার জীবন রক্ষাকারী ও ক্ষমতাসীন করার মূল নায়ক, মুক্তিযুদ্ধের পরীক্ষিত সহযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু অত্যুজ্জ্বল সাহসী কর্নেল তাহেরকে অবলীলায় ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছেন জেনারেল জিয়া। ঘটনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় হত্যা, সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের একটা পারিবারিক ঐতিহ্য যেনো গড়ে তুলেছেন এ পরিবারটি। কাকতালীয় নয় মোটেই, এ পরিবারটিকে ঘিরে বিএনপি নামক যে দলটি গড়ে উঠেছে তার চারপাশে অতীতে যেমন জড়ো হয়েছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী শাহ আজিজুর রহমান, যাদু মিয়া, রাজাকার সর্দার মাওলানা মান্নান ও আব্দুল আলীম তেমনি বর্তমানেও রয়েছে চট্টগ্রামের কুখ্যাত ফকা চৌধুরীর ও সিকা চৌধুরী পাকবাহিনীর সহযোগী রূপগঞ্জের মতিন চৌধুরী এবং পাকবাহিনীর মুরগি সাপ্লাইয়ার্স এরশাদের ঝাড়ুদার আনোয়ার জাহিদ প্রমুখ রত্নরাজি। অতীতের মুসলিম লীগ ও পিকিংপন্থী ঘরানার দলছুটি, সুবিধাবাদী ও বহুরুপী মর্দে মমিনদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বাহন বিএনপি আসলে মুসলিমলীগেরই নব্যসংস্করণ। এ দলটি বহন করছে হত্যা, ক্যু, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, হানাহানি এবং অন্ধ ভারত বিরোধিতার উত্তরাধিকার। রক্ত-ক্লেদ ও হরোর-এর মধে নেতৃত্বের যে, দলের জন্ম, বন্দুকের নল যাদের ক্ষমতার উৎস, ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তাদের ক্ষমতায় লুব্ধতা, শতগুণ বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। এদের ক্ষমতার সিঁড়ি তৈরি হয় মানুষের লাশ, হাড়গোর, অস্থিমজ্জা দিয়ে। বেগম জিয়ার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে, তিনি দেশব্যাপী সংঘাত, সন্ত্রাস-রক্তপাত-নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন।

এ কথা গোপন নয়, বিএনপি এবং খালেদা জিয়া ১৯৯৬ এর নির্বাচনে জনগণের রায়কে গ্রহণ করতে পারেননি। প্রথম থেকে তিনি সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং রাজনৈতিক শালীনতা বিসর্জন দিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার হুমকি দিয়ে আসছেন। পুরনো মদে মাদকতা বেশি। সম্ভবত সে কারণেই তিনি পুরনো ভারত বিরোধী, সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে বাংলাদেশের সকল ধর্ম ব্যবসায়িদের নিয়ে মাঠ গরম করার চেষ্টা করেছেন। পার্লামেন্টের ভেতরে কথা না বলে তিনি মাঠে ময়দানে বলে বেড়াচ্ছে, পার্লামেন্টে তাকে কথা বলতে দেয়া হয় না। পার্লামেন্টকে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা প্রচেষ্টাকে বানচাল করা এবং পার্লামেন্টকে অকার্যকর করে তোলার জন্যেই পার্লামেন্টের সেই উদ্বোধনী অধিবেশন বর্জন থেকে শুরু করে কারণে অকারণে ওয়াক-আউট ও বর্জনের তামাশা

Dhaka University Institutional Repository

অব্যাহত রেখেছেন। কৃত্রিমভাবে একটার পর একটা ইস্যু তৈরি করে হরতাল, ধর্মঘট, জ্বালাও পোড়াও, দোকানপাট, গাড়ি, বাস প্রভৃতির যানবাহন ভাঙচুর করে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। আগ্নেয়অস্ত্রে সুসজ্জিত দলীয় ক্যাডার ও সন্ত্রাসিদের নিয়ে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় তিনি যে মাফিয়া চক্রটি গড়ে তুলেছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত দলীয় ক্যাডার ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় তিনি যে মাফিয়া চক্রটি গড়ে তুলেছিলেন, তাদেরকে লেলিয়ে দিচ্ছেন জনগণ ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ সন্ত্রাসী মাফিয়া চক্রকে লেলিয়ে দিচ্ছেন জনগণ ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। এ সন্ত্রাসী মাফিয়া চক্রের হাতে গত সতেরো মাসে ৫৮ জন আওয়ামী লীগ ১০৪ জন ছাত্রলীগ কর্মিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ তুলেছেন, আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভারতের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। ভূতের মুখে রাম নাম।

আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে যারা স্বাধীনতা ও মুক্তির চেতনার শিখা জ্বালিয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সেই দল সম্পর্কে স্বাধীনতা বিক্রির অভিযোগ তোলার আগের হাজার মুক্তিযোদ্ধা যখন পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছে, অকাতরে প্রাণ দিয়েছে, গ্রামে গঞ্জে বাঙ্কারে বাঙ্কারে হাজার হাজার বাঙালি মা-বোন স্বামীর কাছে মুক্তাঞ্চলে যেতে না চেয়ে পাকিস্তানি জেনারেলদের হেরেম উজ্জ্বল করেছিলেন। স্বাধীনতার জন্যে তো তার দরদ থাকতে পারে না। ঐতিহাসিক গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তিনি স্বাধীনতা বিক্রির আওয়াজ তুলেছিলেন। কিন্তু বাজার না পেয়ে এটা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয় অচিরেই। সম্প্রতি রাজপথে জনসভা করার দাবিতে তিনি বাজার মাত করতে চেয়েছেন। কিন্তু যানজটে অতিষ্ঠ মহানগরীর দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ পৌর কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত কে স্বাগত জানান, কিছুদিন জেদাজেদির হরতাল একসারসাইজ করলেও এ ইস্যুতেও জনগণকে মাঠে নামানো সম্ভব হয়নি। অতঃপর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে সর্বশক্তি দিয়ে জাপটে ধরে জলশূন্য সাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন। এ এক সর্বনাশা আত্মঘাতী খেলা। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার পেছনেও তিনি দেশ বিক্রির উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাহাড়ি জনসংহতি সমিতির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে নাকি পার্বত্য চট্টগ্রাম তো বটেই, চট্টগ্রাম বন্দরসহ পুরো চট্টগ্রাম জেলা, এমনকি খালেদা জিয়ার নির্বাচনী এলাকা ফেনী পর্যন্ত ভারতের হাতে তুলে দেয়া হবে। শান্তির বিরুদ্ধে তাই তিনি জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ কথা কারো অজানা নেই, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছিলেন এবং এ সমস্যার সামরিক সমাধানের উদ্দেশে দেশের একাংশ হতে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন বেগম জিয়ার প্রয়াত স্বামী জেনারেল জিয়া। এ সমস্যাকে জিইয়ে রাখার মূলে দেশি বিদেশি একটি কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবত সক্রিয় রয়েছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও পর্যবেক্ষকরা সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা জিইয়ে রাখার পেছনে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার এবং বেশকিছু আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালানি গোষ্ঠী, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের হাত রয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে হিটারল্যান্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেয়া, অস্ত্রে চোরাচালানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ লুটপাট ও কুক্ষিগত করার লক্ষ্য থেকেই দেশি বিদেশি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো সক্রিয় রয়েছে। এমনকি একথাও গোপন নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কোনো না কোনো দুর্গম এলাকাকে জামাত-শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের ট্রেনিং সেন্টার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অভিযোগ আছে এসব কর্মকাণ্ড এবং অস্ত্র চালান ও ভারতীয় ইনসারজেন্সিকে সহায়তাদানের সঙ্গে বিএনপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একাংশ জড়িত রয়েছে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে কার বা কাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে তা

Dhaka University Institutional Repository

আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অন্যথায় কোনো সুস্থ স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম-চট্টগ্রামসহ ফেনী পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়ার অভিযোগ তোলা কি সম্ভব?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্যে বিরোধী দলগুলোর সংবিধানসম্মত অধিকার রয়েছে। বিরোধী দল দেশের রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য এবং তাদের অনুকূলে পরিবর্তনের উদ্দেশে জনচিত্ত জয় করার চেষ্টা করবেন, প্রচারণা ও আদর্শগত সংগ্রাম করবেন এবং সরকারের ভুল-ভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সংবিধানস্বীকৃত পন্থায় আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলবেন এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে বরং গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা আরো সংহত ও বিকশিত হয়। সরকারি দল রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হলে অথবা জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ না হলে জনগণই মেয়াদ শেষে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ভেতর দিয়ে বিরোধী দল বা নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবে। এজন্যে দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোকে বিশেষ করে বিরোধী দলগুলোকে নিয়মতান্ত্রিকপন্থায় তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখে ধৈর্যধারণ করতে হবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত। অন্যথায় তাদের দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত আচরণে গণতান্ত্রিক আচরণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা সৃষ্টি হবে। দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অসাংবিধানিক পন্থায় তৃতীয় জোনো অশুভ শক্তির পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বাংলাদেশে ১৯৭৫ এরপর এ অভিজ্ঞতা আমাদের একাধিকবার হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে বিএনপি এখন যা করছে তার লক্ষ্য কি?

বেগম জিয়া তো প্রকাশ্যেই আমাদের সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার জন্যে উস্কানি দিচ্ছেন। তিনি যা করছেন, বা বলছেন, তাতে আমাদের পবিত্র সংবিধান, প্রচলিত আইন এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলীতে এটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে বেগম জিয়া গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাতে চাচ্ছেন। আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করে তিনি সশস্ত্র সন্ত্রাসী ও মাফিয়াচক্রকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছেন। তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই পরিকল্পিতভাবে গোলাগুলি, সশস্ত্র সংঘাত বাঁধিয়ে চলেছেন। যতবার তিনি চট্টগ্রাম গিয়েছেন ততোবারই সেখানে তার সন্ত্রাসী বাহিনী একটা না একটা ঘটনা ঘটিয়েছে। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে গিয়ে তিনি নিজেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি করলেন। ট্রাক ও মাইক্রোবাস ভর্তি আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ক্যাডাররা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজে আক্রমণ চালিয়ে ছাত্রলীগ কর্মি মাহফুজসহ তিনজনকে হত্যা করেছেন। মওকা পেয়েছেন তিনি। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পরে হরতাল দেবেন বলে তার সিদ্ধান্ত থেকে এক কদম পিছিয়ে এলেও, শান্তি আলোচনার প্রাক্কালেই দুই দিনের হরতাল ঘোষণা করেছিলেন। পূর্ব থেকে প্রস্তুতি মাফিয়া বাহিনী চারদিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়ে রাজধানীসহ সারাদেশে আকস্মিকভাবে হামলা, গাড়ি, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের তাণ্ডব সৃষ্টি করলো।

২৯ নভেম্বর চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব নির্ধারিত জনসভা বানচাল করার জন্যে দিনব্যাপী হরতাল আহ্বান এবং প্রধানমন্ত্রী জনসভায় আগত মিছিলে বিএনপি সন্ত্রাসিরা হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে চারজন আওয়ামী লীগ কর্মিকে। সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির এ ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, বেগম জিয়া এক গভীর ষড়যন্ত্রের নীলনকশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন করে তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের সঙ্গে আলোচনা ও শলাপরামর্শ করে মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত সকল স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে নিয়ে জোটবদ্ধ হয়েছেন। বিএনপি ও জামাতের এ আঘাত বিএনপির সশস্ত্র মাফিয়াচক্র এবং জামাত-শিবিরের ঘাতক বাহিনীকে উৎসাহিত করেছে। মাঝে কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

অবদমিত হয়ে ঘাপটি মেরে থাকলেও জামাত-শিবিরচক্র আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, পাবনা, বরিশাল, রংপুর প্রভৃতি জায়গায় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির ওপর হামলা চালিয়েছে। সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আজ ঐক্যবদ্ধভাবে এ অপশক্তিকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে না এলে পরিস্থিতির অবনতি রোধ করা যাবে না।

সর্বশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যু হাত ছাড়া হয়ে যাবে বুঝতে পেরে বিএনপি ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচনকে টার্গেট করেছিল। দলীয় ভিত্তিতে না হলেও বিএনপি আগাম অভিযোগ তুলেছিল এ নির্বাচন নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে না। এ অভিযোগের মাজেজা অত্যন্ত পরিষ্কার। শান্তি পূর্ণভাবে নির্বাচন যাতে অনুষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্যে বিএনপি জামাতচক্র গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে তাদের সশস্ত্র ক্যাডারদের পাঠাচ্ছে। ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেছে, বিএনপি জামাতেচক্র নিজ দলের সশস্ত্র ক্যাডার ছাড়াও প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পেশাদার খুনি, মাস্তান ও সন্ত্রাসিদের ভাড়া করে গ্রামাঞ্চলে পাঠাচ্ছে। কয়েক হাজার কেন্দ্রে নির্বাচন বানচাল ও শান্তি বিঘ্নিত করতে পারলেই তারা শ্লোগান তুলবে আওয়ামী লীগের অধীনে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয়। অতএব সময় থাকতেই দেশবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের সকল ষড়যন্ত্র রুখতে হলে আজ সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক শক্তিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে। দীর্ঘ একুশ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে যে গণতন্ত্র ও মুক্তির সুবাতাস বইছে, উন্নয়ন ও বিকাশের যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, তা যেন বানচাল না হয়, সে জন্যে কেবল সরকার বা সরকারি দল নয় অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে, সিভিল সমাজকে হাতে হাত রেখে এগিয়ে আসতে হবে। যে কোনো মূল্যে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে রুখতে হবে।[১] *মোমেন উদ্দিন জোয়ার্দার। রাজনীতির চালচিত্র, পাবলিকেশন হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০৩ ইং, পৃষ্ঠা-৯৭-১০১।*

- **চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠনের প্রয়োজনেই সন্ত্রাস অব্যাহত আছে**

১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনের পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিএনপি সরকারের আমলে সন্ত্রাসী তৎপরতা কমে এসেছিল এমন কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। এ তৎপরতা আওয়ামী লীগ আমলের মতো অব্যাহত ছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ অভিন্ন শাসক শ্রেণীরই একটি দল হিসেবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি হলো একই বৃন্তে দুই ফুলের মতো। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতে থাকার সময় ১ অক্টোবরের গড়িয়ে যাওয়া সন্ধ্যা রাত্রিতেই বিএনপির বিজয় নিশ্চিত জেনে তাদের ছাত্রসংগঠনের সশস্ত্র কর্মিরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে চড়াও হয়ে সেগুলো দখল করে। শেখ হাসিনার নিশ্চিত জয়ের ঘোষিত আশ্বাস বাণীর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রেখে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের যে সন্ত্রাসী কর্মিরা বিভিন্ন হল দখলে রেখে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলো তারা হঠাৎ করে নির্বাচনে পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে হতভম্ব অবস্থায় কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই হল ত্যাগ করে। বিএনপির সশস্ত্র কর্মিদের হল দখলপর্ব শেষ হয় মাত্র কয়েকদিন আগে জগন্নাথ হল দখলের মধ্যে দিয়ে। এ হল দখলের সময় ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মিদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়।

হল দখলের সময় পুলিশ বাহিনী সেখানে উপস্থিত থাকলেও তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুযায়ী তারা নীরব ও নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের দখলদারী প্রতিষ্ঠার অপকর্মে সহায়তা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রথমেই শুরু হলেও বাংলাদেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। নতুন নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন করে শুরু হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব। দেখা যাচ্ছে, সারাদেশে বিগত দশ বারো

Dhaka University Institutional Repository

বছর ধরে যে ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা চলে আসছে তাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের সঙ্গে তাল মিলিয়েই হয়ে এসেছে। অবশ্য এখানে বলা দরকার যে, সারাদেশে সন্ত্রাস এভাবে বিস্তৃতি লাভের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসই ছিল সব থেকে ভয়াবহ। জামাতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরই প্রথম ব্যাপক আকারে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এলাকায় শুরু করে তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতা।

বিগত নির্বাচনের পর থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও হামলা যেভাবে চলছে এবং ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের লোকজনরা যেভাবে এখনও সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তাতে মনে হয় না যে, আওয়ামী লীগের পরাজয় থেকে এরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেছে। আসলে যে সব স্বার্থ ও স্বার্থ চিন্তা দ্বারা এরা পরিচালিত হয় তাতে এ থেকে শিক্ষা নেয়ার কোনো উপায় তাদের থাকে না। প্রধানমন্ত্রীত্বের গদিতে বসে প্রথম থেকেই বেগম খালেদা জিয়া ও তার লোকজন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে বলছেন, তারা যে কোনো প্রকারে সন্ত্রাস দমন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু, এসব কথাবার্তা সত্ত্বেও সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে তারা কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন এরকম কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ক্ষমতায় থাকার সময় শেখ হাসিনাও শ্লোগানের মতো করে বলতেন, সন্ত্রাসীর কোনো দল নেই, যেখানেই তাদেরকে সন্ত্রাস করতে দেখা যাবে সেখানেই তাদেরকে ধরে শাস্তি দেয়া হবে, তাদের কোনো ক্ষমা নেই ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত বোলাচাল সত্ত্বেও হাসিনার পরিবারের লোকজন, দলের লোকজন, তাদের ছাত্রসংগঠনের কর্মিরা আওয়ামী লীগের শাসন আমলে অবাধে এ পুলিশের নিরাপত্তার আড়ালে ভয়াবহ আকারে সন্ত্রাসী তৎপরতা। বরিশালে হাসিনার ফুপাতো ভাই হাসানাত আব্দুল্লাহ এলাকায় ভাই মুক্ত বরিশাল চাই এর আওয়াজ এ বাস্তব পরিস্থিতিরই প্রতিফল।

খালেদা জিয়া মুখে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বললেও সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে যে তাদের কোনো প্রকৃত আগ্রহ নেই সেটা হলগুলোতে সন্ত্রাসের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশের ভূমিকা থেকে বোঝা যায়। পুলিশের নাকের ডগায় ও চোখের সামনে সমস্ত সন্ত্রাসী তৎপরতা চলতে থাকা অবস্থায় তারা যখন দর্শকের ভূমিকা পালন করে তখন বোঝা যায়, পুলিশের প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সে রকম নির্দেশ আছে। কারণ ওই রকম পরিস্থিতিতে পুলিশের নিরব ভূমিকা পালনের কথা নয়। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্যে যা কিছু করণীয় সেটাই করা। তারা যাতে এ ভূমিকা পালন করে এজন্য জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তাদেরকে প্রতিপালন করা হয়।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী লোকজনের ওপর হামলা করতে পুলিশের অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা যায়। এজন্য তারা এভাবে নিরীহ মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কাজেই সন্ত্রাস যেখানে চোখের সামনে ঘটছে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ঘটনা অবলোকন করার ব্যাপার সরকারি নির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো তাদের ছাত্র সংগঠন কর্তৃক দখল করার সময় পুলিশকে সন্ত্রাসীদের সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করার নির্দেশ দিয়ে আওয়ামী লীগের অনুসৃত নীতিরই অনুসরণ করছে তাতে সন্দেহের কারণ নেই।

শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেই নয়, সারাদেশে এখন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আবার নির্বাচনের আগের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এদিক দিয়ে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তারা সকলেই এ সন্ত্রাসী তৎপরতার আওতার অন্তর্গত। সরকার যদি সন্ত্রাস দমনকে উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এবং এ কাজে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে যেভাবে পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক রাখা ও নির্দেশ দেয়ার তার কিছুই যে বাস্তবতা নেই সেটা বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ও ঘটনা পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশের ভূমিকা থেকে বোঝা যায়। সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা জানে, সরকারের কাছে তাদের মূল্য আছে এবং সরকার তাদেরকে দমনের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়। সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া কার্যকলাপের জন্য এর থেকে সুবিধাজনক শর্ত আর কি হতে পারে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাসীরা আবার নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। প্রথমত বিএনপির যে সন্ত্রাসীরা আওয়াম লীগ সরকারের আমলে অসুবিধার মধ্যে ছিল তারা চাঙ্গা হয়েছে। দ্বিতীয়ত জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের ক্রিমিনালরাও চারদলীয় জোটের মধ্যে তাদের অবস্থানের জন্য নতুনভাবে সক্রিয় হচ্ছে। এরশাদ সরকারের আমলে এদের দুর্বৃত্তগিরি চরম আকার ধারণ করলেও নব্বইয়ের দশকে সেটা কমে এসেছিল।

এখন আবার নতুন উদ্যমে তারা সক্রিয় হয়েছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা দখলদারী শুরু করেছে এবং সাধারণভাবেও জনগণের বিভিন্ন অংশের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হচ্ছে আওয়ামী লীগের বেশকিছু সন্ত্রাসী ক্রিমিনাল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার পর সরকারি নিরাপত্তার জন্যে এদের একটা অংশ বিএনপির ছত্রছায়ায় চলে আসছে।

এ সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। মুখে যে যাই বলুক শাসক শ্রেণীর প্রত্যেক দলের কাছেই, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলের কাছে, এদের যথেষ্ট আদর। কাজেই সন্ত্রাসীর কোনো দল নেই বলে এদেরকে কোনো সরকারই দমন করে না। প্রকারান্তরে প্রত্যেক সরকারই এদের দলে টানার চেষ্টা করে এবং এদের মাধ্যমেই নিজেদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহত রাখে।

চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরিকে সন্ত্রাসীরা তার নিজের বাসায় গুলি করে হত্যা করেছে। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ এ সন্ত্রাসীদের ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মি হিসেবেই চিহ্নিত করেছে। এরশাদের আমলে সরকারের পরোক্ষ সহায়তায় সন্ত্রাস করতো। কিন্তু এখন এ ক্রিমিনালরা সরকারি ক্ষমতায় থাকার কারণে বিএনপির ছাত্র কর্মিদের মতোই পুলিশের সহায়তা লাভ করবে এরশাদের আমলের থেকে আরো সক্রিয়ভাবে।

আসলে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামাতে ইসলামী ইত্যাদি শাসক শ্রেণীর যে দলই হোক, তাদের চরিত্র অভিন্ন। কারণ এরা প্রথম থেকেই চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠনের সন্ত্রাসকেই তারা ব্যবহার করেছে এক মস্ত হাতিয়ার হিসেবে। চুরি, দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের প্রয়োজনেই সন্ত্রাস এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সকল প্রকার স্বার্থেই অবলম্বনে পরিণত হয়েছে। কাজেই সকল দলেরই এদেরকে প্রয়োজন। এরা শাসক শ্রেণীর প্রত্যেকটি দলের কাছেই আদরনীয়। এদের কোনো দল নেই।[২] *বদরুদ্দিন উমর, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ। বসুন্দরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা -২০০৩। পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৬।*

তথ্যনির্দেশিকা

১। *বদরুদ্দিন উমর, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ। বসুন্দরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ঢাকা -২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-১৬৪-১৬৬।*

২। *মোমেন উদ্দিন জোয়াদার। রাজনীতির চালচিত্র, পাবলিকেশন হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা-২০০৩ ইং, পৃষ্ঠা-৯৭-১০১।*

Dhaka University Institutional Repository

- **বি.এন.পি সরকারের আমলে গঠিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতিবেদনের সূত্রসমূহঃ**

দৈনিক ইত্তেফাক জানুয়ারী- ২০০৫ইং

- ২ জানুয়ারী, ১০ তম সংখ্যা, ভোলায় মেঘনা বক্ষে ৪ ট্রলার ছিনতাই, ২ লাখ টাকা মুক্তিপন দাবী।
- ৩ জানুয়ারী, ১১ তম সংখ্যা, বাঘমারায় যাত্রা মঞ্চে বোমা-আহত ৫০।
- ৬ জানুয়ারী, ১৪ তম সংখ্যা, কুমিল্লায় রিকসা চালকের ছুরিকাঘাতে ট্রাফিক পুলিশ খুন।
- বান্দরবানে ১১টি একে ৪৭, রাইফেল উদ্ধার।
- ১১ জানুয়ারী, ১৯ তম সংখ্যা, ডেমরা টেক্সটাইলের হিসাব রক্ষককে গুলি করে হত্যা, ৩১ লাখ টাকা ছিনতাই। * টাঙ্গাইল মির্জাপুরে স্বামী-স্ত্রী হত্যা, বি.এন.পি ও ছাত্রদল নেতা আটক। * যাত্রা ও নাট্য মঞ্চে বোমা হামলা, বগুড়া ও নাটোরে নিহত তিন, আহত ৭০।
- ১৮ জানুয়ারী, ২৬ তম সংখ্যা, বগুড়ায় বিস্ফোরণ ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, মহিলাসহ গ্রেফতার দুই। ২৮ জানুয়ারী, ৩৩ তম সংখ্যা, হবিগঞ্জে আওয়ামীলীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলায় কিবরিয়া সহ ৪ জন নিহত, আহত শতাধিক, শহরে বিক্ষোভ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, শনিবার সারা দেশে হরতাল।
- ৩০ জানুয়ারী, ৩৫ তম সংখ্যা, উত্তরায় প্রকৌশলী খুন, মেয়ে গুলিবিদ্ধ, অর্থ অলংকার লুট। চিলমারিতে বোমা বিস্ফোরণ, আহত গৃহবধুসহ ৭ জন আটক।
- ৩১ জানুয়ারী, ৩৬ তম সংখ্যা, তৃতীয় দিনের হরতালে লাঠি চার্জ আহত ১০০, গ্রেফতার ৫০, যানবাহন ভাংচুর, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ।

দৈনিক ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী- ২০০৫ইং

- ৩ ফেব্রুয়ারী, ৩৯ তম সংখ্যা, রাতে রাজধানীতে বোমাবাজি, গাড়ী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ।
- ৫ ফেব্রুয়ারী, ৪১ তম সংখ্যা,রাজধানীতে ৪টি বাসে অগ্নিসংযোগ।
- ৬ ফেব্রুয়ারী, ৪২ তম সংখ্যা, খুলনা প্রেস ক্লাবে বোমায় চার সাংবাদিক আহত, রাজধানীতে সন্ধ্যার পর অগ্নিসংযোগ, হরতালে সংঘর্ষ লাঠিচার্জ পুলিশের কাঁদানে গ্যাস, আহত ৫০, গ্রেফতার ৩৪।
- ৭ ফেব্রুয়ারী, ৪৩ তম সংখ্যা, নালিতাবাড়ীতে ১ পুলিশ নিহত, শহরে থমথমে অবস্থা।
- ৮ফেব্রুয়ারী, ৪৪ তম সংখ্যা, কিশোরগঞ্জে আওয়ামীলীগের মিছিলে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত, পুলিশ সুপার সহ আহত শতাধিক।
- ১৪ ফেব্রুয়ারী, ৫১ তম সংখ্যা, টিএসসিতে ভ্যালেন্টাইন ডে'র অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, আহত অর্ধশতাধিক, ৩টি তাজা বোমা উদ্ধার।
- ১৬ ফেব্রুয়ারী, ৫২ তম সংখ্যা, ঢাবি ক্যাম্পাস থমথমে, বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীরা ক্ষুব্ধ।
- ১৭ ফেব্রুয়ারী, ৫৩ তম সংখ্যা, নওগাঁয় ব্র্যাক ও উল্লাপাড়া গ্রামীণ ব্যাংকে বোমা হামলা, আহত ৯, রংপুর ব্র্যাকে ৩ গ্রেনেড উদ্ধার,।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯ ফেব্রুয়ারী, ৫৪ তম সংখ্যা, মধুপুরে শক্তিশালী ৯টি তাজা বোমা উদ্ধার, ঠাকুরগাঁয়ে বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ ৪ জঙ্গি গ্রেফতার।
- ২৪ ফেব্রুয়ারী, ৫৮ তম সংখ্যা, দুই তরুণকে জবাইয়ের চেষ্টা, আটক তিন।
- ২৫ ফেব্রুয়ারী, ৫৯ তম সংখ্যা,আরো ৭ জঙ্গি গ্রেফতার, চলনবিলে অস্ত্রসহ আটক ৩ যুবক, খুলনায় গ্রেনেড, বান্দরবানে বন্দুক ও ঝিনাইদাহে ১২ টি বোমা উদ্ধার।

দৈনিক ইত্তেফাক মার্চ- ২০০৫ইং

- ৩ মার্চ, ৬৫ তম সংখ্যা, পলাশে ওরসে বোমা বিস্ফোরণ, ৫জন আহত। চবারু ঘাটে মাজারে বোমা হামলার হুমকি।
- ৭ মার্চ, ৬৯ তম সংখ্যা, আদালত পাড়ায় যুবক খুন, রাজধানীতে চার হত্যাকান্ড। চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ডে ৫ হাজার মারনাস্ত্র।
- ১০ মার্চ, ৭২ তম সংখ্যা, জগন্নাথ ভার্সিটি রণক্ষেত্র। শিবির কর্মীদের সংগে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, শতাধিক আহত।
- ২৩ মার্চ, ৮৫ তম সংখ্যা, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রক্ষিদের সংঘর্ষে আহত ৫০, ৭ রক্ষি সাসপেন্ড, ৭ জন স্টান্ড রিলিজ।

- **দৈনিক ইত্তেফাক এপ্রিল- ২০০৫ইং**

- ১ এপ্রিল, ৯৪ তম সংখ্যা, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বোমা বিস্ফোরণ প্রশাসনে তোলপাড়।
- ২ এপ্রিল, ৯৫ তম সংখ্যা, অধিকার এর রিপোর্ট, তিন মাসে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ৯২টি।
- ৩ এপ্রিল, ৯৬ তম সংখ্যা, রামপুরায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে মহিলাসহ তিনজন আহত, সবুজবাগে যুবক খুন।
- ৪ এপ্রিল, ৯৭ তম সংখ্যা, সুপ্রিম কোর্ট চত্বর থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা। পুলিশ সার্জেন্ট মাহফুজ গ্রেফতার।
- ৫ এপ্রিল, ৯৮ তম সংখ্যা, বনানীর হোটেলে গুলি, ম্যানেজারসহ ২ আহত।
- ৯ এপ্রিল, ১০২ তম সংখ্যা, বরিশালে দুই বাক্স অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, আটক ২।
- ১১ এপ্রিল, ১০৪ তম সংখ্যা, সাভার ইপিজেড রণক্ষেত্র, পুলিশের শতাধিক রাউন্ড গুলিবর্ষণ, আহত ৩শ, গ্রেফতার ১১, রাবিতে ছাত্রদলের হামলায় ১০টি কক্ষের আসবাবপত্র ভাংচুর।
- ১৪ এপ্রিল, ১০৭ তম সংখ্যা, রাজধানীর তেজতরী বাজারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার খুন।
- ১৬ এপ্রিল, ১০৮ তম সংখ্যা, যশোরে ৩টি হত্যাকান্ড সহ ৬ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু।
- ১৯ এপ্রিল, ১১৩ তম সংখ্যা, জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটি রণক্ষেত্র, নবাগতদের ফুল দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, ৩ জন গুলিবিদ্ধ, আহত অর্ধশতাধিক।

Dhaka University Institutional Repository

- ২১ এপ্রিল, ১১৩ তম সংখ্যা, নৌযান ছিনতাই ও শতাধিক শ্রমিককে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়ার চাঞ্চল্যকর কাহিনী। গ্রেফতারকৃত পাঁচ নৌ ডাকাতের লোমহর্ষক বিবরণ শুনে পুলিশকর্মকর্তারাও হতবাক হয়ে যান।
- ২২ এপ্রিল, ১১৪ তম সংখ্যা, চট্টগ্রামে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১৫।
- ২৬ এপ্রিল, ১১৭ তম সংখ্যা, দুই ডিশ ব্যবসায়ী খুন, পেট্রোল ঢেলে লাশ পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, পূর্ব রামপুরায় বর্বরোচিত হত্যাকান্ড, আটক ৪।

দৈনিক ইত্তেফাক মে- ২০০৫ইং

- ১ মে, ১২২ তম সংখ্যা, 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হতে পারে' হরকাতুল সন্ত্রাসী সংগঠন, মার্কিন রিপোর্ট।
- ৩ মে, ১২৩ তম সংখ্যা, রাজধানীতে যুবক ও তরুন খুন। শ্যামলী মিরপুরে দুই ব্যক্তি খুন।
- ৬ মে, ১২৬ তম সংখ্যা, গ্রেফতারকৃত সর্বহারা সদস্যের জবানবন্দি রাজেরে অপহৃত দুই পুলিশকে ৭০-৮০ টুকরা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। চট্টগ্রামে ব্যস্ত এলাকায় প্রকাশ্যে ৩০ লাখ টাকা ছিনতাই। কসভায় জনসভায় বোমা হামলায় ১৫ জন আহত।
- ১০মে, ১৩০ তম সংখ্যা, সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি ৫শ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৩ লাখ টাকা লুট। গ্রেফতার ৩। জুরাইনে ২টি অস্ত্র ও শতাধিক গুলিসহ দুইজন গ্রেফতার।
- ১৩ মে, ১৩৩ তম সংখ্যা, মিরসরাইয়ে বস্তি দখল নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অর্ধশতাধিক পুলিশের উপস্থিতিতে বাড়ি-ঘর দোকান ভাংচুর, নারী ও শিশু অপহরণের অভিযোগ।
- ১৪ মে, ১৩৪ তম সংখ্যা, রাজধানীর হাতিরপুল এলাকায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি।
- ২০মে, ১৪০ তম সংখ্যা, সিলেট দুর্বৃত্তদের নিক্ষিপ্ত এসিডে স্বামী নিহত, স্ত্রী ও পুত্র আহত। গৃহকর্তীর নির্যাতনে মিরপুরে শিশু আশার মৃত্যু। দম্পতী গ্রেফতার।

দৈনিক ইত্তেফাক জুন- ২০০৫ইং

- ৮ জুন, ১৫৯ তম সংখ্যা, মিরপুরে যুবলীগের দুই নেতা কর্মীকে গুলি করে হত্যা।
- ১২ জুন, ১৬৩ তম সংখ্যা, রাজশাহীতে সংবাদপত্র হকার খুন।
- ২০ জুন, ১৭১ তম সংখ্যা, রাজধানীতে ১২ লাখ টাকা ছিনতাই, ছাত্রদলের দুই নেতা গ্রেফতার।
- ২১ জুন, ১৭২ তম সংখ্যা, নারায়ণগঞ্জে যুবলীগ কর্মীকে গুলি করে হত্যা, ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই।
- ২৫ জুন, ১৭৬ তম সংখ্যা, রাজধানীতে দিবালোকে যুবদল নেতা সগীর খুন। পুলিশ র‍্যাবের পাল্টা গুলিতে কথিত খুনী নিহত।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক জুলাই- ২০০৫ইং

- ৩ জুলাই, ১৮৪ তম সংখ্যা, ঝিগাতলায় ব্যবসায়ী ও আওয়ামীলীগ নেতা কামরুল সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত।
- ১১ জুলাই, ১৯২ তম সংখ্যা, কাফরুলে দুই সন্তানের সামনে মাকে গুলি করে হত্যা।
- ১৪ জুলাই, ১৯৫ তম সংখ্যা, রাজধানীতে যুবলীগ নেতা খুন।
- গুলশানে ৫ দোকানে ও ২ বাসভবনে দুর্ধর্ষ ডাকাতি।

দৈনিক ইত্তেফাক আগষ্ট- ২০০৫ইং

* ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় শিশু কন্যাসহ স্বামী-স্ত্রী খুন। * দেশ জুড়ে বোমা হামলা ঢাকা সহ ৬৩ জেলায় বিস্ফোরণ, ২ জন নিহত। আহত ৫ শতাধিক গ্রেফতার ৬০। * মহাখালীতে আবাসিক হোটেলের ম্যানেজার খুন দুইজন গুলিবিদ্ধ।

দৈনিক ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর- ২০০৫ইং

- ১ সেপ্টেম্বর, ১৪৪ তম সংখ্যা, বনানীতে ভারতীয় ব্যবসায়ী খুন।
- ৩ সেপ্টেম্বর, ১৪৬ তম সংখ্যা, রাজধানী হাজারীবাগ কোম্পানীঘাট এলাকায় রিকসা চালক খুন। গ্যারেজ মালিক গ্রেফতার। ২৬১ তম সংখ্যা, সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদল কলেজ সভাপতি সোহাগ খুন, ক্যাম্পাসে গুলিকরে হত্যা করে। * বোমা তৈরির প্রশিক্ষক সাবেক সেনা কর্মকর্তা গ্রেফতার। * ছাত্রদল ক্যাডারদের হাতে জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট লাঞ্ছিত। * ঢাবিতে এক বছরে ছাত্রদলের অর্ধশতাধিক সংঘর্ষ, কেন্দ্রীয় নেতাদের একাধিক গ্রুপ।

দৈনিক ইত্তেফাক অক্টোবর- ২০০৫ইং

- ৩ অক্টোবর, ২৭৫ তম সংখ্যা, রাজধানী মিরপুর নগর পাইকপাড়ায় চাঁদা না দেয়ায় সন্ত্রাসীরা দু'জনকে গুলি করেছে।
- ৪ অক্টোবর, ২৭৬ তম সংখ্যা, আবার আদালতে বোমা হামলা। দুইজন নিহত, আহত ২৫, ঘটনাস্থল চাঁদপুর, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম, টার্গেট ছিল বিচারকরা।
- ১০ অক্টোবর, ২৮২ তম সংখ্যা, ঢাবিতে ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষ।
- ১৮ অক্টোবর, ২৯০ তম সংখ্যা, রাজধানীতে তরুনীর ৫ টুকরা লাশ উদ্ধার। টাঙ্গাইলে বি.এন.পি নেতাকে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা। ঢাকায় কোটি টাকার হেরোইন ও অস্ত্রসহ ৮ সন্ত্রাসী গ্রেফতার।
- ২৭ অক্টোবর, ২৯৯ তম সংখ্যা, সরিষাবাড়ীতে বি.এন.পি র দুই গ্রুপে গুলি বিনিময়। আহত ৫০, লুট তরাজ। একরাতে কেরানীগঞ্জ ও রাজধানীতে ১০ ডাকাতি, গাড়ীসহ ৫ চুরি।

দৈনিক ইত্তেফাক নভেম্বর- ২০০৫ইং

- ৭ নভেম্বর, ৩০৭ তম সংখ্যা, রাজধানীতে চার দিনে স্কুল ছাত্রসহ ৫জন খুন।
- ১০ নভেম্বর, ৩১০ তম সংখ্যা, রুপগঞ্জে ছাত্রদল নেতাকে হত্যা। সড়ক অবরুদ্ধ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ। নারায়ণগঞ্জে সোনালী ব্যাংকে ডাকাতি। ৩০ লক্ষাধিক টাকা ও প্রাইজবন্ড লুট।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৫ নভেম্বর, ৩১৫ তম সংখ্যা, বোমায় দুই বিচারক নিহত। সার্ক শেষ হতেই ঝালকাঠিতে জঙ্গি হামলা। আরো ২ বিচারকসহ ৪জন আহত। সারাদেশে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ।
- ১৮ নভেম্বর, ৩১৮ তম সংখ্যা,ফরিদপুরে সাংবাদিক হত্যা।

- **দৈনিক ইত্তেফাক ডিসেম্বর- ২০০৫ইং**

- ২ ডিসেম্বর, ৩৩২ তম সংখ্যা, গাজীপুর আবার রক্তে রঞ্জিত, নিহত এক, সাংবাদিক,আইনজীবী পুলিশসহ আহত অর্ধশত। আত্মঘাতি জেএমবি সদস্য আটক।
- ৯ ডিসেম্বর, ৩৩৯ তম সংখ্যা, এবার রক্তাক্ত নেত্রকোণা, বাবরের শহরে বোমা বিস্ফোরণ, ৮জন নিহত, ৪পুলিশসহ আহত ৬০। নিহত এক ও আহত একজনকে আত্মঘাতী বলে সন্দেহ। * জেএমবির চিঠি উদ্ধার। উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিক ও পুলিশ হত্যা। গ্রেফতার ৮। * ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১০, গ্রেফতার ৫। * বানিজ্য মেলার গেটে বোমা বিস্ফোরণ, আহত অর্ধশতাধিক, শিশুসহ বহু নিখোঁজ।
- ২৯ ডিসেম্বর, ৬ তম সংখ্যা, নাটোরে পুলিশ ফাঁড়ি লুট, ৩ আনসার নিহত।* মিরপুরে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু, ব্যাপক ভাংচুর। * রাজধানী পল্লবীতে এক নরপশুর কান্ড, ১০ বছরের শিশুকে হত্যা।
- **দৈনিক ইত্তেফাক জানুয়ারী- ২০০৬ইং**

- ২ জানুয়ারী, ১০ তম সংখ্যা, সিপিবির সমাবেশে জাপার হামলা নিহত ১, মঞ্জুরুল আহসান সহ আহত শতাধিক। পুলিশ ছিল নির্লিপ্ত।
- ১৪ জানুয়ারী, ১৯ তম সংখ্যা, রাজধানীতে মডেল কন্যাসহ ৩ খুন, দুইজন গুলিবিদ্ধ। * পল্লবীতে দুই তরুনীকে রাতভর পাশবিক নির্যাতন করেছে ৫ সন্ত্রাসী ও প্রহরী। * সোনাগাজীতে যুবদল নেতা খুন। * রাজশাহী ভার্সিটিতে, শিক্ষক ও পুলিশ বনাম কর্মচারী সংঘর্ষ, আহত ৪০। * চাপাইনবাবগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত ৫, আহত দেড়শতাধিক, পল্লীবিদুৎ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির তিন নেতাকে গ্রেফতারের জের। ৭ গাড়িতে অগ্নিসংযোগ।

দৈনিক ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী- ২০০৬ইং

- ৪ ফেব্রুয়ারী, ৪০ তম সংখ্যা, রাজশাহী ভার্সিটির শিক্ষক ড. তাহের খুন। ম্যানহোল থেকে লাশ উদ্ধার। ক্যাম্পাস উত্তাল, আজ ছাত্র ধর্মঘট, সন্দেহভাজন তিনজন আটক।
- ৮ ফেব্রুয়ারী, ৪৪ তম সংখ্যা, বাড্ডায় ব্রাশফায়ারে নিহত ৪, গুলিবিদ্ধ ৫। * হবিগঞ্জের গ্রাম রণক্ষেত্র ২ জন নিহত, বি.ডি.আর তলব।

দৈনিক ইত্তেফাক মার্চ- ২০০৬ইং

- ১৫ মার্চ, ৭৮ তম সংখ্যা, ইডেনের সাধারণ ছাত্রীদের উপর ছাত্রদলের হামলা, সংঘর্ষে ১৬ ছাত্রী আহত। * সরাইলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ১, আহত শতাধিক।

দৈনিক ইত্তেফাক এপ্রিল- ২০০৬ইং

Dhaka University Institutional Repository

২ এপ্রিল, ঝালকাঠি রাজাপুরে জেএমবি কর্মীসহ ২ জন খুন। * কানসাটে পুলিশের গুলিতে আরো পাচ জন নিহত। দফায় দফায় সংঘর্ষে জখম ৫০, এ পর্যন্ত ২৪ জনের প্রাণ গেল।

দৈনিক ইত্তেফাক মে- ২০০৬ইং

দিনাজপুরে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যা। মাষ্টারদা সূর্যসেন ও জিয়াউর রহমান হল ছাত্রদলের সংঘর্ষে আহত ৩০। * আহত ছাত্রের মৃত্যুতে শাবি উত্তাল, ভিসির পদত্যাগ, অবরোধ, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, ৫ ফটো সাংবাদিক আহত। * শ্রীপুরে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ, নিহত ১, ১৭ পুলিশসহ আহত দেড় শতাধিক।

- ২৩ মে, ৫৪ তম সংখ্যা, শ্যামপুরে তিনদিনে ছাত্রলীগ নেতা সহ ৪ খুন। এলাকায় বিক্ষোভ।
- ২৭ মে, ১৪৮ তম সংখ্যা, তেজগায়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে বি.এন.পি নেতা নিহত। মুসল্লি গুলিবিদ্ধ।
  রাজধানীতে ব্রাশ ফায়ারে ব্যবসায়ী ও গাড়ী চালক নিহত।

দৈনিক ইত্তেফাক জুন- ২০০৬ইং

- বান্ডভায় ও ডেমরায় দু'টি হত্যাকান্ড। পরিচয় মেলেনি।

- **দৈনিক ইত্তেফাক জুলাই- ২০০৬ইং**
- ২ জুলাই, ১৮৪ তম সংখ্যা, সাগরে ২২ ট্রলারে ডাকাতি গুলিবিদ্ধ ৩৯, তের জেলেসহ ৩ ট্রলার ছিনতাই। নিখোঁজ ৭।
- ১৪ জুলাই, ১৯৬ তম সংখ্যা, ভালুকায় ড্রামভর্তি তিন ব্যাক্তির ১৮ টুকরা লাশ উদ্ধার। * কলমাকান্দায় আ'লীগের সাবেক এম.পির জনসভা হামলায় পন্ড, গুলি আহত ১০।
- ১৭ জুলাই, ১৯৯ তম সংখ্যা, জগন্নাথে আবারো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।
- সিলেটের গোলাপগঞ্জে এনাম ও মকবুল সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ। একজন নিহত, অর্ধশত আহত। আজ হরতাল। * হাতিরপুলে ব্রাইট হোটেলের অন্যতম মালিক হাবিব খুন। অপর মালিক সহ ৩জন গ্রেফতার।
- **দৈনিক ইত্তেফাক আগষ্ট- ২০০৬ইং**

  খালিয়াজুড়ীতে এক রাতে ৮ বাড়িতে ডাকাতি। গুলিবিদ্ধ আহত ১৫।
- ৬ আগষ্ট, ২১৯ তম সংখ্যা, গুলশানে ব্যাংকে জমা দিতে গিয়ে ১০ লাখ টাকা লুট। ডাকাতের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে দু'জন জখম। * সাভারে গৃহবধুসহ ২ জন খুন। গ্রেফতার ১।
- ২৬ আগষ্ট, ২৩৯ তম সংখ্যা, নওগায় চার পুলিশ জবাই, বোমায় যুবদল নেতা নিহত, অস্ত্র লুট, আহত ৫০, লাল পতাকার দায়িত্ব স্বীকার * ফুলবাড়ি রণক্ষেত্র। নিহত ৬, আহত দু'শতাধিক।

- **দৈনিক ইত্তেফাক সেপ্টেম্বর- ২০০৬ইং**

  রাজারবাগ পুলিশ টেলিকনের অফিস সহকারী খুন।

Dhaka University Institutional Repository

- ২৫ সেপ্টেম্বর, ২৬৮ তম সংখ্যা, ইস্কাটনে গুলি, ৫জন গুলিবিদ্ধ। * দিনাজপুরে সম্পত্তি বিরোধে পিতা ও ছোটভাই খুন। * গুলিবিদ্ধ ড. আফতাব আহমদের মৃত্যু সর্বত্র শোকের ছায়া।

- **দৈনিক ইত্তেফাক অক্টোবর- ২০০৬ইং**

- ১৪ অক্টোবর, ২৮৭ তম সংখ্যা, পল্লবীতে ৩ জনকে জবাই।
- ১৮ অক্টোবর, ২৯১ তম সংখ্যা, রাজধানীর সবুজবাগ, তিন হাজার টাকার জন্য খালা-খালুকে হত্যা। * মাইকে প্রচার করে সাগরে ৭১ ট্রলারে ডাকাতি, ৯৯ জেলেসহ ৬টি সান মুক্তিপনের জন্য আটক। পাথরঘাটা, বরগুনা।
- ২১ অক্টোবর, ২৯৪ তম সংখ্যা, শ্যামলীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ব্যবসায়ী নিহত। * দেশজুড়ে নৈরাজ্য, সংঘর্ষ ও গুলিতে নিহত ১১, আহত শত শত, রাজধানী বিচ্ছিন্ন।

- **দৈনিক ইত্তেফাক নভেম্বর- ২০০৬ইং**

- ১৮ নভেম্বর, ৩১৮ তম সংখ্যা, রাজধানীর বাড্ডা ও যাত্রাবাড়ীতে সন্ত্রাসীদের হাতে ব্যবসায়ী ও যুবক নিহত।
- ২১ নভেম্বর, ৩২১ তম সংখ্যা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, আশুগঞ্জে একবাড়িতে বৃদ্ধা, তরুণী, কিশোর ও শিশুসহ ৫ জন খুন।

- **দৈনিক ইত্তেফাক ডিসেম্বর- ২০০৬ইং**

* রাজধানীতে তিনজনের লাশ।

৫ ডিসেম্বর, ৩৩৫ তম সংখ্যা, মহেশখালীতে যুবলীগ-যুবদল বন্ধুকযুদ্ধে ৩ জন নিহত।
৭ ডিসেম্বর, ৩৩৭ তম সংখ্যা, উত্তরায় দুর্ধর্ষ ডাকাতি। ২০ কোটি টাকার স্বর্ণালংকার লুট। ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, ভাংচুর। * মগবাজার ও মালিবাগে দুই হোটেলে হামলায় নিহত ১, আহত ৯। * জয়পুর হাটের ক্ষেতলালের ৩ গ্রাম পুলিশকে জবাই। গ্রেফতার নেই। * রাজধানীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে হোটেল ম্যানেজার নিহত, কর্মচারী আহত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

- সন্ত্রাস ও আওয়ামীলীগ শাসনামল

- **আওয়ামী শাসনামলের সন্ত্রাস ঃ**

আওয়ামী লীগের বিশেষ করে তার অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দল এবং এর পরিণতিতে খুনাখুনি অহরহ লেগেই থাকে। আর আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই তাদের দলের বিশেষ করে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর খুনাখুনি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়। বিভিন্ন গ্রুপের প্রভাব বিস্তার, অবৈধ দখল, চাঁদাবাজি, লুটপাটের অর্থ ভাগাভাগি থেকেই ঘটে খুনাখুনি। ১৯৯৬ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর বিগত চার বছরে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর খুনাখুনি আওয়ামী লীগের অস্তিত্বের মতোই সত্য, বাস্তব এবং যা প্রতিটি মানুষের জানা।
কলেজসহ এলাকার নিয়ন্ত্রণ চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি নিয়ে চট্টগ্রামে শাসকদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০ নেতাকর্মি ক্যাডার খুন হয়েছে। এরমধ্যে নগরীতে খুন হয়েছে ৩০ এবং উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে প্রাণ হারিয়েছে ৫০ জন। নগরীর ছাত্রলীগ আজম নাসির গ্রুপ, মামুন গ্রুপ, কাদের গ্রুপ, ছেড়া আকবর গ্রুপ, তাহের গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি আবাসিক হলসহ চট্টগ্রামের ৬টি কলেজ। উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রলীগের তৈয়ব ও টিপু গ্রুপ।

এলাকার নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ চোরাচালানীর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপগুলো একে অন্যের ওপর চড়াও হয়েছে। কমার্স কলেজভিত্তিক ছাত্রলীগ কাদের গ্রুপ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকাসহ মোগলটুলী মাদারবাড়ী এলাকায় মাসে কোটি টাকার ওপরে চাঁদাবাজি করে থাকে। এসব এলাকা নিয়ন্ত্রণে রক্ষার জন্য প্রায় ছাত্রলীগ গ্রুপ ও নাসির গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ছাত্রলীগ মামুন গ্রুপ এমইএস কলেজভিত্তিক। এরা ওআর নিজাম এলাকা, খুলশী এলাকা ও বোলশহর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। খুলশী আবাসিক এলাকায় পাহাড়ি জায়গা-জমি দখলের বিনিময়ে চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে টেন্ডারবাজি।[১] *মোঃ জাহিদুল ইসলাম জিনু। সন্ত্রাস দমনে খালেদা জিয়া। কেকা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-২৪৭।*

- **সন্ত্রাসের বীভৎস রূপ**

ফেনী ও লক্ষ্মীপুর সম্পর্কে আজকের কাগজের মিষ্টভাষীর পর্যালোচনা যেমন বস্তুনিষ্ঠ, তেমনি দিক নির্দেশনামূলক। আজকের কাগজের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে এমনি ধরনের মনমানসিকতা। মিষ্ঠভাষীকে অভিনন্দন জানাই। এ পর্যালোচনার শুরুটা দেখুন; ফেনী এবং লক্ষ্মীপুর। পাশাপাশি দুই রাজ্যে। রাজ্যের ভেতরে রাজ্য। দুই রাজ্যে রাজাও দুজন। ওরাই রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। একজন জয়নাল হাজারী শাসন করেন ফেনী। অপরজন আবু তাহের শাসন করেন লক্ষ্মীপুর। এভাবেই শুরু হয়েছে প্রতিবেদনটি। শেষ হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তেমনি এক করুণ আবেদনের মধ্যদিয়ে। তিনি লিখেছেন আমরাও জানি, দেখেছি বাবাকে হারানোর বেদনা

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করেন আপনি। আজ ওয়ার্সি, শর্মি, নিধি, ঐশীকে তাদের বাবার কবরের মাটিতে দুফোঁটা চোখের জল ফেলার মানবিক সুযোগটুকু কি দেবেন আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? আজ ফেনীর কথা থাক, লক্ষ্মীপুর রাজ্যের রাজার কথাই পুণ্যবানরা শুনুন। তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যে কতো ব্যাপক এবং ক্ষমতা যে কেমন সীমাহীন তা তার নিজের কথায় বর্ণিত হয়েছে। ৪ অক্টোবর নাসির আহমদ ভূঁইয়া মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা পানি সম্পদমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকের উপস্থিতিতেই তিনি বলেছেন, আমাকে এ মামলায় (অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডে) জড়ালে আমি লক্ষ্মীপুর অচল করে দেব। পুলিশ যদি তাকে বা তার কোনো লোককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করে সেই পুলিশকে লক্ষ্মীপুর থেকে ঝাঁটিয়ে বিদায় করা হবে। তিনি আরো বলেন, কোনো সাংবাদিক তার বিরুদ্ধে কোনো পত্রিকায় রিপোর্ট করলে সেই সাংবাদিকের হাত পা কেটে দেয়া হবে এবং সেই পত্রিকাকে লক্ষ্মীপুরেও আর আসতে দেয়া হবে না। এখানেই সে রাজা থামেননি। তিনি আরো বলেছিলেন, অনেক সহ্য করা হয়েছে আর নয়। যদি বাড়াবাড়ি করেন হাত-পা ভেঙে মেঘনা নদীতে ফেলে দেয়া হবে।

বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক শুধু মনোযোগ সহকারে সেই রাজার কথা শুনলেন তাই নয়, তিনিও মিষ্টভাষীর কথায়, সেই করদ রাজ্যের রাজার দম্ভোক্তির অনুমোদন করে নিজেও বললেন, বিএনপি নেতারা ঢাকা থেকে এসে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সরকারি দলের নেতা-কর্মিদের নামে এজাহার দায়ের করেছেন। মাননীয় মন্ত্রী এখানেই থামেননি। তিনি জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে স্থানীয় সার্কিট হাউসে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে বৈঠক করে লক্ষ্মীপুরের রাজা আবু তাহেরকে স্পর্শ না করার নির্দেশও দিয়ে গেলেন।

১৮ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীপুরের বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলামকে আবু তাহেরের পুত্র বিপ্লব ও টিপুর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এখন পর্যন্ত তার লাশ পাওয়া যায়নি। মিষ্ঠভাষী সত্যই লিখেছেন, শেখ হাসিনার সরকারের আমলে কোনো ন্যায় বিচার আশা করেন না নূরুল ইসলামের ক্যান্সারে আক্রান্ত স্ত্রী এবং তার ছোট ছোট চার অবুঝ সন্তান। কিন্তু হার্মাদরা যদি তার লাশটি ফেরত দিতো তাহলেও এ বিধবা এবং তার চারজন অবুঝ সন্তানের কবরের মাটিতে দু ফোটা পানি ফেলে বুকটা হালকা করতে পারতেন। এক গুচ্ছ রজনীগন্ধাকে চোখের পানির লোনা পানিতে সিক্ত করে বুকের সব আবেগ মিশিয়ে, তুলে দিতে পারতেন সেই কবরের মাটির ওপর বলতে পারতেন, বেঁচে থাকা কালীন যারা তোমাকে একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেয়নি, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে তুমি ঘুমাও চিরকাল, শান্তিতে, এ মাটিতে।

২৮ সেপ্টেম্বর এ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম অপহরণের ঘটনা সরেজমিনে তদন্তের জন্যে এবং স্থানীয় জনসাধারণের মনে এ নৃশংসতায় বিমূঢ় ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদের নতুনভাবে বেঁচে থাকার সাহস যোগাতে বিরোধীদলীয় উপনেতার নেতৃত্বে জাতীয় সংসদের পঞ্চাশ জনের মতো সদস্য লক্ষ্মীপুর গমন করলে সেখানেও সৃষ্টি হয় এক অভাবনীয় দৃশ্যের। অনেককে বলতে শোনা গেল এ কোন দেশে বাস করছি আমরা? জলজ্যান্ত এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে কিছুসংখ্যক সন্ত্রাসী তার বাড়ি থেকে জোর করে তাকে অপহরণ করলো। অথচ লোকটি বেঁচে আছে, না নিহত হল তাও পুলিশ তদন্ত করে দেখল না? কেমন প্রশাসন? কার পুলিশ এরা? জাতীয় সংসদের সদস্যদের কাছে লক্ষ্মীপুরের জেলা প্রশাসক বললেন, ২৮ বছরের চাকরি জীবনে সবচেয়ে খারাপ সময় অতিক্রম করছি। আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না। সব প্রশ্ন কেন, কোনো একটি প্রশ্নের জবাবও তিনি দিতে পারেননি। যেসব সন্ত্রাসী নূরুল ইসলামকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে ওইসব সন্ত্রাসী প্রশাসনের চেনা হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কেন এ প্রশ্নের জবাব তাদের জানা নেই? আবু তাহের তো সাধারণ কোনো ব্যক্তি নন, সাধারণ এক ঠেলাগাড়ির চালকের ছেলে হলে কি হবে, ১৯৯২ সালে তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৯৬ সালে তিনি এক টিনের ঘরের বাসিন্দা হলে কি হবে, ২০০০ সাল নাগাদ তিনি হয়েছেন প্রায় অর্ধ শতকোটি টাকার মালিক, বিশেষ করে তার পুত্র বিপ্লব ও টিপু পরিচালিত এক দুর্ধর্ষ মাফিয়া বাহিনীর নেতা। মিষ্টভাষীর কথায়, সমগ্র লক্ষ্মীপুরের রাজা আবু তাহের। প্রশাসনের কোনো ক্ষমতা রয়েছে তার বিরুদ্ধে কথা বলে? পানি সম্পদমন্ত্রীর সামনেই তো তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, পুলিশ তাকে অথবা তার কোনো লোককে গ্রেফতার করতে উদ্যত হলে তাদের তিনি ঝাটিয়ে বিদায় করবেন। ২৮ বছরের চাকরি জীবনে শুধুমাত্র জেলা প্রশাসন কেন, সমগ্র জাতি সবচেয়ে খারাপ সময় অতিক্রম করছে। শুধু অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামের বিধবা স্ত্রী ও ছোট ছেলেমেয়েরা কেন, এ লক্ষ্মীপুরেই অন্যূন ৭০/৭৫টি পরিবারের জীবনে গত চার বছরে নেমে এসেছে এমনি বীভৎস নিরাপত্তাহীনতা। এমনি নারকীয় তাণ্ডবের ঝড়ো হাওয়া। হারিয়ে গেছে সবকিছু তাদের জীবন থেকে। এমনি অবস্থায়, শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর, কেননা ১৯৯৬ সালের ২৩ জুনে ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, সমাজে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলকরণই তার অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। বারে বারে তিনি ঘোষণা করেছেন, সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক না কেন, আইনের স্বাভাবিক গতি অব্যাহত থাকবে। আর একটি কারণেও তাঁকে শেষ ভরসাস্থল রূপে চিন্তিত করা হয়ে থাকে এবং তাহলো, যদিও ভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনিও হারিয়েছেন তার জননন্দিত পিতাকে, মাতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে। এখনো এসব ঘটনা স্মরণ করে তিনি আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েন। সম্ভবত অধিক উত্তেজিত হয়ে তিনি প্রায়ই যেসব অ-কথা কুকথা উচ্চারণ করে থাকেন, তার মূলেও রয়েছে তার সেই অতীত স্মৃতি। খুব সম্ভব প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত অন্তর্জ্বলার গভীরতা অনুভব করেই মিষ্টভাষী অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামের ছোট শিশু কিশোরদের আবেদন তুলে ধরেছেন তার প্রতিবেদনে যেন তারা প্রতি বছর পিতার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে কবর স্থানে একটা স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মতৎপরতায় সন্ত্রাসী ছাড়া এদেশের খুব বেশি লোকের আস্থা নেই। আস্থা নেই তার কোনো অঙ্গীকারের ওপর। তিনিই একাধিকবার বলেছেন, রামকৃষ্ণ মিশন চালাতে তিনি আসেননি। তিনি বলেছেন, অপরাধীকে মাটি খুঁড়ে বের করতে হলেও তিনি তা করবেন। তিনি তার কথা রাখেননি। মাটি খোঁড়া দূরে থাক, মাটির ওপরে, অনেকটা তার কাছাকাছি ওই সব নোংরা প্রাণী কিলবিল করলেও তিনি চুপ চাপ থেকেছেন। কারো বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তাদের ঝাঁটিয়ে বের করবেন বলার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে পারেন। লক্ষ্মীপুর অচল করে দেবার ভয় দেখাতে পারবেন, তা সহজভাবে শুধু হজম করেই নয়, ঢাকা থেকে আগত ৫০ জন জাতীয় সংসদ সদস্যদের আগমনকে ষড়যন্ত্র রূপে আখ্যায়িত করে এবং আবু তাহেরের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার পরামর্শ দিয়ে ঢাকায় ফেরেন।

শুধু লক্ষ্মীপুর এবং ফেনীতেই সন্ত্রাসীরা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তুলেছে তাই নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানেও তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই প্রশাসন হয় চোখ বন্ধ করে রয়েছে না হয় তাদের সহযোগীরূপে আত্মসমর্পণ করেছে সন্ত্রাসের কাছে। শুধু প্রশাসন কবে, শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থানকারীদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনেরাও সন্ত্রাসের ওপর ভর করে অর্থবিত্ত প্রভাব অর্জনে প্রয়াসী হয়েছেন। উদ্যোগী হয়েছেন প্রতিপক্ষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। দেশের অন্যত্র দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা মহানগরীর দিকে তাকালেই চলবে। ডাবল মার্ডার, ট্রিপল মার্ডারসহ হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে রাজধানীতে জনজীবন। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে পথে-প্রান্তরে, হাটে-বাজারে, কোর্ট-কাচারিতে, এমনকি গৃহের অভ্যন্তরেও। আন্তর্জাতিক চোরাচালানি বা দেশের শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসী হোক সে, তথাপি

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন কবীর মিলন ওরফে মুরগি মিলনের মৃত্যু তাও শত শত মানুষের চোখের সামনে, একেবারে আদালত প্রাঙ্গণে, পুলিশের চোখের সামনে, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থা যে বেহাল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আদালত প্রাঙ্গণে কি হত্যাকণ্ড চলে? আর এবারের হত্যাকাণ্ডই কি প্রথম? এ বছরের ২৮ জুনে আদালতে হাজিরা দিতে এসে কুষ্টিয়ার আজাদ প্রতিপক্ষের গুলিতে নিহত হয়। ১৯৯৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে ছাত্রদল নেতা মোর্শেদ আদালতে হাজিরা দিতে এসে প্রতিপক্ষের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়। এসব কিসের লক্ষণ? শুধু কি হত্যাকাণ্ড, এ আদালত প্রাঙ্গণেই সেই ছোট্ট শিশু তানিয়া নরপশুদের দন্তনখরে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। আদালত অঙ্গনের নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামের বড় অপরাধ ছিল বিএনপির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা। অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডলেরও অপরাধ ছিল তিনি বিএনপি করতেন। জনৈক কর্পোরেশন কমিশনার এ অপরাধে তাকে এলাকা ছাড়া করেছিল। এলাকা ছেড়ে গিয়েও তিনি বাঁচতে পারেনি। অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামকেও বলা হয়েছিল লক্ষ্মীপুর ছেড়ে যেতে। ১৯৯৮ সালে অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলামকেও বলা হয়েছিল লক্ষ্মীপুর ছেড়ে চলে যেতে, কিন্তু যাননি। শেষ পর্যন্ত পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু এতে কি সমস্যার সমাধান হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ?

একদিনও শেষ দিন নয়। এ সরকারও শেষ সরকার নয়। অতীত ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, সন্ত্রাসী কোনো সময়ে কার্যকর হয় না। সন্ত্রাসীরা সব সময়ই শাসক দলের লায়বিলিটি, কোনো সময়ে তা এসেটে পরিণত হয় না। প্রতিপক্ষের কয়েকজনের ওপর নির্যাতন চালিয়ে অথবা তাদের হত্যা করে বিরোধী দলকে দমানো সম্ভব নয় বরং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে আরো বেশিসংখ্যক ব্যক্তি বিরোধী দলের ব্যাংকে নাম লিখায়। লক্ষ্মীপুরে গিয়ে যে মন্ত্রী লক্ষ্মীপুরের ত্রাসকে আশ্বাস দিয়ে এলেন, তিনি অন্তত জানেন ভালো করে, এ পথ সুস্থ পথ নয়। মুজিব বাহিনীর অন্যতম কর্ণদার রূপে ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বরে তিনি আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধানরূপে ঘোষণা দিয়েছিলেন। আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বিশ্বের নবতর মতবাদ মুজিববাদ বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারের জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে তাঁর নেতৃত্বেই প্রতিটি ইউনিয়নে লাঠিসহ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের নীতি গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আদর্শে জাতীয় শ্রমিক লীগ এক লাখ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে লাল বাহিনীও গঠন করে ১৯৭২ সালের মে মাসে। কিন্তু তাতে কি হয়েছিল? জনজীবনে নিরাপত্তাহীনতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে এবং অনেকের স্মৃতিতে ওই সময় (১৯৭২-৭৪) এখনো দুঃস্বপ্নের মতো ভারী হয়ে রয়েছে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে শেষ পর্যন্ত অভ্যাসবশত নিজেদের বিরুদ্ধেও তখন সেই অভিশপ্ত অস্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। খুলনার কালিদাস বড়ালের মতো সম্ভাবনাময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে ওই সময়ে।

তাই বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নেত্রী হিসেবে সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আইন তার স্বাভাবিক গতিতে চলবে, শুধু উচ্চারণ করলেই চলবে না, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমপি কামাল মজুমদারের ছেলের নেতৃত্বে দিনে দুপুরে বনানী মার্কেটে ইফতিয়ার আহমদ শিপুকে যেভাবে হত্যা করা হয়। সেই কলেজ ছাত্রীটি নিজের ঘরে থেকেও আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার বান্ধবী হবার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে যে পরিবারের সন্ত্রাসীরা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে তার দায়দায়িত্বও চূড়ান্ত পর্বে আপনার ওপরই বর্তাবে। কিংবদন্তীর প্রাক্তন স্টাইনের কথা কে না জানে। হালকাভাবে, ছোটখাটো প্রশ্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট অন্যায় কালক্রমে ডানা মেলতে মেলতে আকাশ ছেয়ে ফেলে। চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই আঁধার কাটিয়ে ওঠা তখন কারো পক্ষে সম্ভব হয় না। আগেই বলেছি, লক্ষ্মীপুরের সন্ত্রাসী আবু তাহের অথবা ফেনীর জয়নাল হাজারীর প্রয়োজন আপনার নেই। আপনার সমর্থন তাদের প্রয়োজন আছে। তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের উঠতি ডনেরও প্রয়োজন নেই আপনার। নেই কামাল মজুমদারদেরও। আত্মীয়তার সূত্র ধরে হাসনাত আবদুল্লাহার আপনার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করেছে। বান্ধবী সেজেও অনেকে অনেক সুযোগ নিয়েছে। আপনি সমগ্র জাতির, বিশেষ কারো বান্ধবী হয়ে আপনার লাভ কি?

সমগ্র বিশ্ব যখন আইনের শাসনের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের গাঁথুনি শক্ত করে চলছে, তখন আপনি কেন ওই কলঙ্কিত কালো মুখগুলোর আবরণে ঢাকা পড়বেন? আসুন না, সকলের সহযোগিতায় সন্ত্রাস নামক দৈত্যটাকে সমাজ থেকে উৎখাত করি এবং এক্ষেত্রে আপনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করুন।[২] *এমাজ উদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংস্কৃতি। প্রকাশনী, জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা-২০০১ ইং। পৃষ্ঠা-৮৮-৯১।*

বাংলাদেশে শেখ মুজিব এবং শেখ হাসিনার শাসনামলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সবচেয়ে বেশি হামলা ও নির্যাতন চালানো হয়েছে। শেখ মুজিবের শাসন আমলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মূর্তি ভাঙা শুরু হয়, পরবর্তী সময়ে যা শেখ হাসিনার শাসন আমলেও অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল না করে হিন্দুদের সঙ্গে বেঈমানি করেছিলেন। তিনিই ১৯৭৩ সালে পঁচিশ বছরের পুরনো রমনা কালী মন্দির বুলডোজার দিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার শাসনামলে টাঙ্গাইলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর মিছিলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মিকে মারাত্মকভাবে আহত করেছিল। এখন তারা হিন্দুদের জন্য মায়াকান্না কাঁদছে।

আওয়ামী উত্তরাধিকারের ধারকবাহক হয়ে শেখ হাসিনার মুখে সন্ত্রাসবিরোধী কথা শোভা পায় না। বিগত পাঁচটি বছর শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় নিজেই সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসকে পৃষ্ঠপোষকতা করায় সে সময় হাজার হাজার মানুষকে খুন হতে হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে আঠার হত্যা, তের হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এদের বহুসংখ্যাক ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক স্বনামধন্য নেতা ১০০ জন মেয়েকে ধর্ষণ করে ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করেছিল। আজ তাদের মুখে সন্ত্রাসবিরোধী কনভেনশন ডাকার কথা শুনলে তাকে প্রলাপ ছাড়া আর কি বলা যায়।

বিগত সরকারের পাঁচ বছরের দুঃশাসনের যে চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে, তার দিকে তাকালে দেখা যায়, সেই তুলনায় এখন দেশে সব কিছুই স্বাভাবিক আছে। তবে বর্তমান সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তারা চায় সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। বিগত পাঁচ বছর যারা সন্ত্রাস করেছে, বিরোধী দলের নেতাকর্মিদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, সরকার পরিবর্তনের পর তাদের অনেকেই জনগণের হামলার শিকার হয়েছে। হয়তো বা নির্যাতিতরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেছে। সরকার সেসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছে। অথচ এ ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আওয়ামী লীগ দেশে সাম্প্রদায়িতক দাঙ্গা বাধানোর পাঁয়তারা করছে।

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সারাদেশে বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে সেই শক্তিশালী নেটওয়ার্ক ভেঙ্গে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা সময়সাপেক্ষ। তবে এ ব্যাপারে সরকার আন্তরিক। আশাকরি অল্প সময়ের মধ্যে সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে এখন সংখ্যালঘুর স্বার্থের কথা বলে অযথা চিৎকার করছে। বাংলাদেশে সকল ধর্মের লোকেরা সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। আওয়ামী লীগ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

শেখ হাসিনার গত পাঁচ বছরের শাসনামলে টেলিভিশনের মধ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইলেও বাস্তবে তার অস্তিত্ব ছিল না আমরা টিবিকেন্দ্রিক উন্নয়ন নয়, বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ উন্নয়নের নামে লুটপাট করে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করেছে। দেশকে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পানি সম্পদমন্ত্রী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩০৯ কোটি টাকা ঋণ করে চলে গেছেন। এমন অনেক পুকুর চুরির ঘটনা দেশের অনেক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে হয়েছে। তার মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রায় দেউলিয়ায় পরিণত করেছে। আমরা একটি বিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতি, শূন্য কোষাগার, সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং সীমাহীন অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে ক্ষমতায় এসেছি। বিগত পাঁচ বছর ছিল বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ও লুটপাটের সময়। আগামী পাঁচ বছর হবে উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের সময়।

বিগত সরকারের সময় আমার নির্বাচনী এলাকার জনগুরুত্বপূর্ন সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল টাঙ্গাইল-আরিচা মহাসড়কের উন্নয়ন সম্প্রসারণ এবং তৎসংলগ্ন রাস্তায় ধলেশ্বরীতে ব্রিজ নির্মাণ, উপজেলা সদর থেকে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা পাকাকরণ, পল্লী বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া, যমুনা ধলেশ্বরীর ভাঙনের করালগ্রাস থেকে নাগরপুরবাসীকে রক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, মসজিদ ও মন্দিরের উন্নয়ন ইত্যাদি। উল্লিখিত জনগুরুত্বসম্পন্ন সমস্যার কথা আমি বিগত সরকারের সময় একাধিকবার পার্লামেন্টে উথাপন করেছি, কিন্তু আমি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য হওয়ায় তার একটিও বাস্তবায়ন হয়নি। সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড থেকে আমার নাগরপুরবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে শুধু আমি বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য হওয়ায় তার একটিও বাস্তবায়ন হয়নি। সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড থেকে আমার নাগরপুরবাসীকে বঞ্চিত করা হয়েছে শুধু আমি বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য হওয়ার কারণে। সুখের বিষয় বর্তমান সরকারের আমলে জনগণকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করতে পারছি।

১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় আমার এলাকায় কোনো রকম সরকারি সাহায্য দেয়া হয়নি, বরঞ্চ আমরা নিজ উদ্যোগে বানভাসী লোকদের সাহায্য করতে গেলে সেখানে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিভিন্নভাবে আমাদের নাজেহাল করেছে। ১৯৯৮ সালের আমার নির্বাচনী এলাকার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ মারাত্মকভঅবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, মসজিদ-মন্দির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবই ক্ষতচিহ্নসহ দীর্ঘদিন পড়ে থেকেছে। কিন্তু বিগত সরকার সেগুলোর মেরাতম বা পুনর্নির্মাণে কোনো উদ্যোগে নেয়নি।

১৯৯৬ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে শহীদ মিনারে আওয়ামী লীগের নির্দেশ অনুযায়ী জয় বাংলা বলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বলায় স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপস্থিতিতে আমার ওপর হামলা চালিয়ে আমাকে ও কর্মিদের মারাত্মকভাবে আহত করেছিল।

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সীমাহীন সাফল্য দেখিয়েছে কেবল খুন, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, দলীয়করণ, মামলা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। গত ১ অক্টোবরের নির্বাচনে দেশের মানুষ তার যথাযথ জবাব দিয়েছে।

এ দেশের মানুষ মূলত গণতন্ত্র প্রিয় এবং এজন্য তারা অতীতে বারবার সংগ্রাম করেছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের সবাইকে ত্যাগের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। জনগণের কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে আন্তরিক হতে হবে এবং দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। দেশের রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে সচেতন আছেন বলে সমগ্র জাতি বিশ্বাস করে। আমি মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি। এলাকার সমস্যা নিয়ে আমি ইতোমধ্যেই যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছি। আশাকরি আমি

Dhaka University Institutional Repository

আমার এলাকার জনমানুষের তথা দেশবাসীর ন্যায়সঙ্গত এবং জনগুরুত্বসম্পন্ন দাবিগুলো পূরণ করতে সক্ষম হবো।[৩] *গৌতম চক্রবর্তী। সম্প্রীতিরদেশ বাংলাদেশ। প্রকাশনী জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা-২০০৬ ইং। পৃষ্ঠা-৩৪-৩৭।*

- **বর্তমান আওয়ামী শাসনামল ও সন্ত্রাস ঃ**

দীর্ঘ দু'বছর তত্ত্বধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাসের কিছুটা লাগাম টেনে ধরতে সফল হয়েছিলেন। এবং ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রধান দুই দলীয় নেত্রীকে কারারুদ্ধ করে প্রায় দীর্ঘ বছর খানেক সময় তাদের জেলের চারদেয়ালে আটকে রেখে তাদের নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করেছেন বলেও সাধারন জনতার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং তার প্রমান স্বরুপ আমরা দেখতে পাই ২০০৮ এর নির্বাচনে মহা জোটের বিরাট জয় লাভ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিন্দুমাত্রও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেননি উপরন্তু তিনি জনগনের বিশাল আস্থার প্রতিদান দিতে যেন বদ্ধপরিকর এরকম মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের শপথ গ্রহনের শুরুর দিন থেকেই। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের বেপরোয়া ও মারমূখী আচরন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হুমকি প্রদানসহ, খুন, হত্যার চেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বিশৃংখল কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রীর যাবতীয় মহতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে ভেস্তে দিতে চলেছে। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দলের ব্যাপারে কড়া হুশিয়ারি প্রদান করলেও তার হুশিয়ারিরয় প্রতি যেন এক রকম কর্ণপাত না করেই এ সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়েই চলছে, আওয়ামীলীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ এবং কতিপয় অছাত্র, সন্ত্রাসী ও সুবিধাভোগী ছাত্রলীগ নামধারীরা। ফলশ্রুতিতে দেশ আজ পুনরায় উদ্ধারপাওয়া গনতন্ত্রের বেহালদশা দেখতে পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীসহ দলের ত্যাগী নেতাদেরকে এবং বর্তমান পরিস্থিতি যেন ক্রমশই নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে যে, প্রতিশ্রুতি জনগনকে দিয়েছিলেন তা গনতান্ত্রিক সরকারের প্রায় দেড় বছর অতিক্রমই হয়ে গেলেও সরকার তার প্রতিশ্রুতির কতটুকুই বা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে তা আজ প্রশ্নবিদ্ধ?

জাতির মেরুদন্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো আজ একেকটা যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে দেশের সকল পাবলিক বিশ্বদ্যিালয় সহ বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে একের পর এক নাটকীয় ও লোমহর্ষক কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ.এফ রহমান হলের এক গরীব মেধাবী ছাত্র আবু বক্করকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাকে হারিয়ে আজ আবু বক্করের পরিবার শোকে মূহ্যমান। তার পরিবারের এই বিরাট ক্ষতির ক্ষতিপূরণ কি কারো পক্ষে দেয়া সম্ভব? আবু বক্করের ঘটনার শোক মুছতে না মুছতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক মেধাবী ছাত্র ফারুক কে সন্ত্রাসী শিবির কর্মীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এভাবেই একে একে দেশের শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে চলছে লাশের রাজনীতি এবং রক্তের হুলি খেলা। এই গনতান্ত্রিক রাজনীতিক চর্চার জন্যই কি তরুন সমাজ সহ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মহা জোটকে জয়যুক্ত করে ছিল? এই দায়ভার কি বর্তমান সরকারের উপর পড়ে না? একথা কি বলা চলে না যে, বর্তমান সরকার ব্যর্থ হচ্ছে? সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সামলাতে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের সবচেয়ে বড় যে দায়বদ্ধতা থাকে তা হচ্ছে জনগনের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান এবং সরকার তা সঠিক ভাবে করতে না পারলে তার দায়ভার নির্বাচিত সরকারের উপরই বর্তায় এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তাদের আমরা বিগত চার দলীয় সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের লাগামহীনতায় তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

জনগন বর্জন করেছে এবং বিপরীত ক্রিয়া হিসেবে আওয়ামীলীগকে জয়যুক্ত করেছে। এবং আওয়ামীলীগও যদি চূড়ান্ত ভাবে জনগনের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয় তখনও তার বিপরীত ক্রিয়া হিসেবে আবারও বিগত শাসনে থাকা চার দলীয় জোটের ক্ষমতায় আসার রাস্তাটি একেবারে পরিস্কার করে দিবে। এভাবে ঘন ঘন ক্ষমতার পালা বদল গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক কিছু নয়। সরকারের স্থিতিশীলতা খুবই জরুরী দেশের জনগণের মঙ্গলার্থে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে। এই দুই প্রধান বিরোধী দলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও প্রতিহিংসার রাজনীতিতে জন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। জনগনের দুর্গতির কোন অন্ত নেই, সব কিছুই লাগামহীন হয়ে উঠছে। এভাবে চলতে থাকলে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যে সুদূর অতীতেই তার জৌলুষ হারাবে না সেই নিশ্চয়তা কে দিতে পারবে? গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ধারাকে বজায় রাখতে হলে অবশ্যই দল মত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদেরকে বর্জন, পাকড়াওয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সন্ত্রাসীরা যেন সন্ত্রাস করে পালিয়ে যেতে না পারে সে বিষয়ে আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। রাজনীতিক সন্ত্রাস বিগত জোট সরকারের আমলেও ব্যাপক ভাবে ঘটেছে, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু বিদ্বেষ পরায়ন হয়ে সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা ধরে রাখাতো আর গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গলদায়ক হতে পারে না। তাই আমাদেরকে দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের রাজনীতি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিদ্বেষহীন ও সম্প্রীতির সেতু বন্ধন রচনা করতে হবে। আর তাতেই দেশের গণতন্ত্র, জনগন এবং দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আসবে।

প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুলতেই চোখে পড়ে খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও হুমকির খবর। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ প্রশাসন এ সমস্ত কর্মকান্ডের ব্যাপারে থাকছে নির্বিকার। তাদের নাকের ডকাতেই সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করছে। এযেন সন্ত্রাস ও পুলিশী আতাত, বেশীর ভাগ সন্ত্রাসীই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়ে ক্ষমতাসীন দলের লেবাস গ্রহণ করে পার পেয়ে যাচ্ছে। তা কি প্রমাণ করে না যে, ক্ষমতাসীন দলই বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মদদদাতা। সন্ত্রাসীরা বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের ছত্র ছায়ায় থেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে যা কিনা পুলিশ ও প্রশাসনকে অনেক সময়ই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করছে। যে জনগণের টাকায় দেশের পুলিশ প্রশাসন ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে সেই পুলিশ প্রশাসনই প্রয়োজনের সময় জনগনের পাশেতো থাকছেই না উপরন্তু জনগনকে নানা ভোগান্তি তে ফেলছে।

• বাংলাদেশে সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চরমপন্থি সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা বৃদ্ধির খবর সংবাদপত্রে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক পত্রিকাব একটি রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায়, যে দক্ষিনাঞ্চলের নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের নেতা কর্মিদের সংগঠনের খবর জানা যায়। দক্ষিণাঞ্চলের গৌরনদী ও বাবুগঞ্জের এলাকা নিষিদ্ধ সংগঠনের নামে লিফলেট বিতরণের ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালানো হয়। কিন্তু জড়িত কোনো ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাজনৈতিক লেবাসে সর্বহারা পার্টির নেতারা তাদের দল পুনর্গঠনে সক্রিয় হয়েছে বলেও জানা যায়। র‍্যাবের ক্রস ফায়ারের ভয়ে যেসব চরমপন্থি নেতা দেশ ত্যাগ, কিংবা আত্মগোপন করেছিল প্রভাবশালী মহল বিশেষের মদদপুষ্ট হয়ে তারা আবার সংগঠিত হবার জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। সর্বহারাদের গোপন তৎপরতায় এলাকার লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। কুষ্টিয়ায় চরমপন্থিদের হাতে ইউপি চেয়াম্যানসহ ১০টি খুনের ঘটনা ঘেটে। নৃশংস এসব হত্যাকাণ্ড এলাকার জনমনে আতঙ্ক বৃদ্ধি করছে খুন ছাড়া ও ভীতি প্রদর্শন, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির ঘটনা ঘটছে সর্বত্র। এলাকাভিত্তিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব নিয়ে চরমপন্থি সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র কাজের বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে আতঙ্ক সৃষ্টি নহে দেশের সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য চরমপন্থি সন্ত্রাসীরা মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠছে। অতীতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী ও যৌথ বাহিনীর অভিযান ও ক্রসফায়ারে বেশকিছু চিহ্নিত চরমপন্থি ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীর মৃত্যুতে জনজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা অনেকটা ফিরে এসেছিল। কিন্তু ক্রসফায়ারের ঘটনা মানবাধিকারের প্রশ্নে বিভিন্ন মহলে বিরূপ সমালোচনার জন্ম দেয়। এমতাবস্থায় মানবাধিকার প্রশ্নে সন্ত্রাসী দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী নমনীয় অবস্থা নিলে এবং পাশাপাশি চরমপন্থি সন্ত্রাসীরা প্রভাবশালী মহলের মদদপুষ্ট হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাবে বলে আমাদের আশঙ্কা।

মনে রাখা দরকার সন্ত্রাস বর্তমানে একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। জটিল ও সংঘাতময় বিশ্বব্যবস্থায় কম বেশি সকল দেশই এ সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও দারিদ্য কবলিত দেশগুলিতে সকল সরকারের একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অস্থিতিশীল ও অসহিষ্ণু রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। বর্তমানে দেশে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল পরিবেশ অনেকখানি নিশ্চিত হলেও সরকারি প্রশাসন পুরাতন দুর্বলতা হতে মুক্ত হতে পারেনি। শুধু পুলিশের পক্ষে চরমপন্থি সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠা কঠিন। কারণ এমনিতে প্রয়োজনের তুলনায় পুলিশে জনবল ও অস্ত্রসরঞ্জাম কম, উপরন্তু তাদের পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ অবস্থায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চরমপন্থি সন্ত্রাসী দমনে সরকারকে যৌথবাহিনীর মাধ্যমে কঠোর ও সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী এ অপশক্তিকে দমনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সদিচ্ছা ও ঐক্য থাকা প্রয়োজন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বেশ শক্ত হাতে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থি গ্রুপগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে সময় অনেক চরমপন্থি আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সেই উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ অভিযান চালালে সন্ত্রাসীরা যাতে বিশাল সীমান্ত জুড়ে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বার বার বলছেন, সন্ত্রাসীদের কোন দল নেই। তবে একথাটি শুধু মুখে উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হলে চলবে না, নতুন উদ্যোগে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে দলমত নির্বিশেষে নির্মূল করে ইহার যৌক্তিকতা প্রমাণের এখনই উপযুক্ত সময়। তা নাহলে চরমপন্থি সংগঠনসহ বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর দেশব্যাপী যে নিজস্ব শাসন কায়েমের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে তা দেশের জন্য এক ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে বলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত। সব বাহিনীর সমন্বয়ে সাঁড়াশি অভিযানের মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে চরমপন্থি সন্ত্রাসীদের সৃষ্ট আতঙ্কাবস্থা মুক্ত করতে না পারলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক হয়ে উঠা অস্বাভাবিক নয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে চরমপন্থি নামে যেসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে তাদের আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী প্রভৃতি জেলায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির মুখে তার এ আহবানে দ্রুত সাড়া মেলে সেটা ভবিতব্য। সন্ত্রাসীরা মানুষের ঘুমই কেড়ে নেয়নি, সরকারের কর্তৃত্বকেও চ্যালেঞ্জ করছে। ব্যবসায়ী থেকে রাজনৈতিক নেতাকর্মী সবাই তাদের টার্গেট। তাদের মদদ কে বা কারা দিচ্ছে সেটি অনেক দিনের প্রশ্ন কখনো বলা হয়, এরা উগ্র বামপন্থি রাজনৈতিক শক্তি এবং মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করে। এ কারণে তাদের সর্বহারা বলেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো প্রমাণ মেলেনি। তারা শ্রেণী সংগ্রামের স্লোগান দিয়েছে। শ্রেণীশত্রু খতমের নামে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী প্রতিপক্ষকে নির্মূলের জন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরে তারা

Dhaka University Institutional Repository

ক্রসফায়ারের ভয়ে অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায়, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা তাদের সক্রিয় থাকা বা না থাকাকে প্রভাবিত করে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ঢাকার চকবাজারে নবসৃষ্ট থানার উদ্বোধন করতে গিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, চরমপন্থিদের যারা সহযোগিতা করছে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। তার এ বক্তব্য সংশ্লিষ্টদের কাছে যথার্থ বার্তা দিলেই ভালো। এক্ষেত্রে অভিযুক্তদের তালিকায় রাজনৈতিক শক্তি যেমন রয়েছে, তেমনি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তরফেও পৃষ্ঠপোষকতা থাকার কথা শোনা যায়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের সন্ধান করতে হলে বিশেষভাবে নজরদারিতে রাখতে হবে ক্ষমতাসীন দলের পিতারই। এটি সব মহলে স্বীকৃত শুধু চরমপন্থিরা নয়, যেকোনো সন্ত্রাসী শক্তিই ক্ষমতাসীনদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে থাকাটাকে নিরাপদ মনে করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরের শাসনামলে এ অপশক্তি অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠিত হয়।

নিষ্ক্রিয় ছিল বিভিন্ন গণমাধ্যমের এ তথ্য থেকেও স্পষ্ট। তাদের পেছনে রাজনৈতিক মদদ রয়েছে। এ চিত্র বিপদজনক। কারণ গণবিরোধী যেকোনো শক্তির জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরই সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে থাকার কথা। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে অপরাধ দমনের কাজ দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক মদদ থাকলে স্থানীয় জনসাধারণকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সহায়ক শক্তি হিসেবে পাওয়ার কাজও কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ সন্ত্রাস দমনে জনসমর্থন অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সরকারের নিশ্চয়ই এ উপলব্ধিও হয়েছে, ক্রসফায়ার, ধর্মীয় বা চরমপন্থি সন্ত্রাসী মোকাবেলার কার্যকর পন্থা নয়।

- **র‍্যাবের হিটলিস্টে পাঁচ শতাধিক চরমপন্থি ঃ**

দেশের চার বিভাগের ২২ জেলায় অস্ত্রধারী পাঁচ শতাধিক চরমপন্থি এখন র‍্যাবের হিটলিস্টে। তাদের ধরতে রক্তাক্ত জনপদ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল চষে বেড়াচ্ছে র‍্যাব। ২৮টি চরমপন্থি দলের ব্যানারে সক্রিয় এ অস্ত্রধারীদের হাতে গত সাত বছরে (২০০২-২০০৮) খুন হয়েছে দুই হাজার ১৬২ জন। চাঁদাবাজি টেন্ডার নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধসহ নানা কারণে ঘটছে এসব হত্যাকাণ্ড।

সরকারি এ হিসাবের বাইরে ইটভাটার অসংখ্য জীবিত মানুষকে পুড়িয়ে ছাই করেছে লাল্টু ও সিরাজ বাহিনী। চরমপন্থি সংগঠনে সঙ্গে জড়িত শতকরা ২৯ জন শ্রমিক শ্রেণীর। আর ৩৯ ভাগ প্রতিশোধের নেশা ও পারিবারিক বিরোধের জের ধরে চরমপন্থি দলে যোগ দিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। চরমপন্থি দলে যোগ দিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। চরমপন্থি তৎপরতা নিয়ে র‍্যাব গোয়েন্দাদের দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

র‍্যাবের ইন্টেলিজেন্স উইংয়ের পরিচালক লে. কর্নেল জিয়াউল আহসান সমকালকে বলেন, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সন্ত্রাসমুক্ত করতে যা করা দরকার সবই করবে র‍্যাব। চরমপন্থি সংগঠনগুলো যাতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে না পারে সেদিকে র‍্যাবের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তিনি দাবি করেন, চরমপন্থিরা এখন আর আগের মতো শক্তিশালী নয়। র‍্যাবের অব্যাহত অভিযানের মুখে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের কার্যক্রম এরপরও বিভিন্ন চরমপন্থি সংগঠনের ব্যানারে সক্রিয় পাঁচ শতাধিক সদস্যের গতিবিধির ওপর নজরদারি করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

র‍্যাবের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে-২০০৩ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষে চরমপন্থি সংগঠনের ১৫৮ জন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর।

পাঁচ শতাধিক চরমপন্থির সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ২৪৮ নেতাকর্মি নিহত হয়েছে। এছাড়া ১০৮ জন আত্মসমর্পন ও ৩৬৩ জন গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতারের পর বিচার প্রক্রিয়ায় মৃত্যুদণ্ড হয়েছে ২৭ জনের। এ সময়ের মধ্যে চরমপন্থিদের কাছে ধর্ষিত হয়েছে এক হাজার ৫৭৮ নারী। অপহৃত হয়েছে ৫২৭ জন। একই সময়ে চরমপন্থিরা ৫৬৩টি ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছে। চরমপন্থিদের এ অপরাধ কর্মকাণ্ডের মুখে রক্তাক্ত জনপদ হিসেবে পরিচিতি পায় দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল।

চরমপন্থি সংগঠনের যোগ দেয়ার পেছনের কারণ অনুসন্ধানে র‍্যাব জানতে পেরেছে প্রতিশোধের নেশা ও পারিবারিক বিরোধের জের ধরে শতকরা ৩৯ ভাগ সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শতকরা ২৭ ভাগ বেকারত্বের কারণে হতাশ হয়ে শতকরা ২৫ ভাগ এবং আগে থেকেই অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত শতকরা ৯ ভাগই চরমপন্থি সংগঠনে যোগ দিয়ে অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ সদস্যদের মধ্যে কৃষক (সাধারণ) শতকরা ২৬ ভাগ শ্রমিক (দিনমজুর) ভ্যান রিকশাচালক শতকরা ২৯ ভাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মি শতকরা ২৩ ভাগ, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী শতকরা ১৭ ভাগ, এবং শতকরা পাঁচ ভাগ বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী রয়েছে।

জানা গেছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ষাটের দশকের শেষের দিকে সৃষ্ট গোপন সশস্ত্র তৎপরতার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল কুষ্টিয়া। এছাড়া খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহ জেলায়ও স্বাধীনতার চার পাচ বছর আগেই কিছু সশস্ত্র গোপন বামপন্থি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। স্বাধীনতার পরপরই জাসদের গোপন সশস্ত্র সংগঠন গণবাহিনীর জন্ম হয়। এরা বিভিন্ন থানার অস্ত্র লুট করে এবং যুদ্ধ পরবর্তী জমা না দেয়া অস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যমে গড়ে তোলে অস্ত্রভাণ্ডার। অল্পদিনের মধ্যে তারা এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী সশস্ত্র সংগঠনে পরিণত হয়ে উঠে। ১৯৬৭-৬৮ সালে সিরাজ শিকদার পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। বরিশালে পেয়ারা বাগানে ১৯৭১ সালের ৩ জুন সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টিও পরবর্তী সময়ে অস্ত্রের রাজনীতি প্রসারে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে যে সশস্ত্র সংগঠন প্রভাব বিস্তার করছে তারা ওই দলগুলোরই উত্তরসুরি। এরাই বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত। দল থেকে বহিস্কৃতও প্রতিষ্ঠা করেছে অসংখ্য ব্যক্তিগত চরমপন্থি সংগঠন।

খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, নড়াইল, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর, পিরোজপুর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জের একাংশ ও ফরিদপুর জেলায় সক্রিয় আছে ২৮টি চরমপন্থি সংগঠন। এগুলো হচ্ছে পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল-জনযুদ্ধ), পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএললাল পতাকা) পুর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএলরশিদ) পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল মোফাখখার চৌধুরী) পূর্ববাংলার মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদ গণবাহিনী শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলন, গণমুক্তি ফৌজ বাংলাদেশ কমিউনিস্ট ঐক্য প্রক্রিয়া বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (একদিল গ্রুপ), নিউ বিপ্লবী পার্টি (মৃণাল গ্রুপ), বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (কামরুল গ্রুপ), নিউ লাল পতাকা, সর্বহারা পার্টি (জিয়া গ্রুপ), সর্বহারা পার্টি (কামরুল গ্রুপ), সর্বহারা পর্টি (মাদারীপুর), পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি কমিউনিস্ট যুদ্ধ নিউ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি (মেহেদী গুপ), ছিন্নমূল কমিউনিস্ট পার্টি, মিশন যুদ্ধ পড়েত বাহিনী, লাল চান বাহিনী, মুক্তিবাহিনী হারা বাহিনী, লাল্টু বাহিনী ও সিরাজ বাহিনী।[৪] *দৈনিক সমকাল নভেম্বর ২০০৯ সাল।*

Dhaka University Institutional Repository

❖ মার্কিন দূতাবাসে হামলার জন্য অর্থ এসেছে পাকিস্তান থেকে

গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া হরকাতুল জিহাদের সদস্য মুফতি হারুন ইজহার জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে হামলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১০ থেকে ১২ দিন আগে পাকিস্তান থেকে তার অ্যাকাউন্টে অর্থ পাঠানো হয়। ওই অর্থের জোগান দেয় লস্কর-ই-তৈয়বার এক নেতা। তবে কত টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এসেছে তা নিশ্চিত হতে পারেনি গোয়েন্দারা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হারুন আরো জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ (হুজি) জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) ও হিযবুত তাহরীর বাংলাদেশ রাজধানী ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নাশকতার টার্গেট রয়েছে তাদের। এসব সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈয়বার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।

মুফতি হারুন ইজহারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন জানিয়ে গতকাল শুক্রবার তাদের আদালতে হাজির করলে মুখ্য মহানগর হাকিম দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। বুধবার গ্রেফতার হওয়া মুফতি হারুন ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মুফতি ইজহারুল ইসলামের ছেলে। ইজহারুল চট্টগ্রামের লালখান বাজার মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। ওই মাদ্রাসায় এক সময় হরকাতুল জিহাদের সদস্য সংগ্রহের কাজ চলতো এবং জঙ্গিদের শারিরীক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো বলে জেনেছে গোয়েন্দারা।

ডিবির এক কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মুফতি হারুনের তথ্য সঠিক মনে হয়েছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো রাজধানীর আশপাশে তৎপরতা জোরদার করেছে। জেএমবির বর্তমান প্রধান সাইদুর রহমানের স্ত্রী ও শ্যালিকাকে সম্প্রতি রাজধানী থেকেই গ্রেফতার করা হয়। হিযবুত তাহরীরের সদস্যরা সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এর আগে রাজধানী থেকে গ্রেফতার করা হয় লস্কর-ই-তৈয়বার একাধিক সদস্যকে। বাংলাদেশে দুর্বল হয়ে পড়া জঙ্গি সংগঠনগুলো শক্তিশালী করতে লস্কর-ই-তৈয়বার বেশকিছু সদস্য কাজ করছে। তারাই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা টার্গেট করে নাশকতার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ডিবির একটি সূত্র জানায় বেশকয়েক দিন আগে তারা মার্কিন দূতাবাসে হামলা প্রস্তুতি চলার খবর পান। এরপর থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গোয়েন্দা নজরদারি শুরু হয়। এক পর্যায়ে গ্রেফতার করা হয় মুফতি হারুনকে। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপকমিশনার (ডিসি) মোঃ মনিরুল ইসলাম বলেন, মুফতি হারুন দীর্ঘদিন ধরে হরকাতুল জিহাদের জঙ্গি কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত। তাকে গ্রেফতারের পর পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বিদেশি জঙ্গি শহিদুল ইসলাম ও আল আমিনকে চট্টগ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়। দুজনের একজন ভারতীর ও একজন পাকিস্তানের নাগরিক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বিদেশি ওই দুই জঙ্গিকে গত বুধবার চট্টগ্রামের লালখান বাজার মাদ্রাসা থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল। বৃহস্পতিবার রাতে কঠোর নিরাপত্তায় তাদের ঢাকায় এনে গতকাল আদালতে হাজির করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

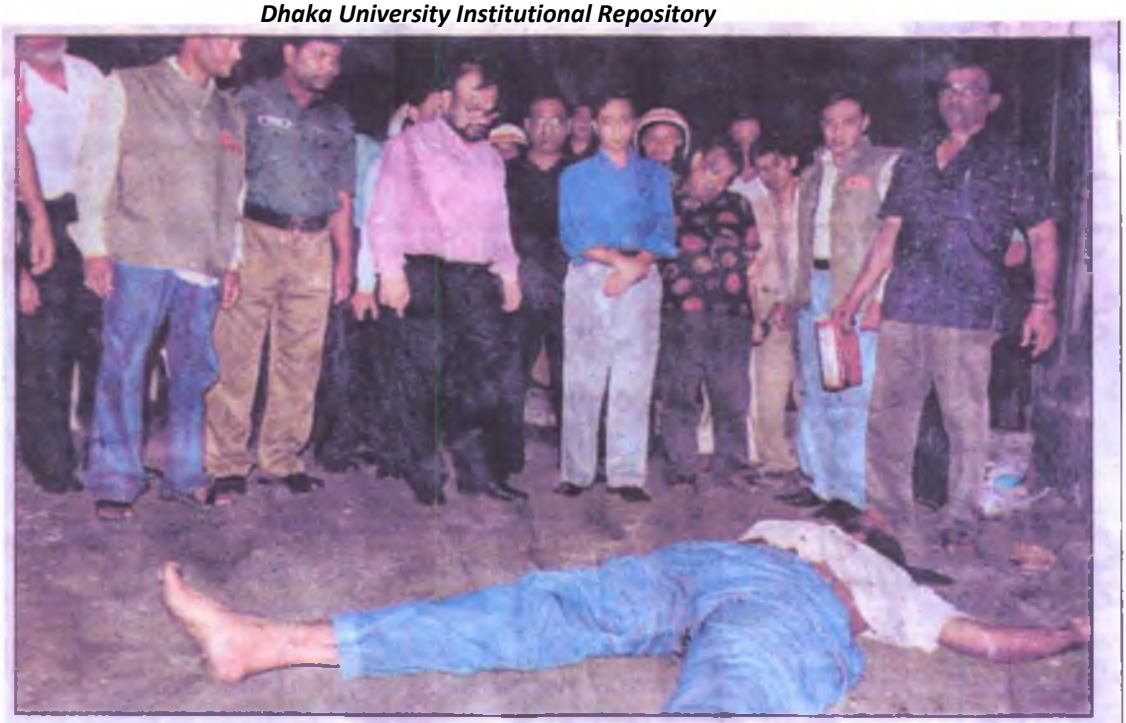

নগর ভবনের ছয়তলার কার্নিশ থেকে উদ্ধার করা লাশ (সমকাল

নগর ভবনে গলাকাটা লাশ

■ সমকাল প্রতিবেদক নভেম্বর ২০০৯

❖ নগর ভবনে গলাকাটা লাশ

নগর ভবনের ছয়তলা থেকে গতকাল রোববার রাতে নুর মোহাম্মদ (৩৫) নামে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বাবা সৈয়দ নুরুল হক বীর প্রতীক। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শাহবাগ থানার উপ পরিদর্শক হিরেন বাবু জানান, নগর ভবনের ছয়তলার কার্নিশে একটি লাশ পড়ে আছে- খবর পেয়ে পুলিশ রাত ৯টার দিকে লাশ উদ্ধার করে। লাশের পরনে ছিল ছাই রঙের জিন্স প্যান্ট এবং গায়ে চেক শার্ট। তার প্যান্টের পকেটে পাওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন করে পুলিশ তার পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। নুর মোহাম্মদ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এমএলএসএস পদে চাকরি করতেন। তার গ্রামের বাড়ি ফেনি জেলার দাগনভূইয়া থানার নয়নপুর গ্রামে। ঢাকায় তিনি মেসে থাকতেন। তবে কোন এলাকায় এবং কাদের সঙ্গে থাকতেন এ বিষয়ে পুলিশ গতকাল রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেনি। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা কেউ তাকে অন্যত্র হত্যা করে নগর ভবনের ছয়তলার ছাদে লাশ পেলে গেছে। গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে ঢাকা সিটি মেয়র সাদেক হোসেন খোকা লাশ দেখতে নগর ভবনে যান। এ সময় পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

উপপরিদর্শক হিরেন বাবু জানান, এ ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নগর ভবনের ক্যান্টিনের ৮ কর্মচারীকে আটক করা হয়েছে। লাশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে। হিরেন বাবু আরো জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের ক্যান্টিনের এক কর্মচারী জানায়, নুর মোহাম্মদ নগর ভবনের ক্যান্টিনে খাওয়া দাওয়া করে বিল পরিশোধ করেননি। এ কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে কি-না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। শাহবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) রেজাউল করিম সমকালকে জানান কি কারণে তারা নুর মোহাম্মদকে নগর ভবনে নিয়ে গিয়েছিল এবং

Dhaka University Institutional Repository

কেনই বা তাকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্তের আগে এ বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না।

❖ ছয় স্থানে ২ গৃহবধূ খুন, ৫ লাশ উদ্ধার

চন্দনাইশ, ভাঙ্গা, রামগতি, মঠবাড়িয়া, গাইবান্ধা ও নারায়ণগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ গৃহবধূ খুন এবং ৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

চন্দনাইশ থানা পুলিশ বুধবার বিকেলে পশ্চিম এলাহাবাদ গ্রামের একটি ধানক্ষেত থেকে চেমন আরা বেগম নামের এক মহিলার লাশ উদ্ধার করছে। তিনি কাঞ্চননগরের আবদুর রহমানের স্ত্রী বলে জানা গেছে। পুলিশ তার পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মাজারভক্ত চেমন আরাকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মোকাররম নামের আরেক মাজারভক্ত লোক বাড়ি থেকে মাজারে যাওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তেমন আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। চন্দনাইশ থানার ওসি জানিয়েছেন, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ মোকাররম নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিবিরকান্দা গ্রামে গৃহবধূ জিয়াসমিন আক্তারকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। নিহতের পিতা জব্দি গ্রামের এক্কেন্দার মাতবর জানান, জিয়াসমিনের স্বামী সিদ্দিক সৌদি আরবে থাকেন। ৭ মাস আগে বিয়ের পরপরই স্বামী বিদেশে চলে গেলে শ্বশুর ও ননদরা মিলে যৌতুকের জন্য তাকে নির্যাতন করতে থাকে। ঘটনার রাতে শ্বশুর, ননদ হাসিনা, রহিমা, সহিতন, মহিতন ও হাসিনার ছেলে এমারত একযোগে জিয়াসমিনকে মেরে ঘরের ভেতর গলায় ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখে।

বুধবার সদর থানা পুলিশ পার্বতীনগর ইউনিয়নের আলাদানগর মসজিদের কাছে রহিমা আক্তার নামের এক কিশোরীর লাশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানিয়েছে ৩ দিন আগে ওই কিশোরী নিজ বাড়ি থেকে অপহৃত হয়। অন্যদিকে পুলিশ লক্ষ্মীপুর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে।

মঠবাড়িয়া থানা পুলিশ বুধবার সকালে উপজেলার ছোট মাছুয়া গ্রামের হারুন ফরাজীর ছেলে যুবক আরিফের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মায়ের সঙ্গে অভিমান করে ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সাদুল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত কুয়ার ভেতর মঙ্গলবার এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে জন্মের পর তাকে হত্যা করে রাতের আঁধারে তার লাশ কুয়ায় ফেলে রাখা হয়। এ ব্যাপারে সাদুল্যাপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

সিদ্ধিরগঞ্জে বন্ধ হয়ে যাওয়া মনোয়ারা জুট মিলের ভেতর থেকে মঙ্গলবার রাতে অজ্ঞাত পরিচয় এক কিশোরের জবাই করা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কারা কি উদ্দেশ্যে ওই কিশোরকে হত্যা করেছে তা জানাতে পারেনি পুলিশ।

Dhaka University Institutional Repository

❖ রাজধানীতে পৃথক ঘটনায় চারজন খুন

রাজধানীতে পৃথক চারটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববর পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজার মোড়ে সন্ত্রাসীরা অ্যালুমিনিয়াম দোকানের কর্মচারি আবদুর রাজ্জাক (৭০) কে ছুরিকাঘাতে কদমতলী এলাকায় ভাঙারি ব্যবসায়ী আব্দুস সালামকে (২৬) এবং আগের রাতে কল্যাণপুরে এক যুবককে (২৫) পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এছাড়া গতকাল সকালে পুলিশ মতিঝিল টয়েনবি সার্কুলার রোডের ভাড়া বাসা থেকে ফুটপাতে খাবারের দোকানি সাদ্দাম হোসেনের (২২) পা বাঁধা লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজার মোড়ে কয়েকজন সন্ত্রাসী রাজ্জাকের (৭০) পথরোধ করে দাঁড়ায়। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাঁর গলায় ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুরান ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

পারিবারিক সূত্র জানায়, রাজ্জাক সপরিবারের সূত্রাপুরের দীননাথ সেন রোডে থাকতেন। গতকাল সকাল ছয়টার দিকে তিনি বাসা থেকে তাঁর কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সন্ত্রাসীদের কবলে পড়েন।

সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হানিফ বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে ছিনতাইকারীদের হাতে রাজ্জাক মারা গেছেন। সম্ভাব্য অন্যান্য কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গতকাল রোববার ভোরে কদমতলী থানার ঢাকা ম্যাচ এলাকার নতুন কলোনি বস্তিতে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন ভাঙারি ব্যবসায়ী আবদুস সালাম। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি সন্ধ্যায় মারা যান।

পারিবারিক সূত্র জানায়, ভাঙারি ব্যবসীয় সালাম নতুন কলোনিতে থাকতেন। ব্যবসা নিয়া বিরোধের জের ধরে আমির মামুন ও সুমন তাঁকে ছুরিকাঘাত করে।

কদমতলী থানার দ্বিতীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত আলী বলেন, তাস খেলার প্রতিযোগিতায় জিতে সালাম ৩০ হাজার টাকা পান। এ টাকা ছিনিয়ে নিতেই তাঁকে হত্যা করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সুমন নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অন্যদিকে শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহেদ নূরের নেতৃত্বে একদল পুলিশ মিরপুর রোডে হারুন আই ফাউন্ডেশনের সামনে থেকে গুরুত্বর আহত অবস্থায় অজ্ঞাতনামা এক যুবককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই যুবককে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্র জানায়, যুবকের হাত পায়ে অসংখ্য প্রহারের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর হবে।

গতকাল সকাল সাতটার দিকে পুলিশ মতিঝিল থানার টুয়েনকি সার্কুলার রোডের ভাড়া বাসা থেকে ফুটপাতের খাবার দোকানি সাদ্দাম হোসেনের (২২), হাত, পা ও

Dhaka University Institutional Repository

গলায় গামছা বাঁধা লাশ উদ্ধার করে। পুলিশের সন্দেহ, সাদ্দামকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

মতিঝিল থানা সূত্র জানায়, গতকাল সকাল স্থানীয় বাসিন্দাদের ফোন পেয়ে তারা ১০ টুয়েনবি সার্কুলার রোডের ভাড়া বাসা থেকে সাদ্দামের লাশ উদ্ধার করে। নিহত সাদ্দামের দুই হাত, পা ও গলা গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল। পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

সাদ্দামের মামা ফরিদ সরকার প্রথম আলোকে বলেন, কয়েক দিন আগে সাদ্দামের বাবা জুলহাস খান তাঁর মা ও ভাই বোনকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়ায় যান। সাদ্দাম তাঁর দুই কর্মচারি দেলোয়ার ও জসিম উদ্দিনকে নিয়ে ফুটপাথে খাবারের দোকান চালাতেন। প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতেও তিনি তাদের নিয়ে ঘুমাতে যান। গতকাল সকালে সাদ্দামদের দোকানের নারী কর্মচারী বাসায় গিয়ে দরজা খোলা পান। তিনি ভেতরে ঢুকে দেখেন খাটের ওপর সাদ্দামের লাশ পড়ে আছে। তিনি এ ঘটনা মতিঝিল থানায় জানালে পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করে।

মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফাজ্জল হোসেন বলেন, গত শুক্রবার সাদ্দামের সঙ্গে কর্মচারি জসিমের কথা কাটাকাটি হলে জসিমকে মারধর করা হয়। মনে হচ্ছে এর জের ধরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ওই ঘটনার পর থেকে কর্মচারি জসিম ও দেলোয়ার পলাতক রয়েছেন। তাঁদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা হয়েছে।

গতকাল দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে সাদ্দামের লাশ তাঁর স্বজনেরা নিয়ে যায়।

গতকাল বিকেলে পুরান ঢাকার নবাবপুর রোডে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত এক যুবক আহত হয়েছেন। সঙ্কটজনক অবস্থায় পুলিশি প্রহরায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল

❖ পরিচালককে লাঞ্ছিত ও তার কক্ষ ভাঙচুর করেছে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা

জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে পরিচালক অধ্যাপক একেএম মহিবুল্লাহর দফতরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গতকাল মঙ্গলবার হামলা ও লুটপাট চালিয়েছে। এ সময় তাকে লাঞ্ছিত করে তার রুমের ফাইলপত্র তছনছ করা হয় এবং টেবিলের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলা হয়। এ পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাকে টেনে হিঁচড়ে ভুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। চলে যাওয়ার সময় একটি দামি মোবাইল সেট ও দাফতরিক নথিপত্র ছিনিয়ে নেয় তারা। হামালার কথা প্রকাশ করা হলে পিস্তল দেখিয়ে তাকে প্রাণ নাশের হুমকিও দেয় তারা। গতকালের হামলার ঘটনায় শেরে বাংলা নগর থানায় চারজনকে আসামি করে একটি মামলা করেছেন হাসপাতালে পরিচালক। আসামিরা হচ্ছে- মনির, টিটু ফজলু ও মুন্না।

জানা গেছে পরিচালকের ওপর হামলাকারী সন্ত্রাসীরা মোহাম্মদপুর এলাকার আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী। পরিচালককে লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদে গতকাল হাসপাতালের ডাক্তার,

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। এ ঘটনায় হাসপাতালের পরিচালক বাদী হয়ে গতকাল শেরেবাংলা নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টা ২০ মিনিটে ১০-১৫ সন্ত্রাসী জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালকের কক্ষে অতর্কিতে ঢুকে তাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাকে তুলে নেয়ার চেষ্টা চালায়। পরিচালকের শার্টের কলার ধরে টানাহেঁচড়া করে এবং তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায় তারা।

সূত্র জানায়, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালের কেনাকাটা দীর্ঘদিন ধরে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। হাসপাতালের টেন্ডারসহ যাবতীয় কাজের নিয়ন্ত্রণ করছিল ওই সিন্ডিকেট। এছাড়া হাসপাতালের সামনে একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দিয়ে রমরমা ব্যবসা করে আসছিল। ২০০৭ সালে অধ্যাপক মহিবুল্লাহ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ওই সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেন। গত তিন চার মাস হলো হঠাৎ করে ওই সিন্ডিকেটের সদস্যরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক মহিবুল্লাহ সমকালকে বলেন, হাসপাতালের আউটডোর থেকে রোগী ভাগিয়ে নেয়া অবৈধ অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসা এবং হাসপাতাল চত্বরে ফেন্সিডিল বিক্রির সঙ্গে জড়িত একটি সংঘবদ্ধ চক্র এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এদের সঙ্গে হাসপাতালের কিছু কর্মকর্তা কর্মচারীর যোগসাজশ থাকতে পারে। এ বিষয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ রিয়াজ বলেন, ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।[৫] *দৈনিক সমকাল ৪ই নভেম্বর ২০০৯ ইং।*

❖ চার ছিনতাইকারী ও অস্ত্রসহ দুই সন্ত্রাসী গ্রেফতার

রাজধানীর লালমাটিয়া থেকে সোমবার গভীর রাতে ৪ ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। এ সময় র‍্যাবের গুলিতে আহত হয় দুজন। এদিকে রামপুরা থেকে অস্ত্র ও গুলিসহ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

র‍্যাব-২ মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, র‍্যাবের সাদা পোশাকধারী একটি টহল দল রাত দেড়টার দিকে লালমাটিয়ার ই-ব্লকের ৩/১১ নম্বর বাসার সামনে পৌঁছলে ৬ ছিনতাইকারী তাদের গতিরোধ করে। এরপর তারা চাপাতি ও পিস্তল নিয়ে হামলা করতে উদ্যত হলে র‍্যাব গুলি চালায়। এতে ছিনতাইকারী চক্রের সদস্য মাসুদ রানা (২৪) ও সাইদুল ইসলাম (২৬) পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এছাড়া পালানোর সময় দেলোয়ার হোসেন বাবু (২৩) ও রাসেলকে (২০) গ্রেফতার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে গুলিসহ ১টি বিদেশি রিভলবার ও ৩টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়।

এদিকে বাড্ডা থানা পুলিশ সোমবার রাত সোয়া ২টায় রামপুরার বাগিচার টেক এলাকা থেকে কাশেম (৩০) ও শিলা (৩) নামে দুজনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২ রাউন্ড গুলিসহ একটি রিভলবার ও ২টি চাপাতি উদ্ধার করা হয়। আগে অস্ত্রসহ গ্রেফতার হওয়া নাদিমুল ইসলাম নাদিমের দেয়া তথ্যানুযায়ী তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে তিন সিএনজিচালক হত্যায় জড়িত ছয় খুনি

নভেম্বর ২০০৯ ◂ সমকাল

ভয়ঙ্কর একদল খুনি

❖ **ভয়ঙ্কর একদল খুনি**

হেলপারি করে জীবন চলে না। তাই নিজের জীবন সচ্ছল করতে অন্যের জীবন থামিয়ে দিয়ে সিএনজি বেবিট্যাক্সি ছিনতাই করে ওরা। গত চার মাসে এভাবে যাত্রী সেজে ভাড়ায় নিয়ে ওরা হতভাগ্য তিন সিএনজি ট্যাক্সি চালককে খুন করেছে। ছিনিয়ে নিয়েছে দুটি সিএনজি বেবিট্যাক্সি। ১০ সদস্যের এ চক্র মিশন শুরু করে দুটিতে সফল হয়। তৃতীয় মিশন শুরুর আগেই কিলিং মিশনের প্রধান সাইফুলসহ ৬জন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। গত দিন দিন চট্টগ্রাম মহনগরীর বিভিন্ন স্থানে টানা অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে হাটহাজারী সার্কেল এ.এস.পি বাবুল আক্তারের নেতৃত্বাধীন টিম। চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার জেড এ মোরশেদ বলেন, সংঘবদ্ধ হয়ে কিলিং মিশন শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে এ চক্রের ৬ খুনি। ধরা পড়ে যাওয়ার অন্যদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। এদের ধরতেও পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ধৃত খুনিরা হচ্ছে জামাল হোসেন, হারুন, আজম, নাজিম এবং ওহিদুল আলম। তাদের সবার বয়স ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সবার বাড়ি হাটবাজারী ও ফটিকছড়িতে।
এদের হাতে নিহত তিন হতভাগ্য সিএনজি বেবিট্যাক্সি চালক হচ্ছেন- জাকির আহমদ (৪৫), রফিক (৪২) ও এমরান মানুষটি খুন হয়ে যাওয়ায় তিনটি পরিবারের জীবন যেন থেমে গেছে। নিহত বেবিট্যক্সিচালকদের স্ত্রীরা অবোধ সন্তানদের নিয়ে কাটাচ্ছেন মানবেতর জীবন। কেউ বাঁচছেন অন্যের দয়ায়।

অভিযানে নেতৃত্বদানকারী হাটহাজারী সার্কেলের এএসপি বাবুল আক্তার বলেন, ছিনতাই হওয়া সিএনজি বেবিট্যাক্সির কাগজপত্র রাতারাতি বদলে ফেলা হয়। এ চক্রের সঙ্গে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অর্থরিটির (বিআরটিএ) লোকজনও জড়িত রয়েছে বলে তাদের সন্দেহ। তা নাহলে চোরাই সিএনজি বেবিট্যাক্সির মালিকের নাম রাতারাতি পরিবর্তন করে অন্যের নামে কাগজ তৈরি করা এবং আজকে যে গাড়ি ছিনতাই হলো কালই সেটি প্রাইভেট গাড়ি হিসেবে অন্যের নামে রাস্তায় বের করা সম্ভব নয়। এর আগে নগরীতে দড়ি পার্টি ও টানা পার্টি (গলায় দড়ি পেঁচিয়ে ও শ্বাসরোধ করে) সিএনজি বেবিট্যাক্সি যাত্রীদের হত্যা করে সর্বস্ব ছিনিয়ে নিলেও

Dhaka University Institutional Repository

এবার সিএনজি বেবিট্যাক্সিচালকরাই হচ্ছেন খুনের শিকার। মহানগরীর বাইরে খুনিরা এবার বেছে নিয়েছে জেলা শহরকে।

খুনি চক্রের প্রধান ধৃত সাইফুল ও হারুন বলেছে, তাদের সবাই এক সময় চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রুটে বাস টেম্পোর হেলপার হিসেবে চাকরি করতো। কিন্তু চাকরি করে দৈনিক যে ১০০/১৫০ টাকা পাওয়া যায় তাতে জীবন চলে না। তাছাড়া ঘন ঘন চাকরিও চলে যায়। তাই সিএনজি বেবিট্যাক্সি ছিনতাইয়ের পর তা বিক্রি করে তারা রাতারাতি নিজেদের জীবন সচ্ছল করার উদ্যোগ নেয়। অর্থাৎ এটা করতে গিয়ে তারা বেবিট্যাক্সিচালকদের খুন করার ভয়ঙ্কর নৃশংস পথ বেছে নেয়। এ কাজের শুরু হিসেবে তারা পেয়ে যায় বেলাল নামে একজনকে। ছিনতাই করার জন্য অগ্রিম ১০ হাজার টাকা দিয়ে বেলালই এ মিশন শুরু করতে খুনিচক্রকে নামিয়ে দেয়া রাস্তায়। তাছাড়া ছিনতাই করে ছিনিয়ে আনা বেবিট্যাক্সি সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা দামে কেনার প্রতিশ্রুতিও দেয় সে। তার ভরসায় ক্ষ্যাপার মতো তারা নেমে পড়ে কিলিং মিশনে।

পুলিশ জানায় এ চক্রটি প্রথম খুনের ঘটনাটি ঘটায় গত ২২ জুন। হারুন, সাইফুল, মহিউদ্দিন ও আজম এ চারজন হাটহাজারীর বড়দিঘির পাড় থেকে ফটিকছড়ির নয়াবাজার যাওয়ার কথা বলে ৩০০ টাকায় একটি বেবিট্যাক্সি (নম্বর চট্টমেট্রো-থ-১১-৯৮০১) ভাড়া করে। চালক এমরান সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে তার সঙ্গে রফিক নামের আরও এক ড্রাইভারকে নেয়। ট্যাক্সিটি ফটিকছড়ির কারবালার টিলা নামক স্থানে পৌছলে তাকে ট্যাক্সি থামাতে বাধ্য করে তারা। এক পর্যায়ে চালক এমরান ও তার সঙ্গী অপর সিএনজি বেবিট্যাক্সিচালক রফিককে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে রাস্তার পাশে নির্জন ঝোপঝাড়ে ফেলে রেখে তারা ট্যাক্সি নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ তাদের লাশ উদ্ধার করে। ওই সিএনজি ট্যাক্সিটি বেলালকে দিয়ে তারা ৭০ হাজার টাকা পায়। যা কিলিং মিশনের ৪ সদস্য ভাগবাটোয়ারা করে নেয়।

449618

প্রথমটি সফল হওয়ায় ১৪ অক্টোবর ঘটায় তৃতীয় খুনের ঘটনা। চালক জাকির আহমদ তার বেবিট্যাক্সি (নম্বর চট্টগ্রাম থ-১২-৩০১) নিয়ে ওইদিন রাস্তায় বের হলেও আর ফিরে আসেননি। পরদিন সকাল ১০টায় ফটিকছড়ির মাদ্রাসাঘাটায় একটি সেতুর নিচে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার নেতৃত্ব দেয় সাইফুল হারুন জামাল ও নাজিম। তারা ডাক্তার দেখানোর জন্য বিবিরহাট থেকে কাজিরহাট যাওয়ার কথা বলে জাকির আহমদ চালিত ট্যাক্সিটি ভাড়া নেয়। যোগিনীরহাট ব্রিজ পার হয়ে নিরিবিলি এলাকায় গেলে তারা জাকিরে হাত থেকে চাবি নিয়ে নেয়। তাকে হত্যা করে লাশ ফেলে সিএনজি ট্যাক্সি নিয়ে তারা ফিরে আসে। গুরু বেলালের কথামতো তা জিকু নামে নগরীর চান্দগাঁও এলাকার এক বাসিন্দাকে ছিনতাই করা এ গাড়ি বুঝিয়ে দেয়। তারা জিকুর কাছ থেকে প্রথম ৪০০ টাকা নিয়ে ফিরে আসে কিন্তু পরে চুক্তির এক লাখের বাকি টাকা আনতে একাধিক দফায় গিয়ে তাকে আর পায়নি। উল্টো জিকুর লোকজন তাদের কাছে থাকা টাকা পয়সা কেড়ে নেয়।

নিহত সিএনজি বেবিট্যাক্সিচালক জাকির আহমদের ছোটভাই শহীদুল আলম জানান, জাকির খুন হওয়ায় তার স্ত্রী অবোধ দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে এখন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। উপার্জনক্ষম কেউ না থাকায় তাদের বেঁচে থাকাই এখন কষ্টকর হয়ে পড়েছে। আপাতত তারাই এখন পরিবারটির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করলেও আর কতদিন তা সম্ভব হবে, সেটাই বড় প্রশ্ন। কারণ তারাও দরিদ্র। জাকিরের বাড়ি ফটিকছড়ির ভুজপুরে।[৬] *দৈনিক সমকাল নভেম্বর ২০০৯ সাল।*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

• সংবাদপত্র/জানুয়ারী ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক এর রিপোর্ট

- ১০ জানুয়ারি ০৯ ইত্তেফাক, ১৬তম সংখ্যা, ঢা: বি: জিয়া হলে দু-গ্রুপের মধ্যে রাত ভর সংঘর্ষ, আহত-৬, গ্রেফতার-৭।
- ১৪ জানুয়ারি ২০০৯, দুই জেলায় গৃহ পরিবারসহ ৬ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু।
- ১৭ জানুয়ারি ২০০৯, ১৩ তম সংখ্যা, জাবিতে ছাত্রলীগের দু-গ্রুপের সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র, গুলিবিদ্ধ-৭ ।
- ২৭ জানুয়ারি ২০০৯ ইত্তেফাক, ৩৩ তম সংখ্যা, গাজীপুরে চাল ব্যবসায়ী খুন। কাওরান বাজারে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিনজন নিহত।
- ২৮ জানুয়ারি ২০০৯ ইত্তেফাক, ৩৪ তম সংখ্যা, বিভিন্ন স্থানে হামলা ও সংঘর্ষ ভাংচুর ও লুটপাট, আহত-২০।

• মার্চ ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক

- ১২ মার্চ ২০০৯ ইত্তেফাক, ৭৬ তম সংখ্যা, রাজশাহী মেডিক্যাল ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষ আহত ২০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ আহত-২৫।
- ১৪ মার্চ ২০০৯ ইত্তেফাক, ৭৮ তম সংখ্যা, ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষ একজন নিহত।
- ২৫ মার্চ ২০০৯ ইত্তেফাক, ৮৯ তম সংখ্যা, ভোলায় গুলি, তীর, ধনুক, গানপাউডার, স্প্লিন্টার, বোম বাস্টার, জিহাদি বই বিস্ফোরক ৪ জন গ্রেফতার।
- ২৭ মার্চ ২০০৯ ইত্তেফাক, ৯১ তম সংখ্যা,সন্ত্রাসীদের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক যুবলীগ নেতা কর্মীসহ নিহত ৩ জন।
- ৩০ মার্চ ২০০৯ ইত্তেফাক, ৯৪ তম সংখ্যা,বানিয়া পাড়া আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ আহত ১০। অস্ত্রসহ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেফতার।

• ২০০৯ এপ্রিল দৈনিক ইত্তেফাক

১লা এপ্রিল ২০০৯ সাল, ৯৬ তম সংখ্যা, দুই গ্রুপে সংঘর্ষে ছাত্রলীগ নেতা নিহত। ঢাকা মেডিকেলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা। নিজেদের মধ্যে আধিপত্যের আত্মঘাতী লড়াইয়ে আহত অর্ধশতাধিক। শামসুন্নাহার হলে দুই গ্রুপে সংঘর্ষ ৫ ছাত্রী আহত।

২ এপ্রিল ২০০৯ ইত্তেফাক, ৯৭ তম সংখ্যা,যশোর এমএম কলেজে সংঘর্ষ।

৪ এপ্রিল ২০০৯ ইত্তেফাক, ৯৯ তম সংখ্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ। আহত ২৫।

৫ এপ্রিল ২০০৯ ইত্তেফাক, ১০০ তম সংখ্যা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ আহত ১২।

Dhaka University Institutional Repository

৭ এপ্রিল ২০০৯ ইত্তেফাক, ১০২ তম সংখ্যা, রাজউক ভবনে শ্রমিক লীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ আহত-২৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থেকে অস্ত্রসহ ছিনতাইকারী গ্রেফতার।

৯ এপ্রিল২০০৯, ১০৪ তম সংখ্যা,শীর্ষ সন্ত্রাসীরা ফিরছে উত্তপ্ত আন্ডারওর্য়াল্ড।

১১ এপ্রিল২০০৯, ১০৬ তম সংখ্যা, চকরিয়ায় ভূমিহীনদের জমি উদ্ধারে র‍্যাব সন্ত্রাসী বন্দুকযুদ্ধ ২শ রাউন্ড গুলি বিনিময় ৫ অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২।

১২ এপ্রিল২০০৯, ১০৭ তম সংখ্যা, লেদার টেকনোলজি কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা দাবি আদায়ে ছাত্রদের বিক্ষোভ। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ আহত ২৫ জন।

১৩ এপ্রিল২০০৯, ১০৮ তম সংখ্যা, অর্থ যোগদান দাতাসহ ৮ জেএমবি গ্রেফতার টাইম বোমা ও জেহাদী ক্যাসেট উদ্ধার। রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ছিনতাই বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। সামাল দিতে পারছে না পুলিশ।

দৈনিক ইত্তেফাক জুলাই মাস -২০০৯

*জুলাই ০৯ দৈনিক উত্তেফাক । জেএমবির মুক্তাঙ্গন গঠনের চেষ্টা। চার সদস্য গ্রেফতার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। * ৪ জুলাই ২০০৯ ইত্তেফাক, সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে টুঙ্গি-গাজীপুর দুই সহস্রাধিক গার্মেন্টর্স। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা। * ৮ জুলাই ২০০৯ ইত্তেফাক, মিরপুরে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের ড্রেসিং ম্যানকে গুলি করে হত্যা। * ৯ জুলাই ইত্তেফাক, হবিগঞ্জ জেএমবির টেলিফোন এবং সেতু দখল পরে মুক্ত। শিশুকে জিম্মি করে ভবন উঁড়িয়ে দেয়ার হুমকি। শ্বাসরুদ্ধকর ৩ ঘণ্টা পর জিম্মি মুক্ত। এক জেএমবি গ্রেফতার। * ২ জুলাই ২০০৯ ইত্তেফাক, টাঙ্গাইলের সন্তোষ বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনিদির্ষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ছাত্র এলাকাবাসীর অংশকে ভাংচুর আহত অর্ধশতাধিক। * ১৪ জুলাই ২০০৯ ইত্তেফাক, মিরপুরের মার্কেটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ছাত্রলীগ নেতা নিহত/ গুলিবিদ্ধ ৭জন, গাড়ি ভাংচুর ও সড়ক অবরোধ। * ১৫ জুলাই ০৯ ইত্তেফাক, ছাত্রলীগ নেতাসহ ১৭ জন গ্রেফতার। ধারাল অস্ত্র উদ্ধার। তেজগাঁও পলিটেকনিকের তিন ছাত্রাবাস তল্লাশি। * ১৬ জুলাই ২০০৯, জেএমবির কিলার গ্রুপের চার সদস্য গ্রেফতার। ৩৮টি গ্রেনেড খোল উদ্ধার। *১৮ জুলাই ২০০৯ কিশোরগঞ্জ পুলিশ জনতার হাতে অস্ত্রসহ ৭জন আটক। * ২২ জুলাই ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক, সদর হাসপাতালে ঢুকে মহিলা ডাক্তারকে হত্যা। ঘাতক গ্রেফতার। * ২৮ জুলাই ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক, গাজীপুরে শক্তিশালী বোমা উদ্ধার ৫টি বোম ও চাপাতি উদ্ধার।

- **দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯ অক্টোবর মাস।**

২ অক্টোবর ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭৪ তম সংখ্যা, সন্ত্রাসীদের গুলিতে দৈনিক রুপালির সাংবাদিক
নিহত।
৩ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ২৭৫ তম সংখ্যা, চুয়াডাঙ্গায় ও খুলনায় দুই চরমপন্থি নিহত। রাজধানীতে গুলি করে যুবক হত্যা।

Dhaka University Institutional Repository

৪ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ২৭৬ তম সংখ্যা, রাজধানীতে ছুরিকাঘাত আইপি এইচ কমান্ডোর খুন। আজিমপুরে জুয়েলারি কর্মচারি খুন। * ৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, রাজধানীতে র‍্যাব ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ নিহত ২জন। * ৬ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, রাজধানীতে পুলিশ ও র‍্যাবের সঙ্গে গুলিবিনিময় নিহত জন। * ৭ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, সারাদেশে র‍্যাব ও পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত ৩। * ৮ অক্টোবর দৈনিক উত্তেফাক ২০০৯, র‍্যাব ও পুলিশের গুলিতে চরমপন্থি নিহত। কুষ্টিয়া, খুলনা ও বাগেরহাটে ৩জন নিহত। * ১১ অক্টোবর পিরোজপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আইনজীবী নিহত। সন্ত্রাসীদের দুই গ্রুপের গোলাগুলি বান্দরবানে নিহত ৩।
২২ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ২৯৪ তম সংখ্যা, ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের ওপর হামলা ১২ জন আহত।

- **নভেম্বর-২০০৯, দৈনিক ইত্তেফাক**

১ নভেম্বর ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০৪ তম সংখ্যা, টঙ্গী রণক্ষেত্র গার্মেন্টেস শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ নিহত ২। আহত শতাধিক। ৫ ঘণ্টা ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ। অর্ধশত গাড়ি ভাংচুর অগ্নিকাণ্ড, গুলি, কাঁদানে গ্যাস।
৪ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩০৭ তম সংখ্যা,একে ৪৭, বাইফেলসহ কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ নেত্রী গ্রেফতার।
৬ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩০৯ তম সংখ্যা, গুলিস্তানে বোমা হামলায় পরিবহন নেতাসহ আহত ৪।
৯ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩১২ তম সংখ্যা, ছিনতাইকারী ও সন্ত্রাসীদের হাতে রাজধানীতে ৫ খুন।
১৪ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩১৭ তম সংখ্যা, তেজগাঁওয়ে বিএনপি নেতা ও ঠিকাদার মাসুম সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত।
১৬ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩১৯ তম সংখ্যা, ঢাবির ভিসিকে সপরিবারে হত্যার হুমকি হিযবুততাহারীর। * ২৬ নভেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, নারায়ণগঞ্জে বিএনপি সম্মেলনে তুলকালাম কাণ্ড। দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ২০.

- **ডিসেম্বর ২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাক**

- ৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩৩৪ তম সংখ্যা, মিরপুর ও পল্লবীতে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করছে ২০ সন্ত্রাসী।
- ৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০৯, ৩৩৯ তম সংখ্যা, রাজধানীর মানিকদিতে যুবক খুন। ছিনতাই ঘটনায় ৩জন গুলিবিদ্ধ।
- ২০ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক ২০০২ই, ৩৫০ তম সংখ্যা, রাজধানীতে বাসায় ঢুকে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা।
- ২১ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাক, ৩৫১ তম সংখ্যা, বগুড়ায় আজিজুল হক কলেজ বন্ধ ঘোষণা। জেএমবির ৫ জঙ্গি গ্রেফতার। বোমা তৈরির সরঞ্জামসহ জেহাদি বই উদ্ধার।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক জানুয়ারী- ২০১০ইং

- ৭ই জানুয়ারী, ১৪ তম সংখ্যা, পুলিশের উপস্থিতিতেই দরপত্র ছিনতাই, রাজধানীর পরিবাগে।
- ৮ই জানুয়ারী, ১৫ তম সংখ্যা, ছাত্রলীগের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাত্র মৈত্রী নেতা নিহত। রাজশাহী পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট বন্ধ ঘোষনা, হল ত্যাগের নির্দেশ।
- ১৬ ই জানুয়ারী, ২৩ তম সংখ্যা, ছাত্রলীগ শিবির সংঘর্ষ। খুলনায় ৫০, মেহেরপুর ১৫ ও দিনাজপুরে ১৫ জন আহত।
- ১৯শে জানুয়ারী, ২৬ তম সংখ্যা, ঢাবি রণক্ষেত্র, ছাত্র দলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে সভাপতি, প্রক্টর ওসি সহ আহত অর্ধশতাধিক। দুই দিনের ছাত্র ধর্মঘট আহবান। * চট্টগ্রামে অস্ত্রসহ ১১ জামায়াত শিবির কর্মি গ্রেফতার।

দৈনিক ইত্তেফাক ফেব্রুয়ারী ২০১০ইং

- ৩ই ফেব্রুয়ারী, ৪১ তম সংখ্যা, রাজধানীতে জঙ্গিরা তৎপর। গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার। নাটোরে আওয়ামীলীগ নেতাকে অপহরনকালে ৭ জঙ্গি আটক।
- ৪ই ফেব্রুয়ারী, ৪২ তম সংখ্যা, , গ্রুপিংয়ের রাজনীতি কেড়ে নিল মেধাবী ছাত্রের প্রাণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার এ.এফ. রহমান হলের আবু বক্কর সিদ্দিক নিহত।
- ১০ই ফেব্রুয়ারী, ৪৮ তম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের তান্ডব। ছাত্রলীগ কর্মীকে খুন করে ম্যানহলে, চার জনের রগ কর্তন, আহত শতাধিক, তদন্ত কমিটি গঠন। * বাবু বাজারে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ব্যবসায়ী আফিল উদ্দিন নিহত, চালের আড়ত সহ সকল দোকান পাট বন্ধ।
- ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ৫১ তম সংখ্যা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে পুলিশের সঙ্গে জামায়াত শিবিরের সংঘর্ষ, ৭০ জন আহত।
- ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ৫৪ তম সংখ্যা, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে কলেজ ছাত্র নিহত। গুলিবিদ্ধ ৩ জন সহ আটক ৪।
- ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ৬২ তম সংখ্যা, খাগড়াছড়িতে কারফিউ, একজন নিহত, আহত ৪০ জন, ৮০ বাড়ি-ঘরে অগ্নিসংযোগ, সেনা মোতায়েন।

দৈনিক ইত্তেফাক মার্চ- ২০১০ইং

- ৫ই মার্চ, ৭০ তম সংখ্যা,১০ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা রাজধানীর পুরান ঢাকায়।
- ১৩ই মার্চ,৭৮ তম সংখ্যা, ইডেন কলেজে ছাত্র লীগের দুই গ্রুপে হাতাহাতি।
- ১৫ই মার্চ,৮০ তম সংখ্যা, হরকাতুল জিহাদের তিন সদস্য গ্রেফতার, সিপিবির জনসভায় বোমা হামলা।
- ১৬ই মার্চ, ৮১ তম সংখ্যা, ৪২ শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকা প্রকাশ গোয়েন্দা রিপোর্ট।
- ২৯শে মার্চ, গুলশানে জোড়া খুন। প্রেমিক রুবেল সহ ৩জন ঝালকাঠিতে গ্রেফতার।

দৈনিক ইত্তেফাক এপ্রিল- ২০১০ইং

Dhaka University Institutional Repository

- ৪ই এপ্রিল, ১০০ তম সংখ্যা, শুরা সদস্য সহ জেএমবির ৭ নেতা গ্রেফতার।
- ১১ই এপ্রিল, ১০৭ তম সংখ্যা, হিরাগত শ্রমিক সংঘর্ষ। কাচপুরে নিহত ১, সড়ক অবরোধ ও হামলা।
- ১৭ই এপ্রিল, ১১২ তম সংখ্যা, গ্রাম বাসির হামলায় আরো এক চবি ছাত্রলীগ নেতা নিহত। তিন দিন ক্লাশ বন্ধ ও পরীক্ষা বন্ধ।
- ২২ই এপ্রিল, ১১৭ তম সংখ্যা, জাবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত-২৫।
- ২৪ই এপ্রিল, ১১৯ তম সংখ্যা, এস.আই. গৌতম হত্যা কান্ডে জড়িত একজন গ্রেফতার। কিলাররা ডাকাত শহিদ গ্রুপের সদস্য। রাজধানীর ধোলাইখাল এলাকায় সন্দেহ জনক তিন সন্ত্রাসীর শরীর তল্লাসী করতে গিয়েই মারা যান বংশাল থানার সেকেন্ড অফিসার এস.আই. গৌতম রায়।

তথ্যনির্দেশিকা

১। *মোঃ জাহিদুল ইসলাম জিনু, সন্ত্রাস দমনে খালেদা জিয়া। কেকা প্রকাশনী, ঢাকা - ২০০০৩ ইং, পৃষ্ঠা-২৪৭।*

২। *এমাজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশে রাজনীতি ও সংস্কৃতি। জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা -২০০১ ইং, পৃষ্ঠা-৮৮-৯১।*

৩। *গৌতম চক্রবর্তী, সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। প্রকাশন জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা -২০০৬ ইং,*

পৃষ্ঠা-৩৪-৩৭।

৪। *দৈনিক সমকাল নভেম্বর ২০০৯ ইং।*

৫। *দৈনিক সমকাল নভেম্বর ২০০৯ ইং।*

৬। *দৈনিক সমকাল নভেম্বর ২০০৯ ইং।*

৭। *দৈনিক ইত্তেফাক, ২০০৯-২০১০ ইং।*

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

• বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনৈতিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ১৯৭৪-২০১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। রাজনৈতিক দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তা আরো গৌরবের। ঐতিহ্যময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ই জাতির বিবেকরূপে বিবেচিত। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকগণ ঝাপিয়ে পড়েছেন জাতির যেকোনো ক্রান্তিলগ্নে, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। ১৯৪৮, ৫২, ৬৯-এর ভাষা ও জাতিসত্তা সমুন্নত রাখার জীবন-মরণ সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সবচেয়ে বড় ও গৌরবময় অবদান রচনা করেছে স্বাধীনতা যুদ্ধে। কত শত ছাত্রশিক্ষক যে জীবন দান করেছেন মহান এ যুদ্ধে তার হিসাব নেই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকগণ সমাজ সচেতন সংগ্রামী মেধাবী পুরুষ। তাই ১৯৭৫ সালে এখানে যেমন বাকশাল কায়েমের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ক্লেষ উচ্চারিত হয়েছে তেমনি ১৯৯০ সালেও এ প্রতিষ্ঠান হয়েছিল স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি।

আজ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মচারীসহ দেশের আপামর জনগণ উপলব্ধি করেছেন। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে চলছে চরম অত্যাচার, স্বৈরচারী তৎপরতা। পুলিশের বুটের আওয়াজ, প্রিজন ভ্যানের শব্দে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত। তার আর্তনাদ-"সচেতন ছাত্রসমাজ-শিক্ষকগণ আমাকে স্বৈরাচারমুক্ত করো" সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ো, আমার পবিত্র অঙ্গন আজ অসভ্য, স্বৈরাচারের পদচারণে ভারাক্রান্ত; আমাকে আর কলঙ্কিত হতে দিও না।"

গত ১৩/১০/৯৯ বুধবার ও ১৪/১০/৯৯ বৃহস্পতিবার তারিখে সংঘটিত ঘটনার বিচারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাঁদে নীরবে নিভৃতে। অধিকাংশ পত্র পত্রিকার হেডিং ছিল এ রকম (ক) ১৪/১০/৯৯ তারিখের সংবাদপত্র; পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক অনিয়ম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ধর্মঘট: সংঘর্ষ, লাঠিচার্য: গ্রেফতার, আহত অসংখ্য; ঢাবি ক্যাম্পাসে পুলিশের নারকীয় তাণ্ডব বেধড়ক লাঠিচার্য; টিয়ার সেল; ছাত্রী-শিক্ষক লাঞ্ছিত; (খ) ১৫/১০/৯৯ তারিখের সংবাপত্র; ঢাবি ক্যাম্পাসে গুলি, বোমাবাজি, ছাত্রদল কর্মিদের বিতাড়ন, ধর্মঘটে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ কার্যত ব্যর্থ; ছাত্র ধর্মঘট; শিক্ষকের হাতে ছাত্রী লাঞ্ছিত; ভাঙচুর, ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রদলের মিছিলে ছাত্রলীগের হামলা; গুলি বোমা; আহত ১৩, গ্রেফতার ১০, ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ব্যাপক গুলি বোমা; ছাত্রীরা লাঞ্ছিত, পুলিশের সামনেই কাটা রাইফেল, পিস্তল নিয়ে হামলা; পরীক্ষা হয়নি... ইত্যাদি অনেক হেড লাইন। কর্মসূচি ছিল দুদিন, যেমন গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর যথাক্রমে ছাত্রঐক্য ও ছাত্রদল সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহ্বান করেছিল। আর এ নিয়ে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন তাদের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মদদে এসব লংকাকাণ্ড ঘটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে পরিণত করে নজিরবিহীন এক প্রহসনে।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অগনতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবেই দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছিল। সেখানে সরকারি সন্ত্রাসে গ্রাস করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। পুলিশ ও প্রশাসনের সামনেই উক্ত ছাত্র-সংগঠনের সন্ত্রাসীরা অবৈধ অস্ত্র উঁচিয়ে ধর্মঘটী ছাত্রদের মিছিলে হামলা চালায়। ছাত্রীদের করে লাঞ্ছিত। বর্বর ও মাস্তান দল এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব অপকর্ম করেই ক্ষান্ত হয়নি- তারা জোর করে পরীক্ষা গ্রহণে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যত হয়। পুলিশ দিয়ে কলাভবন ঘেরাও করে রাখা, পরীক্ষা কেন্দ্রের দরজায় পুলিশ রাখা, শাবল দিয়ে গেটের তালা ভাঙা, নয়টার পরীক্ষা ১০টা-১১টা শুরু করা, পরীক্ষার্থীদের ধরে টানাটানি করা। চারতলার পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রশ্নপত্র নিচতলায় এনে ছাত্রদের দেখানো, আইসক্রিম খাইয়ে পরীক্ষা দিতে প্রলুব্ধ করার মতো ঘটনাও ঘটেছিল-সবই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে যে যখন এসেছে তখনই পরীক্ষা দিতে দেয়া হয়েছে, পরীক্ষার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর কতো সহ্য করবে এ অনাচার, অবিচার আর প্রহসন? কবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন মুক্ত হবে আওয়ামী ক্যাডার-শিক্ষকদের কবল থেকে?

দেশের বুকে আজ চেপে বসেছে এক ভ্রষ্ট, স্বৈরাচারী, বিদেশপ্রেমী সরকার। তারা ক্ষমতায় এসেছে এ দেশের লোকের ওপর প্রতিশোধ নিতে। এ দেশের অর্থসম্পদ, কল-কারখানা, মান-সম্মান, নৈতিক চরিত্র সব ধুলায় লুটিয়ে দিতে। আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষী জাতিতে পরিণত করতে এদের জুড়ি নেই। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী অনেক বছর প্রতিবেশি দেশে কাটিয়েছেন। জ্বালাও-পোড়াও করে, বাংলাদেশের মসনদ লাভ করেছেন। তাই তো প্রতিদানে তাদের কাছে আমাদের দেশের সব কিছু বিকিয়ে দিচ্ছেন। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো, পরীক্ষা পদ্ধতিগুলোতে ভেঙে চুরমার করে দেয়ার ফন্দি-ফিকির করছে। আর এ জন্যই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আজ পড়াশোনার পরিবেশ প্রায় তিরোহিত। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই শুরু হয় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হল দখল ও বিরোধী দলের ছাত্রদের বিতাড়নের পালা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি এ বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। তবে তার বড় পরিচয় তিনি আওয়ামী লীগ এর উপদেষ্টা ছিলেন। দলের স্বার্থের রাজনীতিতে নিবেদিত প্রাণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে কেয়ার না করলেও তার চলে। কারণ উক্ত গ্রুপের শিক্ষকগণ সাধারণত ভদ্র স্বভাবের। তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে যেকোনো ধরনের দলবাজি, অন্যায় কর্ম তিনি বিনা বাধায় করে যাচ্ছেন। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি প্রোভিসি তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হয়। একাধিক ৩য় শ্রেণী বা কমপার্টমেন্টালে তার জীবন ভরা। সরকারী সংগঠনের ছাত্রদের সমানে তিনি খুব বেশি বিরোধী দল বিরোধী ভাব দেখিয়ে থাকেন। বর্তমানের প্রক্টর ও আওয়ামী ক্যাডার শিক্ষকদের সম্পর্কে বলতে গেলে মন ও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এ সরকারে আমলে এদের অধিকাংশেরই দামি গাড়ি ও স্বচ্ছল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিএনপি সরকারের আমলের ভিসিগণ প্রায় শ দেড়েক শূন্যপদ রেখে গিয়েছিলেন, যেগুলো আওয়ামী লীগের ভিসি, প্রোভিসি সাহেবগণ মজা উৎসাহে প্রায় ক্ষেত্রেই বিভাগীয় মতামতের তোয়াক্কা না করে পরীক্ষিত আওয়ামী ক্যাডার দিয়ে পূরণ করে নিচ্ছেন এবং তাদেরকে আওয়ামী শিক্ষক ক্যাডার হিসেবেই ব্যবহার করে যাচ্ছেন। এরাই ছাত্র ধর্মঘটের সময় পরীক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে ক্যাডারসুলভ আচরণের পরিচয় দিয়েছিল।

গত কয়েক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসী ও অপহরণকারীদের স্বর্গরাজ্যে। প্রতিদিন প্রতি রাতে এখানে ও এর আশপাশে ছিনতাই হচ্ছে। ছিনতাইকারীরা ছিনতাই শেষে দৌড়ে চলে যাচ্ছে হলের ভিতর। সরকারি ছাত্রসংগঠনের নেতা-ক্যাডাররা তাদের আশ্রয় দিচ্ছে এবং তারাই সব ছিনতাইকৃত টাকা-পয়সা, ভাগ-বাটোয়ারা করছে। দিনদিন অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। অপহরণের ঘটনা প্রচুর। ব্যবসায়ী, স্কুল ছাত্র টার্গেট করে অপহরণ করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে বা অভিবাবকের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায়ের ঘটনা ঘটে চলেছে। সরকারি ছাত্র সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত এ রকম অপহরণের ঘটনা প্রায় অর্ধ শতাধিক। আওয়ামী নেতা, পাতি-নেতাদের মতো এখন সরকারি সংগঠনের ছাত্রনেতা, পাতি-নেতারা সবাই এসব অপকর্ম করে, চাঁদাবাজি-ছিনতাই অপহরণ করে বিপুল সম্পদ-বৈভবের মালিক। এদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেককে ধরলে টপ টেরর এরশাদ শিকদারের মতো কাহিনী বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু কে তাদের ধরবে বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনা থেকে। এরা অপবিত্র করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে।

সারাদেশে পুলিশ হয়রানি, নির্যাতন, ধর্ষণ ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ন্যায় নৃশংসতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পুলিশের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। তারা কোনো নিয়ম-নীতি মানছে না। দুর্ধর্ষ পাণ্ডা ও দলীয় পুলিশ কর্মকর্তা থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসের আন্দোলন দমাতে। ছাত্রছাত্রীদের মিছিল বের করতে দেয়া হয় না। পূর্ব থেকেই এমন সন্ত্রাসের, গ্রেফতারের আলামত দেখানো হয়, ছাত্রছাত্রী যেন সকলেই ভয় পেয়ে যেতে বাধ্য। কারামুক্ত ছাত্রনেতা মামুনকে ক্যাম্পাসে অর্ভ্যথনা দেয়ার অনুষ্ঠানটি এভাবেই বন্দি করে খালি গায়ে থানায় রৌদ্রে বসিয়ে রাখে। ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো কিছুই মুছে যায় না। সব কিছুরই জবাব একদিন দিতে হবে এসবের হোতাদের।
আজ ক্যাম্পাস হলো সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আস্তানা। সেসব ঘটনা প্রতিদিনই প্রায় পত্রিকাতে সাংবাদিকগণ লিখছেন। আজ ক্যাম্পাসের প্রতিটি শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী তাদের জীবনের, পরিবারের চরম নিরাপত্তাহীনতার ভুগছেন। কয়দিন আগে আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর এরশাদুল বারীর বাংলোতে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংগঠিত হয়। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ৭৮ বছরের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। কিন্তু সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

আসলে যারা জগন্নাথ হলের দিকে থেকে এসে ডাকাতি করেছে একটু ইচ্ছে করলেই, একটু তৎপর হলেই পুলিশ তাদের বের করতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুমকি-ধমকি শুধুমাত্র বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মিদের প্রতি। অথচ তার নিজের দলের সন্ত্রাসী-ডাকাত-চেলারা চালিয়ে যাচ্ছেন সদর্পে সর্বত্র নিজেদের রাম-রাজত্বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ আজ যারপরনাই প্রশাসনের ওপর ক্ষুব্ধ; তাদের কর্মকাণ্ডে হতাশ। প্রশাসনের উচিত বিবেকবান মানুষরূপে পরিচয় দেয়া, ক্যাম্পাসে পুলিশি তৎপরতা কমানোর ব্যবস্থা নেয়া, আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পুলিশ দিয়ে নিগৃহীত না করা। অন্যথায় এসব কিছুই সময়মতো তাদের জন্য বুমেরাং হবে। অন্তঃইতিহাস তাই বলে।

ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো একটি লাশ এবং জয়াকে সেদিন কেউ সান্ত্বনা দিতে পারেনি। সদ্য পরিণীতা জয়া তাই নিহত স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন অপলক দৃষ্টিতে। গত ১৩ মার্চ আরিফ হোসেন তাজ ঘাতকের বুলেটের আঘাতে নিজ কক্ষের ভেতরই নির্মমভাবে প্রাণ দিলেন। মৃত্যুর সময় এতো কাছে থেকেও তার কাছে যেতে পারেনি জয়া। যে জয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আরিফকে ভীষণ অসম্ভবের মাঝেও সে পাশে থাকবে।[১] *প্রফেসর ড. মোঃ খলিলুর রহমান। সমকালীন রাজনীতি ও আজকের বাংলাদেশ। এশিয়া পাবলিকেশন, ঢাকা -২০০২ ইং। পৃষ্ঠা-৪৭-৫০।*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী সংগঠনের মধ্যে যেমন আছে দ্বন্দ্ব তেমনি একই সংগঠনের মধ্যে আছে দুটি প্রতিপক্ষের ভীষণ শত্রুতা। এরকম একই সংগঠনের শত্রুদের হাতে নিহত হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র আরিফ হোসেন তাজ। আরিফ ছাত্রদলের একজন সক্রিয় কর্মি ছিলেন। দীর্ঘদিন থেকে এ সংগঠনের মধ্যে বিরাজ করছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এর আগে কমপক্ষে ৪বার এরকম সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু সংগঠনের শীর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায় থেকে কোনো ভূমিকা না গ্রহণ করায় এক সময়ের সতীর্থদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হলো।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণার আগে ছাত্রদলের মধ্যে নতুন করে মেরুকরণ শুরু হয়। সংগঠনের এক সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতিকে বেশকিছু নেতাকর্মিসহ ছাত্রদলে ফিরিয়ে আনা হয়। বহিস্কৃত নেতাকর্মিদের সংগঠনে ফিরিয়ে আনা ছাত্রদলের মধ্যে অনেকেই ভালো চোখে দেখেনি। ফলে সেই সময় থেকে গোপনে একটি গ্রুপ নতুন কমিটির সাধারণ সম্পাদককে অসহযোগিতা করতে থাকে। এরপর গত ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদলে নতুন আহবায়ক কমিটি গঠিত হলে ওই গ্রুপের নেতাকর্মিরা প্রকাশ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে চলে যায় এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। এ অবস্থায় ছাত্রদলের মধ্যে দুটি ভাগ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। আর এ বিভক্ত দুটি গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সংগঠনের ক্যাডার পর্যায়ের দুজন নেতা। এর মধ্যে একটি গ্রুপ বঙ্গবন্ধু হল নিয়ন্ত্রণে রাখে, অন্য একটি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণের থাকে জিয়া, কবি জসীমউদ্দীন ও মাস্টারদা সূর্যসেন হল। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু হলে অবস্থানকারী ছাত্রদলের একটি শক্তিশালী ক্যাডার গ্রুপ অতর্কিতে সূর্যসেন হল দখল করে। এ সময় দুই গ্রুপের মধ্যে কমপক্ষে ১শ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তখন কোনো লাশ পড়েনি ক্যাম্পাসে। লাশ না পড়লেও লাশের আশঙ্কা করেছিলেন অনেকেই যা অবশেষে সত্যি প্রমাণ হলো গত ১১ মার্চে।

১১ মার্চে যা ঘটেছিলো

তখনো ভোর হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পাড়ার ৪টি হলের ছাত্ররা গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ করে ২৫-৩০ জনের ছাত্রদলের একটি সশস্ত্র গ্রুপ জসীমউদ্দীন হলের পুকুরের পাশ দিয়ে অতর্কিতে বঙ্গবন্ধু হলে দলীয় প্রতিপক্ষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরকম ঘটনার জন্য ওই হলের ছাত্রদলের অন্য গ্রুপটি প্রস্তুত ছিলা না। গুলির শব্দে তারা বিপদ টের পেয়ে গা ঢাকা দেয়। প্রতিবাদী কাউকে না দেখে জসীমউদ্দীন হলেও গ্রুপটি বীরদর্পে হলের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে বঙ্গবন্ধু হলের নিয়ন্ত্রণ মুহূর্তেই তারা গ্রহণ করে। এ সময় একদল চলে যায় সোজা হলের ৩০৫ নম্বর কক্ষে। যেখানে ছিলো এক সময়ে তাদের বন্ধু বর্তমানে প্রতিপক্ষ গ্রুপের সদস্য আরিফ। কক্ষে প্রবেশ করেই আরিফের হাতে থাকা রাইফেলটি দাবি করে। আরিফ তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করলে ঘাতকরা আরিফের বুকে গুলি চালাতে সময় নেয়নি একটুও। খুব কাছে থেকে আরিফকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা মোট ৪টি গুলি করে। এরমধ্যে একটি আরিফের ঘাড়ে, একটি পাজরে এবং দুটি তার পায়ে বিদ্ধ হয়। নিজ কক্ষের মধ্যে গুলিতে আহত আরিফ লুটিয়ে পড়ে। রক্তে ভেসে যায় তার কক্ষ। যন্ত্রণায় আরিফ তাকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করলেও ঘাতকদের ভয়ে কেউ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। নিজ কক্ষের মধ্যেই আরিফের মৃত্যু হয়। ভোরে হলের কর্মচারী তার মৃতদেহ হলের গেটে নিয়ে রেখে দেন এবং পরে হাসপাতালে পাঠান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র আরিফ হোসেন তাজ। বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তার পিতার নাম শুকুর আলী। বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার সুরাদিয়া গ্রামে। আরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা সেটা জানা যায়নি। তবে আরিফ ছিলো কিছুটা সাংস্কৃতিক জোট জাসাসের বঙ্গবন্ধু হল কমিটির একজন নেতা। বাংলা বিভাগের একজন ছাত্রী জয়ার সঙ্গে তার ছিল গভীর সম্পর্ক। কিছুদিন আগে জয়াকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু ঘটনাটি সে কাউকে জানায়নি। তবু জানে তার একজন বন্ধু আর তার ডায়েরি। ডায়েরিতে সে

Dhaka University Institutional Repository

এ ঘটনার কথা লিখে রেখেছে। হাসপাতালে জয়া তাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। আরিফের কেন এমন হলো, বার বার নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করছিলেন সে।

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে আরিফ নিহত হয়েছে। এ হত্যার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটি সেই দিনই বহিষ্কার করেছে। বহিস্কৃতরা হচ্ছেন বুষ্টার, মানিক, বিপু মামান, মুকিত ও আলম। অন্যদিকে আরিফ হত্যার জন্য আরিফের বন্ধু রফিকুল আজম খান বাদী হয়ে ২২ জনকে আসামি করে মামলা করেছে। এর মধ্যে সাবেক ছাত্রদলের নেতা বর্তমানে বিএনপির সদস্য কামরুজ্জামন রতন, ছাত্রদলের সদস্য ক্রাপ সোহেল, জুয়েল, মুকুল ছাড়াও বহিস্কৃতরাও রয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরিফ হত্যার কারণ অনুসন্ধানে ১২ মার্চ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ৫ সদস্যের এ তদন্ত কমিটিকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এ তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন। সদস্য সচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. একে এম নুরুন্নবী। এছাড়া অন্য সদস্যরা হচ্ছেন বাংলা অনুষদের ডীন, প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী ও প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান।

স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাশ পড়েছে ৫৯টি। তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে ২১১টি। কিন্তু কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি।
ক্যাম্পাসে আরো লাশ পড়তে পারে। এরকম বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। ছাত্রলেলের প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি গ্রুপই প্রস্তুত রয়েছে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায়। ক্যাম্পাসে আমান-রতনের বিরুদ্ধে মিছিল হয়েছে। ঘটনা ক্রমান্বয়ে ছাত্রদলের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নইলে ক্যাম্পাসে লাশ আরো পড়তে পারে বলে ছাত্ররা আশঙ্কা করছেন। আশঙ্কা করছেন আরো অনেক জয়ার চোখে জল ঝরার, আরো অনেক মায়ের সন্তান হারা আর্তনাদের। আর এসব কান্না, আর্তনাদ নতুন করে যাতে শুনতে না হয় সে জন্য এখনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে একমাত্র বিএনপিকেই।

- **মিছিলে গুলি ঃ**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। দুই দিনের ব্যবধানে গত ১৫ মার্চ ১৯৯৭ শনিবার সংগঠনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে আহত হয়েছে ৪ ছাত্র। ওইদিন দুপুরের দিকে বঙ্গবন্ধু হল থেকে ছাত্রদলের একটি মিছিল কলা ভবনে আসার পথে ছাত্রদলের পাল্টা গ্রুপ টিটোর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সূর্যসেন হল থেকে মিছিলের ওপর বৃষ্টির মতোন গুলিবর্ষণ করে। হঠাৎ করে গুলির শব্দে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানহারা হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছুটতে থাকে। টিটো গ্রুপের অব্যাহত গুলিবর্ষণের একপর্যায়ে রতন গ্রুপের তিন কর্মি মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। এ সময় রতন গ্রুপের কর্মিরাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। গুলি, বোমা এবং ছাত্রছাত্রীদের ছোটাছুটিতে ক্যাম্পাসের পরিবেশ মুর্হুর্তে বদলে যায়। পুলিশ সংঘর্ষ ঠেকাতে টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতে একজন ছাত্র আহত হয়। এছাড়াও একটি গবাদি পশুও গুলিবিদ্ধ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনা ১৯৯০ সালের পর এটি প্রথম বলে ছাত্রছাত্রীদের দাবি। মিছিলে গুলিবর্ষণে আহত ছাত্ররা হচ্ছে- গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র একেএম রাশিদুল হাসান, ব্যবস্থাপনা মাস্টার্সের ছাত্র খায়রুল

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম মাখন এবং হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এসএম কবির হোসেন। পুলিশের রাবার বুলেটে আহত হয়েছে ভূগোল দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্র কায়সার। এরমধ্যে রাশিদ ও খায়রুলের অবস্থা সঙ্কটজনক। এদের উরুসন্দিতে গুলি লেগেছে।

• ভিসি যা বলেছিলেন ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরী জাপান সফর শেষে গত শনিবার ক্যাম্পাসে ফিরেছেন। তার অনুপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে লাশ পড়েছে এবং এসেই পড়েছেন সন্ত্রাসের মুখে।

ছাত্রদলের অন্তঃকোন্দলে আরিফ নামে একজন ছাত্র নিহত এবং শনিবার আরো কয়েকজন ছাত্র আহত হবার ঘটনায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এ বিষয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসনের সঙ্গে কথা বলবো। তাকে অনুরোধ করবো ক্যাম্পাসে পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ছাত্রদলকে নিয়ন্ত্রণ করার। ভিসি বলেন, ইতিমধ্যে আমার প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ বাস্তবায়নে যেকোনো কর্মসূচি গ্রহণে পিছপা হবে না। তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল মহলের সহযোগিতা চেয়েছেন।

❖ কয়েকটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে বহিরাগত মুক্ত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা প্রশংসিত হয়েছে সব মহলে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বর্তমান পরিচয়পত্র তুলে দিয়ে ছাত্রদের লেমিনেটেড করা পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের চেকপোস্টগুলো দ্রুত কার্যকরী করা এবং সূর্যসেন হলের পেছনের গেট (কাঁটাবন) বন্ধ করে দেয়া।

❖ সহিংসতার আশঙ্কা রয়েই গেল

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা ভালো করেই অবহিত আছেন। কিন্তু সেটা না করে সংগঠন থেকে নাম মাত্র বহিষ্কার করলে সঙ্কট ও সংঘর্ষ শেষ হবে না। কারণ এর আগে দেখা গেছে সংঘর্ষের কারণে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে একাধিক ছাত্রনেতা বহিষ্কার করা হলেও কিছুদিন পরে তারা সংগঠনের সকল পর্যায়ের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। এরকম একজন ছাত্রনেতা আছে ছাত্রদলের মধ্যে এ নিয়ে পাঁচ বার বহিষ্কারের পরও এখনো ছাত্র রাজনীতি করে যাচ্ছে। তাই শুধু বহিষ্কার নয় প্রয়োজনে কার্যকর সিদ্ধান্ত। নাহলে ক্যাম্পাস থেকে লাশের মিছিল বরং বাড়বে।[২] *জার্নাল সাপ্তাহিক বিচিত্রা জানু-জুন-১৯৯৭ ইং, ২৫ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২১-২২।*

❖ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সংঘর্ষে নিহত ৫

গত শনিবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদল ছাত্রঐক্যের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ৫ নিহত ২৫০ জন আহত হয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের প্রায় ১৫ জন ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে- নিহতের মোট সংখ্যা ৭/৮ এ দাঁড়াবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিবিরের সন্ত্রাসী হামলার মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সূত্রমতে, শিবিরের এ হামলা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় তাদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির বহিঃপ্রকাশ।

শনিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা এলাকায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি মিছিলে ইসলামী ছাত্রশিবির মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালালে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ ছাত্র সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এ নারকীয় সন্ত্রাসে নিহত হন ছাত্রদল কর্মি ৩য়বর্ষ ফলিত পদার্থবিদ্যার ছাত্র বিশ্বজিৎ এবং দুজন বহিরাগত মোস্ত াফিজুর রহমান নাজমুল ও রবিউল ইসলাম।

ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ এবং সকল চলতি পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশ ও বিডিআর এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

❖ ঘটনার বিবরণ

সকাল ১১টার দিকে ছাত্রদলের মিছিলটি শুরুর পর পরই শিবিরের একটি জঙ্গি মিছিল আমতলা এলাকায় চলে আসে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে ঘটানো শিবিরের সন্ত্রাস ও হত্যার কারণেই ছাত্রদল কর্মিরা শিবিরের তৎপরতার বিরুদ্ধে জঙ্গি স্লোগান দিচ্ছিল।

এক পর্যায়ে অস্ত্রধারীদের গুলিবর্ষণ ও ককটেল বিস্ফোরণের মধ্যদিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটলে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাম্পাস ফাঁকা হয়ে যায়। ছাত্রদল কর্মিদের রক্ষার্থে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের অন্যান্য সংগঠন ছাত্রদলের পক্ষে যোগ দেয়। এ সময় শিবিরের বিপুলসংখ্যক বহিরাগত সন্ত্রাসী আগ্নেয়াস্ত্র, তীর-ধনুক ও বোমা নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বেলা ১২টার দিকে ছাত্রঐক্যের ধাওয়ার মুখে শিবিরকর্মি ক্যাম্পাস ছেড়ে শেরেবাংলা, আমীর আলী জোহা, সোহরাওয়ার্দী, মাদার বক্স প্রভৃতি হলে অবস্থান নেয়।

এ সময় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী শিবিরকর্মিদের ধাওয়া করে জোহা হল থেকে বের করে দেয়। বেলা আড়াইটার দিকে শিবিরকর্মিরা বহুসংখ্যক বহিরাগত নিয়ে পুনরায় জোহা হলে আক্রমণ চালায় এবং নির্বিচারের সাধারণ ছাত্রদের মারধর করে। অনেক ছাত্রের হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়। বহু ছাত্রগুলি, বোমা ও তীরের আঘাতে আহত হয়। জোহা হলের মধ্যে ২ জনের মৃত্যু হয় বলে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানায়। বেলা সাড়ে ১১টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত এ সংঘর্ষকালে পুলিশ কিছু টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা ছাড়া তেমন কোনো ভূমিকা পালন করেনি বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। জোহা হলের ৭৫টি, মাদার বক্স হলের ৬০টি, সোহরাওয়ার্দী হলের ৫০টি এবং শেরেবাংলা হলের ২৫টি কক্ষে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে শিবিরের সন্ত্রাসীরা অনেক ছাত্রকে জোহা হল থেকে বাইরে নিয়ে তাদের বুধপাড়া ঘাঁটিতে নির্যাতন করে রাস্তায় ফেলে রাখে। ক্যাম্পাসের ছাত্র সংঘর্ষ চলাকালে রাজশাহী শহর, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

❖ নিহত আহতের সংখ্যা

ঘটনার পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যকে সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছে, এ ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা অভিযোগ করে ছাত্রশিবির ৫-৬টি লাশ তাদের বুধপাড়া ঘাঁটির দিকে নিয়ে গেছে। মন্টু, নজরুল ও আসাদসহ ৮ জন ছাত্রদলকর্মি নিখোঁজ রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ছাত্রশিবিরে ঘাঁটি বলে পরিচিত জোহা হল থেকে রক্ষা পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতালে সাংবাদিকদের জানান, তাদের সামনেই দুজন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। যুবদলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জানান, ছাত্রদলের টিটোও নিহত হয়েছেন। কিন্তু তার লাশ শিবিরকর্মিরা গুম করে ফেলেছে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে ১শ ৩০ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যারমধ্যে ৩০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে গুরুতর আহতরা হলেন মাসুদ- ছাত্রদল, নিউটন-ছাত্রদল, সজল-ছাত্রদল, মিঠু-ছাত্রদল, কায়সার - ছাত্রদল ও শাহজাহান জোহা হলের ছাত্র। এদের অধিকাংশই গুলিবিদ্ধ।

❖ পুলিশের তল্লাশি অভিযান

পুলিশ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা, মাদার বক্স ও লতিফ হলে তল্লাশি চালিয়ে ১টি কাটা রাইফেল, ১টি পাইপ গান, ৩ রাউন্ড গুলি ও বিপুল পরিমাণ বোমা, তীর এবং চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করেছে। সন্ধ্যায় এ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ছাত্র সংঘর্ষে ৪ জন পুলিশ আহত হয়। তারা পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংঘর্ষের জন্য ছাত্র শিবিরকে দায়ী করে শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতা বিশ্বজিৎ ও তপন হত্যার দায়ে শিবিরের বিচার দাবি করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য রাজশাহী মহানগরে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল করে। ঘটনার জন্য শিবির ছাত্রঐক্য ও ছাত্রদলকে দায়ী করে।

❖ বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নিন্দা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ বিরোধী জামাত-শিবিরের হামলায় তিনজন ছাত্র নিহত এবং ৫ শতাধিক ছাত্র আহত হবার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন দল ও সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে বিবৃতি দিয়েছে।
বিবৃতিগুলোতে বলা হয় জামাত-শিবির চক্র আবার ১৯৭১-এর কায়দায় এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতা কর্মিদের ওপর হামলা শুরু করেছে। রাজশাহীর ঘটনা আবারো এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করলো।

বিবৃতিগুলোতে ১৯৭১-এর ঘাতকদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ছাত্র-জনতাকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং শিবিরের নগ্ন হামলায় বিপন্ন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের রক্ষা করার জন্য সরকার ও দেশবাসীর প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিদাতা রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলো হচ্ছে- কেন্দ্রীয় পাঁচদল, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (বা-কা), যুব, মৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট ও ছাত্রলীগ (আ-শ)।[৩] *জার্মান্য সাপ্তাহিক বিচিত্রা মার্চ - জুন- ১৯৯৩ ইং, ২৯ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৩।*

২৭ অক্টোবরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দুকযুদ্ধের পাশাপাশি ১ নভেম্বর সংবাদপত্রে যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলকারী ছাত্রদের মন্তব্য ছাপা হয়েছিল। দুটি সংবাদ দু ধরনের। একটি শোকের অপরটি আনন্দের। কিন্তু কোথায় যেন এ দুটি সংবাদের সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে। ২৭ অক্টোবর ছাত্রলীগের বন্দুকবাজদের হাতে মারা গিয়েছিলেন দু'জন প্রতিভাবান ছাত্র। পরে আহতদের দু'জন মারা যায়। আর ১ নভেম্বর দু'জন প্রতিভাবান ছাত্র বললো, তারা ছাত্র রাজনীতিই পছন্দ করে না। এসব প্রতিভাবান ছাত্র যারা আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে, যারা সমাজকে পথ দেখাবে, তারা অকপটেই বললো, তারা ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায় কিন্তু কেন? ছাত্র রাজনীতি একদিন বাংলাদেশকে জন্মের পথ

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়েছিল, যে ছাত্ররা স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে বাংলাদেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল, যে ছাত্রদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছিল ১৯৯০-এর মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেই ছাত্র রাজনীতিকেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে প্রতিভাবান ছাত্ররা। এদের কাছে ছাত্র রাজনীতির আবেদন কমে গেছে। কমে যাচ্ছে এর গ্রহণযোগ্যতা। বিষয়টি নিয়ে আজ ভাববার ব্যাপার আছে। নিছক দু'জন ছাত্রের মন্তব্য বলে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না।

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী দেবাশীষ কুমার পাল বলেছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। দেবাশীষ চলতি বছরে অনুষ্ঠিত যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী এহসান হকও জানিয়েছে- রাজনীতি তার ভালো লাগে না। এহসান আরো বলেছেন, রাজনীতির নামে অব্যাহত সন্ত্রাস দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়াশুনার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট করছে। ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে এ দুজন প্রতিভাবান ছাত্রের মন্তব্য থেকে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক নয়। এ কারণে ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আরো একটু গভীরে যাই। জানতে চেষ্টা করি অন্যান্য বোর্ডের মেধাবী ছাত্ররা ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করে। এদের মন্তব্য ও ভাবনা খুঁজতে গিয়ে উভয় বোর্ডেব প্রতিভাবান ছাত্রদের মাঝে আমরা অদ্ভুত এক মিল খুঁজে পাই। দেখতে পাই যশোর বোর্ডের মেধাবি ছাত্ররা যে মন্তব্য করেছে, ঢাকা বোর্ডের মেধাবী ছাত্ররা একই ধরনের মন্তব্য করেছিলো আজ থেকে প্রায় দেড় মাস আগে।

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। বোর্ডের মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রের মন্তব্য পাওয়া না গেলেও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী নাজিমউদ্দিন মোহাম্মদ ওয়াসিউদ্দিন মন্তব্য করেছিলো। রাজনীতি করার তার আদৌ কোনো ইচ্ছা নেই। মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সম্মিলিত মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকারী রোকাইয়া হক বলেছিলেন, সে ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করে না। একই কথা প্রতিধ্বনিত করেছিল মেয়েদের মাঝে তৃতীয় স্থান অধিকারী সঙ্গীতা রাজবংশী। সঙ্গীতা বলেছিল, রাজনীতিতে তার কোনো আগ্রহ নেই, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারী সায়মা সুলতানা জানিয়েছিলো সে রাজনীতির প্রতি কোনো আগ্রহবোধ করে না।

রাজনীতি তা সে ছাত্র রাজনীতিই হোক কিংবা দেশীয় রাজনীতিই হোক, তা সমাজ থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আজকে যারা এসএসসি পাস করেছে, ২ বছর পরই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে এবং পরবর্তীতে দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তারা এক একজন জাতীয় উন্নয়নে তাদের অবদান রাখবে। এক্ষেত্রে তারা যখন বলে, রাজনীতি তারা পছন্দ করে না কিংবা রাজনীতির প্রতি যখন তাদের ঘৃণা প্রকাশিত হয়, তখন বিষয়টি ভেবে দেখার ব্যাপার বৈকি। যদি বলি সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একের পর এক যেসব সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটছে তার ফলশ্রুতিতেই এসব প্রতিভাবান ছাত্রদেরকে রাজনীতিবিমুখ করে তুলেছে, তাহলে কি মিথ্যা বল হবে? সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে আগামীতে আরো গবেষণা করবেন। তবে এটা সত্য, চর দখলের মতো সন্ত্রাসবাদীরা একের পর এক যেভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে তাতে ছাত্রদেরকে শুধু রাজনীতিবিমুখই করছে না, এদের মাঝে রাজনীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে, যা আগামী দিনের সমাজ উন্নয়নে প্রভাব ফেলতে পারে। রাজনীতি করা কোনো খারাপ ব্যাপার নয়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক নেতা রাজনীতি করেই আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করছিলেন। রাজনীতি করে বহির্বিশ্বে যতটুকু পরিচিত হওয়া যায়, সমাজের অন্যান্য শাখায় নিজেকে ব্যস্ত রেখে অতোটা পরিচিতি হওয়া যায় না। উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অবধারিতভাবে সত্য। পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সামান্যতম একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রির লেস ভালেসা আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন নোবেল শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

পুরস্কার। এর পেছনে ওই রাজনীতিটাই ছিল মুখ্য। ১৯৮০-এর দশকে পোল্যান্ডের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশে, সোভিয়েত সেনাবহিনীর উপস্থিতিতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। এ কর্মটি করেছিলেন ভালেসা। ভালেসা আজ পোল্যান্ডের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। বার্মার অভ্যন্তরীণ নেত্রী অং সান সুকি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাও সেই রাজনীতির জন্য। সুকির নাম বছর তিনেক আগেও কেউ জানতো না। আজ সুকির মুক্তির দাবি করেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বুশ। বিদেশের কথাই শুধু বলি কেন। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আপসহীনভাবে দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে জনগণ শুধু তার সংগঠনকে নির্বাচিতই করেনি। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের নামের সঙ্গে আরো একটা নাম যুক্ত হয়েছিল। আর সেই নামটি ছিল খালেদা জিয়ার, রাজনীতি যাকে একজন গৃহবধূ থেকে রাজ পথে টেনে এনেছিল। সুতরাং রাজনীতি খারাপ নয়। কোনো কোনো লোক রাজনীতিকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, এটা সত্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রাজনীতি করা, জনগণের জন্য কাজ করা, কিংবা জনগণের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া কোনো খারাপ কাজ নয়। আর এ কারণেই একজন প্রতিভাবান ছাত্র যার ঘাড়ে আগামী দিনের নেতৃত্ব বর্তাবে সে যখন রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে তখনই চিন্তাটা আসে। আমাদের ভাবতে শেখায়, এর কারণ কি?

দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। এর বাইরে মোট কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসীদের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে এর কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। কেউ বলেন ৭৯টি, কেউ বলেন, ১২০টি। সংখ্যা যাই হোক, সত্য হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। আর আমরা সংবাদপত্রের পাতায় সেই বন্ধ হয়ে যাওয়া সংবাদ পাচ্ছি। সরকারি দল, বিরোধী দল, সবাই বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছেন বিরোধী দলের নেতারা, যদিও সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসসম্পর্কিত একটি সংসদীয় কমিটিও গঠিত হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাস থেমে থাকেনি।

সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা গত ৩১ অক্টোবর সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অপতৎপরতা স্থগিত থাকবে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে কিংবা তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে যাদেরকে ২৭ অক্টোবরের ঘটনাবলীর জন্য দায়ী করা হয়েছিল, শেখ হাসিনার এ ঘোষণার মধ্যদিয়ে সেই সত্যটিই আবার প্রমাণিত হলো। ছাত্রলীগের কর্মতৎপরতা স্থগিত রেখে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। এ সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই, এরা সুবিধাবাদী। প্রয়োজনে এরা আজ ছাত্রলীগে আশ্রয় নিয়েছে। আগামীকাল এরা আবার ছাত্রলীগ ছেড়ে দেবে। যেখানে সুযোগ বেশি তাদের অবস্থান সেখানে। ছাত্র রাজনীতিকে এরা আজ কলুষিত করেছে। ছাত্রদের নাম করে এরা আজ চাঁদা ওঠায়। ছাত্রদের নাম করে এরা গাড়ি ভাঙ্গে, হাইজ্যাক করে। বইয়ের বদলে কাটা রাইফেল আজ এদের সঙ্গী। যে কারণে অভিভাবকরা আজ ভয় পান তাদের সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে। যে কারণে একজন মেধাবী ছাত্র আজ ছাত্র রাজনীতি সম্পর্কে তার বিরূপ ধারণা ব্যক্ত করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে তার বিরূপ ধারণা ব্যক্ত করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বে বেশ গুণগত পরিবর্তন এসেছে। এক সময় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন সামন্তবাদী প্রভুরা। ব্যবসায়ী আর ধনী কৃষকদের হাতেই ছিল রাজনীতি সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইদানীংকালে এতে পরিবর্তন এসেছে। পেশাজীবীদের একটা বড় অংশ ধীরে ধীরে রাজনীতির প্রতি আগ্রাহান্বিত হয়ে উঠছেন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রাদায়ের একটা অংশও এখন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এ কারণে রাজনীতির প্রতি মানুষের বিশ্বাস যোগ্যতা যেমন বাড়ছিলো, তেমনি রাজনীতিতেও এসেছে গুণগত পরিবর্তন। সুস্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য এটা একটা শুভ লক্ষণ। পশ্চিমা বিশ্বে সমাজের উচ্চ শিক্ষিতরাই

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি করেন যার ফলে রাজনীতি সেখানে একটা সম্মানজনক পেশা। আমাদের মতো উন্নয়শীল বিশ্বে এ শক্তি তথা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত করা উচিত। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন আশার কথা, তারই গড়া বিএনপিতে সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসীরা যেভাবে ধীরে ধীরে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের আধিপত্য বিস্তার অব্যাহত রেখেছে এবং সমাজকে যেভাবে তাদের হাতে জিম্মি করে রাখছে, তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী দিনে বন্দুকবাজরা খোদ রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকেই তাদের নিজেদের কর্তৃত্ব নিয়ে নেবে। এতে করে ব্যাহত হবে রাজনৈতিক উন্নয়ন, আর রাজনীতির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। যে বন্দুকবাজ ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নাজিম-দেবাশীষ-এহসানের মতো ছেলেরা সেই বন্দুকবাজকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে নেবে না, এটাই স্বাভাবিক। রাজনীতিকে গ্রহণযোগ্য করে নিতে হলে ছাত্র রাজনীতিকে এ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ স্থগিত নয় বরং সন্ত্রাসীদেরকে, তা সে যেই হোক না কেন, আইন রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়ে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই রাজনীতির প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ফিরে আসবে মানুষের আস্থা। সেটা সবার জন্যই মঙ্গল।[৪] *ড. তারেক সামসুর রহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির এক দশক, একাশনী গ্রন্থমেলা, ঢাকা -২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-১-১৪।*

• বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস: আত্মতৃপ্তির জায়গা কোথায়?

একই সঙ্গে দুটো খবর বেরিয়েছে। একটি খবরে বলা হয়েছে-সংসদীয় কমিটির সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দাবি করেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নেই। পাশেই বড় করে খবর-ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে যুদ্ধ, তিনজন গুলিবিদ্ধ। এর কদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে সন্ত্রাসী টোকাই মিজান'কে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জীবন হারাতে বসেছিলেন। টোকাই মিজান রাইফেল তাক করে পুলিশকে সরে যেতে বাধা করে এবং ওই রাইফেল হাতেই সে পালিয়ে যায়। ওই পুলিশ, ছাত্রনেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সামনে টোকাই মিজান বহালতবিয়তেই তার মাদক ব্যবসা ও মাস্তানি চালিয়ে গেছে।

এর পরের ঘটনাটি ঘটে মাস্টারদা সূর্যসেন হলে। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের এমফিলের ছাত্র সেলিমকে দুপুর বেলা নিজের রুমে ঘুমন্ত অবস্থায় নির্মমভাবে কোপানো হয়। সেলিমের চিৎকারে অন্যারা এসে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও ওই সন্ত্রাসীরা নিরাপদেই স্থান ত্যাগ করে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত কিছুদিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরেছে এভাবে। এর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বক্তব্যের কোনো মিল নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়নের কারণে অন্তর্দলীয় সন্ত্রাস হ্রাস পাওয়ার কথা বলা হয়, তবে নিঃসন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ, উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পুলিশ প্রশাসন কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাসের কি অবসান হয়েছে? মোটেই তা নয়। সাপ্তহিক-২০০০ হিসাব দিয়েছে, ১৯৯৫ সালে যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হলের ১২টি তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনের দখলে ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় বসার এক বছরের মধ্যে ক্যাম্পাসের দৃশ্যপট বদলে গেছে। ১৪টি হলের ১৪টিই বর্তমান ক্ষমতাসীনদের দখলে। সেদিক দিয়ে বর্তমান উপাচার্য বরং বেশি কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তার আমলে ক্ষমতাসীন দল দুটো বেশি হল দখল

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এর ফলে ক্যাম্পাসে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-দক্ষিণ ভাগ নেই। এখন সবটাই একাকার হয়ে একদলীয় সন্ত্রাসীদের দখলে রয়েছে।

সুতরাং উপাচার্য যখন সংসদীয় কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নেই, তখন তিনি অর্ধ সত্য বলেন-যা মিথ্যার চেয়ে ভয়ঙ্কর। সত্য হলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। সন্ত্রাসের পালা বদল ঘটেছে এবং ওই পালা বদলে ওই সন্ত্রাস আরো বেপরোয়া ও আধুনিক হয়েছে। সাপ্তাহিক-২০০০ তার অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেদনে বলেছে, আগে যেখানে ক্যাম্পাসে পিস্তল, কাটা রাইফেল, বন্দুক এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্টেনগান ব্যবহারের কথা শোনা যেতো, এখন সেখানে তার জায়গা দখল করেছে চাইনিজ জি-৩ বা একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল।

আমরা জানি, পাকিস্তানের করাচি অথবা ভারতের মুম্বাইয়ের অপরাধ জগতের লোকেরা এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে সে দেশের কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়েছে। আমাদের দেশের অপরাধ জগতের বাসিন্দারা এখনো এ ধরনের অস্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে সেভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। সেখানে ক্যাম্পাসে এ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার নিঃসন্দেহে ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস পরিস্থিতির ভয়াবহতারই পরিচয় দেয়।

ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস পরিস্থিতির অপর বিশেষ দিক হচ্ছে এখন আর ছাত্র বা ছাত্রনেতারা ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করে না। টোকাই মিজান বা বাইরের গডফাদাররা ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করে। ক্যাম্পাসে এ বহিরাগত সমস্যা আগেও ছিল। কিন্তু ক্যাম্পাসের ঘটনার নিয়ন্ত্রণটি ছাত্র বা ছাত্রনেতাদের হাতে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষের মূল রূপটি ছিল রাজনৈতিক। মূল দুটি প্রতিপক্ষীয় ছাত্র সংগঠন তাদের রাজনীতি বা রাজনৈতিক বিরোধ বিবেচ্য বিষয় নয়। অবশ্য প্রয়োজনে এ ধরনের ঘটনাকে রাজনৈতিক মোড়ক দেয়া হয়। কিন্তু এখন শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবেই মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি, বখরা ভাগ এসব বিষয়ের সঙ্গেই জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসীরা এখন দল হিসেবে নয়, জেলা হিসেবে, নেতার অনুসারী হিসেবে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত। অস্ত্রই এখন নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাম্পাসে। আর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী ক্যাডাররাই ছাত্র রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস অবসান হওয়ার ব্যাপারে উপাচার্যের দাবি ঠিক নয়। কিন্তু যে সংসদীয় কমিটিতে উপাচার্য এ কথা বলেছেন, সেখানেই বা কি আলোচনা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির ওই আলোচনার বিশদ খবর বেরোয়নি। কিন্তু যেটুকু খবর বেরিয়েছে তাতে দেখা যায়, সরকার দলীয় সংসদ সদস্য দাবি করেছে, ১৯৭৫-এরপর প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষাঙ্গনে এ সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বিএনপির সংসদ সদস্য দাবি করেছেন, ১৯৭২-এ স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশের সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সত্য গোপন করেছেন, তেমনি যারা জাতির দায়িত্ব হাতে নিয়ে দেশের ভালোমন্দ নির্ধারণ করছেন, তারা আমাদের দেশে এ সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠে সমস্যার মূলে না গিয়ে তাকে দলীয় ঝগড়ার বিষয় করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দলীয় ঝগড়ার বিষয় নয়। এটা সমগ্র জাতির বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসমূহ তো বটেই, সারাদেশে শিক্ষাঙ্গনে এ সন্ত্রাস সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকেই ধ্বংসের একদম চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে এসেছে। এদেশের ছাত্র-শিক্ষকরা অনেক গৌরবের অধিকারী। কেবল ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহ্যই নয়, আমাদের ছাত্ররা মেধা-মননে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে ছিল। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার মানও গর্ব করার বিষয় ছিল। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা ইতিহাসে নিজেদের নাম রেখেছেন। এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয় অথবা দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহ বর্তমানে যে পর্যায় অধ:পতিত হয়েছে, তাতে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসাবে তার পুরনো পরিচিতি দূরে, প্রাচ্যের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমমানে দাঁড়াতে পারছে না। এদেশের শিক্ষার্থীরা এখন মেধামননে বহু পেছনে পড়ে গেছে।

আমাদের রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখন কথায় কথায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের কথা বলেন। তারা উপযুক্ত হয়ে মোকাবেলার কথা বলেন। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জটি কি সে সম্পর্কে তাদের ধারণা জানতে পারলে বোঝা যেতো কি তারা বলতে চান। সে যাইহোক, একবিংশ শতাব্দির এ চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে জ্ঞানের একটি বিশেষ স্তর অর্জন করা। একবিংশ শতাব্দিতে জ্ঞানই হবে শক্তিধর উৎস। সে কারণেই পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো, পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো ওই জ্ঞানকে তাদের নিজেদের করায়ত্ত রাখার জন্য নানাবিধ আইন চাপিয়ে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর। এ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে আমরা এমনিতেই বহু দূরে ছিটকে পড়ে আছি। সেখানে ওই প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠা পরের কথা, নিজেদের অস্তিত্ব রাখার প্রয়োজনে জ্ঞানবৃত্তের মধ্যে যদি আমরা না থাকতে পারি, তাহলে ঘোর অন্ধকার আমাদের গ্রাস করবে। আর এ জ্ঞানবৃত্তের মধ্যে থাকার একমাত্র উপায় শিক্ষাঙ্গনের পুরাতন ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া। তাকে আরো আধুনিক, আরো উন্নত করা। কিন্তু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাঙ্গনে যখন টোকাই মিজান অথবা বিভিন্ন জেলা উপজেলার নামধারী সন্ত্রাসী গ্রুপরা রাজত্ব করে, তখন সেই জ্ঞান পাখিটির পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর মাথায় যখন এ অবস্থাটি হয়, তখন সর্বদেহে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এ রকম অসংখ্য টোকাই মিজান দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং এখন কেবল জ্ঞানের উচ্চ শাখা নয়, প্রাথমিক, মাধ্যমিক সব পর্যায়কেও রক্ষা করার প্রশ্ন চলে এসেছে।

তাহলে আমাদের আত্মতৃপ্তি পাওয়ার জায়গা কোথায়। একে অপরকে দোষারোপ করে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিমাণগত ও গুণগতভাবে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনা কমে যাওয়ায় সন্তোষবোধ করতে পারেন। কিন্তু দেশের মানুষ স্বস্তি বোধ করতে পারে না। উপাচার্যের বক্তব্যের পাশাপাশি সংবাদপত্রের খবরই বলে দেয়, ভিন্ন ফর্মে ওই একই সন্ত্রাস উপস্থিত আছে তার নিজস্ব অঙ্গনেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অথবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন নেই। কারণ দায়টা তাদের একার নয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সমাজের সামগ্রিক অবস্থার প্রতিফলন সেখানে পড়ে। সুতরাং দায়টা রাজনীতির, সমাজের ও সবার। কিন্তু তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায় আছে। তারা সমাজের পক্ষ হয়ে দেশের ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। একজন তরুণ তার পরিবারের সঙ্গে যতক্ষণ থাকে তার চাইতে বেশি দায় তার এড়ানোর অবকাশ নেই। কিন্তু সেই শিক্ষকের সম্পর্কেই এখন আর জোর গলায় কিছু বলা যাচ্ছে না। বরং তাদের বিরুদ্ধেও সংবাদপত্রের পাতায়

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। আজ সেই বিষয়ে বলার অবকাশ নেই। যেটা বলার তাহলো, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের এ পরিধি পরিমাণ ও পরিণতি বোধ হয় এখনো আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। কিন্তু এ সন্ত্রাস কোনো দলকে বাদ দেয় না। এ সন্ত্রাস সর্বসংহারী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিষয়টি নিশ্চয়ই এখন উপলব্ধি করতে পারছেন। এতদিন এদিক-ওদিক করে চালানো গেছে। কিন্তু এখন আর কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছে না। সুতরাং দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ওই সন্ত্রাসকে লঘু করে দেখানোর কোনো অবকাশ নেই। সন্ত্রাসী কারো দলের নয়-এ কথাটি যদি সত্য হয়, তবে দলের সন্ত্রাসীদের সম্পর্কেও এ ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলে সংবাদপত্রের পাতায় একই সময় প্রকাশিত পরস্পরবিরোধী এ ধরনের সংবাদের জন্য কাউকে বিব্রত হতে হবে না বরং সন্ত্রাস নির্মূল করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা সম্পর্কে দেশের মানুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে।[৫] *রাশেদ খান মেনন, রাজনীতির কথকতা, প্রকাশনী মৃদুল, ঢাকা - ২০০০ ইং। পৃষ্ঠা-১০১-১০৪।*

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নতুন কিছু নয়; ইংরেজ আমল থেকে শুরু করে দেশ বিভাগের পরও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত রাজনীতি করছে। দেশ বিভাগের আগে ছাত্র রাজনীতির যে ধারাটি ছিল, তাহলো দেশ থেকে ইংরেজ হঠাও, দেশ স্বাধীন কর। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে ছাত্র রাজনীতির ধারা পাল্টে যায়। তখন ছাত্র রাজনীতিতে প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখা দেয় পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসক সম্প্রদায়। এরপরে যতদিন গেছে ছাত্র রাজনীতির ধারাটিও পাল্টে গেছে। সর্বোপরি দেশ স্বাধীনের পর বলা যায় ছাত্ররা তাদের রাজনীতির মূল ধারা থেকে সরে এসে ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি চর্চা শুরু করে। সুস্থ ধারার রাজনৈতিক নেতাদের স্থান দখল করেছে দেশীয় অপশক্তি তথা খুনীচক্র। রাজনীতির নামে এক শ্রেণীর গডফাদারেরর দ্বারা পরিচালিত ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির কারণেই প্রতি বছর এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো থেকে ঝরে পড়ে কিছু তাজা প্রাণ। রক্তের বদলা নিতে ঝাপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষ সংগঠনের ওপর কিংবা অভ্যন্তরীণ কোন্দলে একে অপরের হত্যার শিকার হয়। একটি গুলি একটি প্রাণ যেন নিতান্তই একটি সহজ ব্যাপার। ফলে দিনের পর দিন অনির্ধারিত সময়ের জন্য বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। চার বছরের কোর্স আট বছরেও শেষ হতে চায় না। সম্ভাবনার স্বর্নোজ্জ্বল দ্বারে হয়েক সমস্যার ঘনঘটা। অভিভাবক থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন সবাই উদ্বিগ্ন থাকে- তাদের পড়ুয়া ভাইটি উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি নিয়ে ফিরে আসবে তো? স্বাধীনতার পর ছাত্র রাজনীতি ক্রমশ ক্ষমতার তল্পিবাহক হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে মুজিব সরকারের সময় থেকে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ক্যাডার হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সেই থেকেই দেশের ছাত্র রাজনীতিতে ধ্বস নামতে শুরু করে। রাজনৈতিক দল অস্ত্র আর অর্থ তুলে দেয় ছাত্রনেতাদের হাতে। ফলে ছাত্র রাজনীতির পূর্ব ঐতিহ্য হারিয়ে যায়। অস্ত্র হয়ে উঠে শক্তির উৎস। স্বাধীনতা পরবর্তী ৩০ বছরে দেশের ক্যাম্পাসগুলোর সন্ত্রাসী তৎপরতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একমাত্র এ সরকারের শাসনামলেই শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাসী ঘটনা অতীতের তুলনায় কম ঘটেছে।

স্বাধীনতার উত্তরকালে ১৯৭৪ সালে ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের সেভেন মার্ডারের ঘটনাটি ছাত্র হত্যার ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। তার আগে প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর ১৯৪২ সালে ছাত্রনেতা নাজির আহমেদ হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যার রাজনীতি শুরু হয়। ষাটের দশকের শুরুতে পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খানের গড়া ছাত্রসংগঠন এনএসএফ সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এনএসফের ক্যাম্পাস কামান্ডার ছিল সাইদুর রহমান ওরফে পাঁচ পান্ডু। ১৯৬৮ সালে মারা যায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে। এছাড়া ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যুব লীগের বহিরাগত কর্মি প্রতিপক্ষের গুলিতে প্রাণ হারায়। একই বছরে ওই ক্যাম্পাসে প্রতিপক্ষের হাতে মারাত্মক জখম হয়ে প্রাণ হারায় ছাত্রলীগ নেতা তানভীর।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গত ৩০ বছরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংঘর্ষ ও সহিংস ঘটনায় খুন হয়েছে ১১৮ জন। আহত হয়েছে দশ হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কমচারী। মারাত্মক জখম হয়েছে ৪,২৯০ জন। এ সকল হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে আধিপত্য বিস্তার, ব্যক্তিগত ও দলীয় রেষারেষি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এ যাবত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক ৭২ জন খুন হয়েছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ছাত্র সংঘর্ষে নিহত এ সকল ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়র ছাত্র। নিহতদের মধ্যে ছাত্রলীগের ৭৫, ছাত্র শিবিবিরের ২৬, ছাত্রদলের ১৮, জাসদ ছাত্রলীগের ৮, ছাত্র ইউনিয়নরে ৬, ছাত্রমৈত্রীর ৫ ও ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের ২ জন রয়েছে।

দেশ স্বাধীনের পর পরই বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক সন্ত্রাস তুঙ্গে উঠে। বিগত সরকারের দমননীতি এ সন্ত্রাসকে আরো অস্থির করে তোলে। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ছাত্র ইউনিয়ন কর্মি মতিউর কাদেরকে হত্যার মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনকে ঘিরে তথা ব্যালট পেপার ছিনতাই ঘটনার মধ্যদিয়ে সন্ত্রাস আরো জোরালো হয়। ১৯৭২ সালের ২৪ জুলাই পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ রব গ্রুপের সম্মেলনে মুজিববাদী ছাত্রলীগ হামলা চালায়। এ অনুষ্ঠানিক বিভেদের পথ ধরে পরবর্তীতে গঠিত হয় জাতীয় সমাতান্ত্রিক দল জাসদ। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মহসীন হলে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান ও তার অপর সহযোগীদের যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রাণহানির ঘটনা ঘটে ১৯৭৬ সালে। ছাত্রলীগের হাতে মনসুর নামের এক জাসদ ছাত্রলীগ নেতা প্রাণ হারায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৭ সালে ছাত্রলীগের তৎকালীন আওরঙ্গ ও লুকু গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ইনু, গোগা, লুকু ও রিন্টু নামের চার ছাত্রলীগ নেতা খুন হয়। ১৯৮৮ সালের ১২ এপ্রিল ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলের কারণে লিয়াকত নামের একজন খুন। একই বছরের ২৯ এপ্রিল প্রশাসন ভবনে ১২৭ নম্বর কক্ষে আরেক জন ছাত্র নিহত হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও শিক্ষকদের সংঘর্ষে রঞ্জিত নামের এক ছাত্রের মৃত্যু ঘটে।

১৯৮০ সালে প্রতিপক্ষের হাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক বীর প্রতীক এটিএম খালিদ নিহত হয়। খালিদ হত্যার জের ধরে পরদিন ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও জাসদ ছাত্রলীগ ঐক্য করে ছাত্রলীগের হল ঘেরাও করে এলোপাতাড়ি গুলি চালালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের শীর্ষ ৩ নেতা শওকত আলী ও মহসীন নিহত হয়। চরম অস্থিরতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় পাঁচ মাসের জন্য। আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের দুই চারটি সংঘর্ষসহ আরো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও কেউ প্রাণ হারায়নি। ১৯৮০ সালের ৩ নভেম্বর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে ছাত্রলীগ কর্মী মীর মোস্তফা এলাহী প্রাণ হারায়। একই বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় অপর এক ছাত্র। ১৯৮২ সালের ১১ মার্চ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী ও জাসদ ছাত্রলীগ সমন্বিত ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রাণ হারায় আইয়ুব আলী ও আবদুল জব্বার। এ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয় আরো একজন। এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে জেনারেল এরশাদ গড়ে তোলেন সশস্ত্র মাস্তান বাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ গড়ে তোলেন জেনারেল এরশাদ। এর উদ্দেশ্য এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করা। কেননা ক্ষমতা দখলের পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরশাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক নেতারা নীরব থাকলেও ছাত্ররা ক্রমান্বয়ে ফুঁসে ওঠে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে।

১৯৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে এদেশীয় দোসর মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মুক্তির মুখপাত্র মাওলানা মান্নান আয়োজিত এক মিলাদ মাহফিলে জেনারেল এরশাদ শহীদ মিনারে ফুল দেয়া ও আল্পনা আঁকা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদদের মৃত্যু দিবস। তাই ওই দিন ওখানে শুধু কোরানখানি করা হবে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্ররা ১৯৮৩ সালের ২৪ জানুয়ারি গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন করে সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি জানায়। ছাত্ররা ঘোষণা দেয়, এরশাদ সরকার দাবি মেনে না নিলে ১৪ ফেব্রুয়ারি সচিবালয় অভিমুখে মিছিল ও অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে। এরশাদ ছাত্রদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করেননি। ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ছাত্রছাত্রীদের মিছিল সচিবালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করে হাইকোর্টের সামনে পৌঁছলে নির্যাতনের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় জয়নাল, জাফর, কাঞ্চন, মোজাম্মেল ও দীপালি সাহা। এটিই ছিল এরশাদ আমলে প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। এরশাদ সরকার ও তৎকালীন সময়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে বার বার হামলা চালায় নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ। যে কারণে বিভিন্ন অজুহাতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরেরও অধিক কাল বন্ধ থাকে। ১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা রাওফুন বসুনিয়া। তার আগে ১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মহসীন হলে পুলিশেরগুলিতে নিহত হয় ছাত্রনেতা জয়নুল। ১৯৮৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ মিনারে চত্বরে ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যকার বন্দুকুদ্ধে একজন মারা যায়। একই বছরের ৩১ মার্চ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে লেকচার থিয়েটারের সামনে ব্রাশ ফায়ারে নিহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসলাম। ১৯৮৭ সালের ৯ মার্চ মহসীন হলের ৪২৬ নম্বর কক্ষে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত হয় ছাত্রদল নেতা মাহবুবুল হক বাবলু, মাঈনুদ্দিন ও নূর মোহাম্মদ। ১৯৮৭ সালের ১৪ জুলাই জাসদ ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রদল কর্মি হালিম নিহত হয়। এ সংঘর্ষে আব্দুর রহমান নামে একজন রিকশাচলক মারা যায়। আগের দিন ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের জের ধরে পরদিন ১৫ জুলাই এ দুই সংগঠনের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ বাধলে এসএম হলের জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মারা যায়। ১৯৮৮ সালের ১১ ডিসেম্বর মহসীন হলে ছাত্রদল নেতা পাগলা শহীদ নিহত হয়। ১৯৮৯ সালের ৯ ফ্রেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের সময় মধুর ক্যান্টিনের সামনে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা কফিল নিহত হয়। একই বছরের ২৯ নভেম্বর এসএম হলে ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে ফিন্যান্স বিভাগের এক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। ১৯৯০ সালের ২১ জানুয়ারি অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সূর্যসেন হলে নিহত হয় আলমগীর কবীর লিটন। একই বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যকার সংঘর্ষে নিহত হয় ছাত্রলীগ নেতা জহুরুল হক হলের ভিপি চুন্নু। ১৩ এপ্রিল অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মারা যায় ছাত্রনেতা খোকন। খোকনের মৃত্যু হয় জহুরুল হক হলে। ফজলুল হক হলেও অপর এক ছাত্রের লাশ পাওয়া যায়। এরশাদবিরোধী স্লোগান ও উপজেলা নির্বাচনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিলে ফুলবাড়িয়া এলাকায় পুলিশের ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে নিহত হয় দুছাত্র সেলিম ও দেলোয়ার। হত্যা করা হয় শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলাম ও বাসস-এর সাংবাদিক দুলালকে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর এরশাদ শাসনবিরোধী আন্দোলনে প্রাণ দেয় প্রতিবাদী যুবক নূর হোসেন। এভাবে ডা. মিলন, নিমাই, নূর হোসেন, তাজুল ও জিহাদসহ নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয় ২ হাজার ১৫০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র ফিরে এলেও ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রসংঘর্ষ ও সংঘাত বন্ধ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতায় কম্পিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্বদ্যিালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনে ঘটে রক্তপাত আর খুনাখুনির ঘটনা। প্রাণ হারায় বহু ছাত্র ও যুবক। ১৯৯৪ সালের ১৬ আগস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাসানী হলে রাতভর ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষ চলাকালে কামরুল ইসলাম নামে এক শিবিরকর্মি নিহত হয়। ১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আবারও ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সে সশস্ত্র সংঘাত ঘটে তাতে শিবিরকর্মি ইসমাইল হোসেন ও মুস্তাফিজুর রহমান প্রাণ হারায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ঘটনার জের ধরে পরদিন ঢাকাগামী নৈশকোচের যাত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৈত্রী নেতা দেবাশীষ ভট্টাচার্য রূপমকে নির্মমভাবে হত্যা করে ছাত্র শিবিরের কুখ্যাত ক্যাডার বাহিনী। ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল হুদা মুসাকে শিবিরকর্মিরা নৃসংশভাবে হত্যা করে। মুসা ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর প্রফেসর ড. ইনাম-উল-হকের (পরবর্তীতে যিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন) একমাত্র পুত্র।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে আমানউল্লাহ হত্যা। এ যাবৎ যতো সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে তার শতকরা আটানব্বই ভাগই ঘটেছে আবাসিক হলগুলোতে সিট দখলকে কেন্দ্র করে।

১৯৯৩ সালের ২৪ জানুয়ারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হয় ছাত্রদল নেতা রেজাউর রহমান সবুজ। একই বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৈত্রী জুবায়ের চৌধুরী রিনু ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল নেতা নুরুল হুদা মুসা নিহত হবার পর ওখনকার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা নুরুল হুদা মুসা নিহত হবার পর ওখানকার জাতীয়তাবদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে ঘাতক জামায়াত শিবিরচক্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯২ সালের ১ নভেম্বর। ভর্তি হওয়ার ১৬ দিনের মাথায় এবং মূল ক্যাম্পাস উদ্বোধনের ২৪ দিন পর ২৫ নভেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হরিনারায়ণপুর গ্রামের মেস থেকে খুন হয় শিবিরকর্মী সাইফুল ইসলাম মামুন।

১৯৯৫ সালের ২৮ এপ্রিল ছোট বোনকে ভর্তি পরীক্ষা দেয়াতে নিয়ে এসে ছাত্রশিবিরের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয় কুমারখালীর পৌর কমিশনার ও যুবদল নেতা আলী আযম।

১৯৯১ সালের ২০ জুন ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যকার সংঘর্ষে জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মাহাবুব নিহত হয়। একই বছর ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ছাত্রলীগকর্মি মির্জা গালিব, লিটন ও ছাত্রলীগ নেতা মিজান নিহত হয়। এ বন্দুকযুদ্ধে একজন টোকাইও মারা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। একই বছর জহুরুল হক হলে একজন বহিরাগত খুন হয়। ১৯৯২ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। নিজেদের অন্তর্কোন্দলে একই বছর নিহত হয় ছাত্রদলের মামুন ও মাহমুদ। ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের লাক্কু ও ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধের সময় টিএসসিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু। ১৯৯৩ সালে ফজলুল হক হলে পাভেল খুন হয় ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে একই রূপরেখায় সূর্যসেন হলের সামনে জিন্নাহ এবং ছাত্রলীগ মন্টু গ্রুপের নেতা অলক নিহত হয়। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সারোয়ার আহমেদ মিঠু খুন হয়। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ওই বছর জগন্নাথ হলে জাকির হোসেন এবং ছাত্র সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের টিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সেলের আঘাতে বুলবুল নামে এক ছাত্র নিহত হয়। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ১৯৯৫ সালের ২১ জানুয়ারি জগন্নাথ হলে ছাত্রলীগ নেতা জয়দ্বীপ দত্ত চৌধুরী বাপ্পী নিহত হয়। ২০০০ সালের ১২ জুলাই। চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে ছাত্রলীগের ৮ জনকে হত্যার মতো নৃশংসতম ঘটনা ঘটায়। ১৯৯৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র বকুলকে সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। ১৯৯৮ সালের ৬ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক ছাত্র আইয়ুব আলী সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়। ছাত্রশিবির হত্যা করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা প্রোটন দাসগুপ্ত ও সঞ্জয় তলাপাত্রকে। ১৯৯৭ সালের ১১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল এলাকায় খুন হয় ছাত্রলীগ কর্মি তনাই। এ ঘটনার একদিন পর ১৩ জুলাই জিয়া হলের ছাত্রদলকর্মি খুন হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রলীগ নেতা পার্থপ্রতীম আচার্য্য খুন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ১৯৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সান্দাম হোসেন হলের প্রশিক্ষক শিবিরকর্মি আমিনুর রহমান নিহত হয়। ১৯৯৮ সালের ৯ আগস্ট বাস থেকে ফেলে দিয়ে প্রতিপক্ষরা হত্যা করে ছাত্রলীগ নেতা খুরশীদ হাসান মামুনকে। একই বছর ৩১ অক্টোবর ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের দিনভর বন্দুকযুদ্ধে মহসীন ও আল মামুন নামে দু'জন শিবিরকর্মি নিহত হয়। ১৯৯৮ সালের ১৯ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক কাজী আহমেদ নবীর পুত্র মেডিকেল ছাত্র মুশফিকুর সালেহীনকে শিবিররা হত্যা করে। ১৯৯৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের বন্দুকযুদ্ধে রহিমুদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান নামে দুই শিবিরকর্মী নিহত হয়। ১৯৯৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হলের নামকরণ সংক্রান্ত জটিলতায় সৃষ্ট সংঘর্ষে ছাত্রশিবিরকর্মি আব্দুল মুনিম বেলাল প্রাণ হারায়।

- **ছাত্র রাজনীতি ঃ না গণমুখী, না শিক্ষমুখী ঃ**

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান অর্জন, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬০-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১১ দফার আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, ১৯৭১-এর সশস্ত্র সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্যে এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। এ সময়ে ছাত্র রাজনীতি মূলত দুটো ধারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়: একটি শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা লাভকে কেন্দ্র করে।

১৯৭১-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মূলত ছাত্ররা ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার একভাগ সুবিধাবাদী ধারা গ্রহণ করে আর অন্যভাগ বাম রাজনীতির ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়। বাম ধারার সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধী ধারাও যুক্ত হয়। ছাত্রদের মধ্যে সুবিদাবাদী ধারার চেয়ে প্রতিবাদী ধারা মূলত বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠে, যদিও প্রতিবাদী ধারাটি ছিল বহুধা বিভক্ত। কিন্তু ওই ঐতিহ্যও বেশি দিন টিকে থাকেনি।

১৯৬২-এর পট-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। একদলীয় বাকশাল গঠনের মাধ্যমে যেমন সকল ছাত্রসংগঠন মূলত সাংগঠনিক ধারা হারিয়ে ফেলে, তেমনি পরবর্তী সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনীতির মতো শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু সে শৃঙ্খল থেকে যখন ছাত্র রাজনীতিকে মুক্তি দেয়া হয়, তখনই ছাত্রনেতাদের সঙ্গে সরাসরি রাষ্ট্র নায়কের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ছাত্ররাজনীতি রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন না হয়ে অর্থাৎ অঙ্গসংগঠন

Dhaka University Institutional Repository

(vertical interation) না হয়ে অংশ সংগঠন (horizontal interation) হয়ে উঠে। নতুন দল গঠনের জন্য তখন ছাত্রদেরকে অর্থবিত্ত দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়।

১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। এ সময়ে ছাত্ররা প্রথম ছাত্র রাজনীতি থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হওয়ার সুযোগ পায়। কম করে দুজন ছাত্রনেতা ছাত্র নেতৃত্ব থেকে মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। ক্ষমতায় যাওয়া, ক্ষমতায় থাকা, ক্ষমতা ভোগ করা, নীতিহীন লোকদের বড় বড় সরকারি পদে আসীন হওয়ার জন্য তখন অনেকে ওই ছাত্র নেতাদের দ্বারস্থ হয়। শোনা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় অনেক শিক্ষক কেবল অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্যে তখন ওই ছাত্র নেতাদের বাসায় বাসায় ধরনা দেন। এভাবে ছাত্র রাজনীতি পরিণত হয় কেন্দ্রীয় রাজনীতির অংশ বিশেষ।

ধীরে ধীরে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতি হয়ে পড়ে মূল রাজনীতির জুনিয়র পার্টনার থেকে Equal partner-এ। ছাত্র রাজনীতিকে তখন মূলদলের রাজনীতির জন্যে সন্ত্রাস পরিচালনার জন্যে, চাঁদা সংগ্রহ, এক কথায় অর্থশক্তি-সন্ত্রাস এর আয়োজনে ছাত্ররাজনীতিই মুখ্য রাজনীতিতে পরিণত হয়। আর এরমধ্যে যে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় তা হচ্ছে ছাত্ররাজনীতি Equal partner হলেও ক্ষমতায় ভারসাম্যে সে সময়ে ছাত্র সংগঠনের শক্তি বেশি বলে প্রতীয়মান হয়।

১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের (যেখানে ঢাকার ছাত্রসমাজের প্রধান ভূমিকা ছিল) পর ছাত্র রাজনীতির ওপর মূল রাজনৈতিক দলগুলোর নির্ভরতা আরো বাড়তে থাকে। গণঅভ্যুত্থান ছাড়াও ওই বছরের সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় প্রায় সকল স্থানে ছাত্রনেতারা মূল ভূমিকা পালন করে। আবার একইভাবে নির্বাচনের পরও নিজ নিজ দলে বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলে স্বীয় ক্ষতাকে সুদৃঢ় করার জন্য জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ছাত্র নেতাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এভাবে ছাত্র নেতারা সরকারি গাড়ি, সরকারি অফিসের টেলিফোন, রেস্ট হাউসসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে দেখা য়ায়। অনেক জায়গায় ছাত্র সংগঠনের মিটিং বা আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদি সার্কিট হাউস বা সরকারি রেস্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতির তোয়াক্কাও তারা করেনি। শোনা যায় কয়েকজন ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী হওয়ার চেষ্টাও করে কিন্তু কৌশলগত কারণে তখন কাউকে মনোনীত করা হয়নি। তবে অনেকে কোনো কোনো মনোনীত প্রার্থীর চেয়েও বেশি ক্ষমতা ভোগ করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্তত প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন Equal partner হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি এভাবে উর্ধ্বমুখী গতি (Upward mobility) লাভ করার ফলে একদিকে যেমন তা প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, এটি অতীতের গণমুখী চরিত্র প্রায় বিনষ্ট করে ফেলেছে। কবি নজরুল ইসলাম একদা বলেছিলেন, মার খাইবার মতো পিঠ এবং ক্ষুধা সইবার মতো পেট একমাত্র ছাত্র সমাজের রয়েছে। অর্থাৎ সর্চোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার মতো ক্ষমতা কবেল ছাত্র সমাজের রয়েছে। বর্তমানে সে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তবে এখন যেটি বেশি দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে ছাত্ররা মার খাওয়ার পরিবর্তে দেদারছে মার দিচ্ছে (মার খাচ্ছেও) আর শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই শোষকের ভূমিকার অবতীর্ণ হয়েছে। আগামী দিনেও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতি চালু থাকলে এ ছাত্র রাজনীতির কদর বাড়বে বৈ কমবে না। কেননা অবৈধভাবে কিংবা স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, দুর্নীতি করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে এ ধরনের সংগঠিত শক্তির প্রয়োজন। তাই এখন ছাত্র রাজনীতি আগের

Dhaka University Institutional Repository

মতো আর শিক্ষামুখী নয় স্বার্থমুখী, গণমুখী নয় ক্ষমতামুখী। স্বৈরতন্ত্র ছাত্র রাজনীতিতে শুধু অর্গল পরিয়ে দেয় না, মানুষের সকল সম্ভাবনার দ্বারকে রুদ্ধ করতে উদ্যত হয়।

বইপত্র, কাগজের মূল্যবৃদ্ধি; বেতনবৃদ্ধি, বাস-ভাড়াবৃদ্ধি; পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে অনিয়ম, দুর্নীতি, শিক্ষা বোর্ডের কেলেঙ্কারী; সেশনজট; শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম; বেকার সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ছাত্ররা তেমন জোরালো আন্দোলন করে না। আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এখনকার ছাত্র রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। গণতন্ত্র, আইনের শাসন শোষণ-নির্যাতন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, ছাত্রদের শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা যেমন শিক্ষা উপকরণের দাম, বেতন বৃদ্ধি, ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্র রাজনীতির যেন আর কোনো ভূমিকা নেই। প্রায় সব ক্ষেত্রে তারাই বিভিন্ন গণবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। তীব্র বেকারত্ব ছাত্র রাজনীতিকে বৈষয়িক দিকে ধাবিত করছে বলে মনে হয় কিন্তু তারা বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য কোনো আন্দোলন করছে না। তাদের আচরণ থেকে মনে হয় বেকার সমস্যার সমাধান হলে ছাত্র রাজনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

ছাত্র রাজনীতি তার অতীতের গণমুখী ঐতিহ্য হারিয়ে ক্ষমতামুখী হয়ে পড়ছে। সম্পদ আহরণের চমৎকার প্লাটফর্ম হচ্ছে এ ছাত্র রাজনীতি। এভাবে দেশে এক নতুন নেতিবাচক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জনতার সামনে ছাত্র রাজনীতি পরিচিতি পাচ্ছে। প্রতি পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায়, গ্রামে-গ্রামে, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, সকল জায়গায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে কোনো না কোনো স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির। বাংলাদেশে স্বৈরাচার কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে (From centre to periphery) ছড়িয়ে পড়ছে। ছাত্র রাজনীতি ইতিমধ্যে এ ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান ধারায় ছাত্র রাজনীতির সুবাদে তাই আজ আর ছাত্র নেতারা শুধু ছাত্র নেতা (Student leader)

নয় তারা হয়ে উঠছে ক্ষমতাবান এলিট (Power elite)। এ ধারা আরো দীর্ঘদিন অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয় কারণ ছাত্রদের যে অসীম ক্ষমতা তা ইতিবাচক কাজে ব্যবহারের কোনো প্রচেষ্টা জাতীয় নেতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে যারা ক্ষমতায় যাচ্ছে তারা সে ছাত্র সমাজের কল্যাণের জন্য তেমন কোনো কর্মসূচি নিতে দেখা যাচ্ছে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রয়েছে মিষ্টি কথা (lovely words) এবং কুৎসিত কাণ্ড (Ugly facts) দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা দেখে দেশের বেশিরভাগ লোকই নৈরাশ্য প্রকাশ করে। তাদের অনেকে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এ কথা বিশ্বাস করতেও নারাজ। কিন্তু অতীত অর্জন করা যায়নি। সেটি যে ভবিষ্যতে অর্জন করা যাবে না এমনটা সকলে ভাবেন না।

যাহোক, বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর চিন্তাবিদ রয়েছেন যাদের এক শ্রেণী মনে করেন, দেশের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার এবং আরেক শ্রেণী মনে করেন, এদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যারা দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে করেন তাদের যেমন যুক্তি রয়েছে তেমনি যারা এ দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে করেন তাদেরও তেমনি যুক্তি রয়েছে। যারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে ভাবেন বা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যর্থতাকে এর মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেন। আর যারা এর ব্যতিক্রমটি দেখতে পান তারা এ দেশের মানুষের অফুরন্ত সম্ভাবনার কথা বলেন। তারা মনে করেন, সমাজ বিকাশের কোনো একক গাণিতিক হার বা নিয়ম নেই। যখনই কোনো একটি দেশের জনগণ তাদের সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পারবেন তখনই সে দেশের উন্নয়নে বিস্ময়কর সব সাফল্য দেখা যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে সেক্ষেত্রে রাজনীতিকদের করণীয় কিছু রয়েছে কি

Dhaka University Institutional Repository

না? রাজনীতিকরা সেজন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন যার মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠী তাদের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারবেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনীতিকরা কিছুটা হলেও জাতিকে সেদিকে নিয়ে যাচ্ছেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে যে কারণগুলো বিশেভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা হচ্ছে-

- দেশে সরকার নিবার্চনে যথেষ্ট স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সরকারের জবাবদিহিতা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- রাজনৈতিক দলের আচরণে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অনেক বেড়েছে।
- জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক আচরণের চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সরকার ও প্রধান প্রধান বিরোধী দলকে গণতান্ত্রিক আচরণে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করছে।
- গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে গণমুখী কর্মকাণ্ডের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ক্ষমতা প্রয়োগকে আইনের অধীন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
- সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পেয়েছে।
- আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত রাখার প্রতি সমর্থন বেড়েছে।
- রাষ্ট্রের সকল স্তরে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা কমবেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে অনেক লোকই আছে যাদের কথার প্রশংসা করা যায় কিন্তু খুব কম লোকই আছে যাদের কাজের প্রশংসা করা যায়। যাদের কাজের প্রশংসা করা না যায় তারা যদি রাষ্ট্র পরিচালানার দায়িত্ব পান বা গ্রহণ করেন তাহলে হয়তো জনগণ একটি উত্তম সরকারের সফল বাস্তবায়ন দেখবেন। সে আশা এখনো এদেশের মানুষ পোষণ করে। মানুষের সে আশা একদিন সমাজবিকাশের চক্রের নিয়মেই বাস্তবায়িত হবে। তাই বলা চলে এদেশের অতীত অন্ধকার হলেও কিংবা বর্তমান মেঘাচ্ছন্ন হলেও ভবিষ্যৎ আলোকময় হবে আশা করা যায়।

অনেক সময় বলা হয়, সরকার নির্বাচিত হলেই গণতান্ত্রিক হবে এমন কোনো কথা নেই যদিও তা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক সরকার হয় না কেন?... কোনো একটি সরকার নির্বাচিত সরকার হলেও সেটি জনগণের সরকার বা গণতান্ত্রিক সরকার হবে কি-না তা নির্ভর করে প্রধানত সে দলটির মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা রয়েছে কি-না? যদি দলের এবং দেশের সকল বিষয়ে সমষ্টি নয় ব্যক্তি-সিদ্ধান্তেই প্রধান হতে দেখা যায় তাহলে সেটি গণতান্ত্রিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সমাজের সকলের কল্যাণ করতে গেলে কোনো একটি সরকারের একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা করা সম্ভব নয় কিন্তু সরকার যদি গণতান্ত্রিক না হয়, তাহলে সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষ থেকে তেমন কোনো উৎসাহ থাকে না। সরকারের ভালো কর্ম করার ইচ্ছা একক কিন্তু ক্ষমতা সামগ্রিক কারণ ভালো কর্ম করার ক্ষমতায় সরকারি দলের নেতাকর্মি ও আমলারা ছাড়াও সকল স্তরের জনগণের অংশগ্রহণের প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, একটি দেশে গণতন্ত্র শুধু সরকারেরই আচরণ পরিবর্তন করে না, জনগণের আচরণ পরিবর্তনেও সাহায্য করে।

গণতন্ত্র উন্নয়নের অনুকূলে না প্রতিকূলে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গণতন্ত্র সামাজিক গতিশীলতার পূর্বশর্ত না সামাজিক গতিশীলতা গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত?... কেউ

Dhaka University Institutional Repository

কেউ মেন করেন, যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই সেসব দেশেও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে যেমন কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কুয়েত, সৌদি আরব প্রভৃতি। আবার যেসব দেশে গণতন্ত্র বা তথাকথিত গণতন্ত্র রয়েছে সেসব দেশেও এখনো উন্নয়ন ঘটেনি, যেমন ভারতের কথা বলা যেতে পারে। সে দেশে শুরুতে গণতন্ত্র থাকার পরও আজও অনুন্নত বিশ্বের একটি অন্যতম দেশ। আবার পাকিস্তান যেখানে গণতন্ত্র এখনো আঁতুড় ঘরে সেখানে প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় ভারতের চেয়ে বেশি। আবার চীনে গণতন্ত্র না থাকলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ভারতের চেয়ে বেশি। ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র না থাকলেও সেখানকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার ভারতের চেয়ে বেশি। সুতরাং গণতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক অনুকূল হলেও সেটি পূর্বশর্ত কি না সে কথা বলা যাবে না। গণতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক অনুকূল আবার স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক অনুকূল এবং প্রতিকূল দুটোই রয়েছে। গণতন্ত্র সকল সময় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে না পারলেও উন্নয়নকে ব্যাহত করেছে এমন নজিরের কোনো অভাব নেই। তাই যা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা হচ্ছে- গণতন্ত্র উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য না হলেও তা বস্তুগত উন্নয়নকে টেকসই ও অর্থবহ করার জন্য তথা অর্থবহ জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য। গণতন্ত্রের মাধ্যমে উন্নয়ন যদি নাও আসে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র আসা একান্ত অপরিহার্য। উন্নয়ন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাই গণতন্ত্রের দাবি সোচ্চার হতে থাকে।

অনুন্নত দেশে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কতোটা অপরিহার্য তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়ছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে Michel M. Cernia (1978:11) যথার্থই বলেন "Highyielding social organizations are not less important for development than high-yielding crop varieteis, and intensified agiculture cannot occure without intensified human organizations."

(উচ্চ ফলনশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান উচ্চ ফলনশীল শস্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং গভীর ফসল চাষ ঘন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া সম্ভব নয়)। তেমনি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি না থাকে তাহলে উন্নত ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রায় অসম্ভব।[৬] *মোঃ জাহিদুল ইসলাম জিনু, সন্ত্রাস দমনে খালেদা জিয়া। কেকা প্রকাশনী, ঢাকা -২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-২৩৫-২৪৬।*

তথ্যনির্দেশিকা

১। *প্রফেসর ড. মোঃ খলিলুর রহমান, সমকালীন রাজনীতি ও আজকের বাংলাদেশ। এশিয়া পাবলিকেশন ঢাকা-২০০২। পৃষ্ঠা-৪৭-৫০।*

২। *জার্নাল বিচিত্রা, জানুয়ারি-জুন, ১৯৯৭ইং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৫ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২১-২২।*

৩। *জার্নাল বিচিত্রা, মার্চ- জুন-১৯৯৩ইং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৩।*

৪। *ড. তারেক শামসুর রহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির এক দশক। গ্রন্থমেলা প্রকাশনা, ঢাকা ২০০৩ইং । পৃষ্ঠা-১১-১৪।*

৫। *রাশেদ খান মেনন,রাজনীতির কথকতা। মৃদুল প্রকাশনা, ঢাকা ২০০০ ইং। পৃষ্ঠা - ১০১-১০৪*

৬। *মোঃ জাহিদুল ইসলাম জিনু, সন্ত্রাস দমনে খালেদা জিয়া। কেকা প্রকাশনী, ঢাকা -২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা-২৩৫-২৪৬।*

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

• সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ঃ

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখে নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে বিমান হামলার পর থেকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য অনেক পদক্ষেপ দুনিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে এসব কথাবার্তা ও পদক্ষেপের কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশ তার প্রশাসন ও তাদের পশ্চিমা মিত্রশক্তিসমূহ।

ওসামা বিন লাদেনকে তারা ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার প্রধান সন্দেহভাজন বলে ঘোষণা দিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের এক মহাকর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাদের এ কর্মসূচির প্রধান দিক হলো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। ১১ সেপ্টেম্বরয়ের সন্ত্রাসী হামলা কারা করেছে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারলেও অথবা যারা এ কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করার পর সেটা প্রকাশ্যে উপস্থিত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সম্ভব না হলেও এ পরিস্থিতির সুযোগ তারা পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী বোমা হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধোজোটকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানের ওপর শুরু করেছে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় এক ব্যাপক হামলা।

লক্ষ্য করার বিষয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকের দুনিয়ার সব থেকে বড় ও বিপজ্জনক সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ায় এবং তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেপরোয়াভোবে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে যাবার কারণে শুধু একটি দুটি দেশের জনগণই নয় অসংখ্য দেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে। তাদের সকলেরই সব থেকে বড় আন্তর্জাতিক শত্রু হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কাজেই অবাক হওয়ার কিছু নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ আছে এবং অনেক দেশেই তাদের দূতাবাসসহ বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর ওপর সশস্ত্র হামলা করছে। এসব হামলাই হলো মার্কিন হামলার প্রতিক্রিয়া। এ হামলার শর্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেরাই সৃষ্টি করেছে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাত দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের সামরিক হামলা করলেও তাদের এ হামলা যে আফগানিস্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এটা তারা প্রথম থেকেই বার বার ঘোষণা করছে। কারণ ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা গ্রুপ আফগানিস্তানের বাইরে অনেক দেশে ছড়িয়ে আছে, কাজেই তাদের শায়েস্তা করার জন্য অন্যান্য দেশের ওপরও হামলা করা প্রয়োজন। যেসব দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সামরিক হামলা এবং সে সঙ্গে অর্থনৈতিক শাস্তির তালিকায় এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে- সেগুলো সবই হলো তাদের অবাধ্য রাষ্ট্র ইরাক, ইরান, সিরিয়া, সুদান, সোমালিয়া, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি। কাজেই প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসবাদ দমনের সঙ্গে এ সম্ভাব্য মার্কিন সামরিক হামলার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে সেসব দেশে তেল ও গ্যাসসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রকম অর্থনৈতিক স্বার্থের। এক কথায় তাদের লুণ্ঠন স্বার্থের।

১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের যুদ্ধজোট যেভাবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অন্য অনেক দেশই নিজেরা অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সন্ত্রাসবিরোধী আইন নতুনভাবে প্রণয়ন ও জারি করে নিজেদের দেশে তাদের প্রতিপক্ষকে সশস্ত্রভাবে আক্রমণ ও জব্দ করার প্রস্তুতি শুরু করেছে। এসব দেশের মধ্যে আমাদের প্রতিবেশি ভারতের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মীয় ফ্যাসিস্টদের বিজেপি সরকার একেবারে প্রথম সারিতে।

Dhaka University Institutional Repository

বিগত অক্টোবর মাসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের মন্ত্রিসভা সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য একটি আইনের খসড়া অনুমোদন করেছে। ১৭ নভেম্বর ভারতের ২৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের একসভায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বলেন, ভারত সন্ত্রাসবাদীদের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে তালিকার শীর্ষে আছে কিন্তু সে আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। কাজেই তার জন্য প্রয়োজন নতুন আইন। তিনি কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর উল্লেখ করে বলেন, ওইসব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া দরকার। তিনি বলেন, ১১ সেপ্টেম্বরের পর অনেক দেশই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ভারতের বামপন্থী দলসমূহ এবং কংগ্রেস বাজপেয়ী সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এ আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করছে। তাদের বক্তব্য হলো, বিশ্ব পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিজেপি সরকার কুখ্যাত Terrorist and Disruptive Activities নতুন নামে পুরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। POTO হলো ICI এর নতুন সংস্করণ। ১৯৯৫ সালে ICI এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর প্রবল বিরোধিতার মুখে সেই দানবীয় আইনটির নবায়ন আর সম্ভব হয়নি। এখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে এবং ভারত মার্কিন সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ার কারণে বিজেপি TADA- এর অভাব POTO এর দ্বারা পূরণ করার চেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে।

এ প্রস্তাবিত আইনের আসল লক্ষ্য হলো, কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনগণের ওপর আরো নিষ্ঠুর ও বড় আকারে সশস্ত্র হামলা পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে সহায়তার জন্য হাত বাড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা ভারতের এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে এখন তাদের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যা ঘটছে তার জন্য জাতিগত নিপীড়নকারী কেন্দ্রীয় ভারত সরকারই দায়ী। তারা প্রথম থেকেই এসব অঞ্চলের জনগণের ওপর যে বিরামহীন নিপীড়ন চালিয়ে আসছে তার প্রতিক্রিয়াতেই উত্তরের রাজ্যগুলোতে ব্যাপক আকারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হচ্ছে। এসব গণতান্ত্রিক আন্দোলন হচ্ছে। এসব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সশস্ত্র হামলা ও নির্যাতনের প্রতিক্রিয়াতেই সরকারের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। কাজেই এগুলোকে সন্ত্রাসবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করার কোনো যৌক্তিকতা অথবা গ্রাহ্যতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারত সরকার যা করছে তার থেকে বিশুদ্ধতম সন্ত্রাসবাদ আর কিছুই নেই। এ রাজ্যের জনগণ ১৯৪৭ সাল থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ভারত ও পাকিস্তান সরকারের বিবিধ রকম চক্রান্তের শিকার হয়ে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছে। কাশ্মীরকে জবরদস্তিমূলকভাবে ভারত ও পাকিস্তান নিজেদের অধিকারভুক্ত দেশ হিসাবে দাবি করে প্রত্যেকেই তার অংশ বিশেষ দখল করে আছে। এরা উভয়ই হলো কাশ্মীর দখলকারী শক্তি। কাশ্মীরের জনগণ আসলে ভারত ও পাকিস্তান কোনো রাষ্ট্রেরই অঙ্গরাজ্য হিসাবে না থেকে কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেই দাবি করে আসছেন। তার জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেখানে গণভোটেরও প্রস্তাব জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু নেহরুর কংগ্রেস সরকার তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও অল্পদিনের মধ্যেই সামরিক হামলা চালিয়ে কাশ্মীর দখল করার পর গণভোটের বিষয়টি শিকেয় তুলে সেখানে নিজেদের সম্পূর্ণ অবৈধ দখল কায়েম করেছে এবং সে দখলদারী তাদের এখনো আছে। কাজেই কাশ্মীরে ভারত সরকার জবরদস্তিমূলকভাবে নিজেদের দখল কায়েম রাখার জন্য সশস্ত্রভাবে জনগণের ওপর চেপে বসে আছে এবং তাদের ওপর নিয়মিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারত সরকারই হলো কাশ্মীরে সব থেকে বড় সন্ত্রাসবাদী শক্তি এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই তারা এ সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাশ্মীরী জনগণ যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করছেন তার ওপর সশস্ত্র সংগ্রাম। কাজেই কাশ্মীরে যাচ্ছে তাকে সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আখ্যায়িত করা পুঁজিবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শয়তানি ছাড়া আর কিছুই নয়। সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কিত ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই নিজেদের স্বার্থে কাশ্মীরে স্বাধীনতার যে লড়াই হচ্ছে তার সঙ্গে মুসলমানিত্ব বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্ক ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই আরোপ করেছে। কাশ্মীর মুসলমান প্রধান অঞ্চল কাজেই সেটা পাকিস্তানের মধ্যে আনা দরকার, এ যুক্তি দেখিয়ে পাকিস্তান সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করছে এবং সেখানকার কিছু ধর্মীয় সংগঠনকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিজেদের সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের ও সেখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত সরকারও কাশ্মীরী জনগণের স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে পাকিস্তানি এজেন্টদের কাজ এবং সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে সেখানে নির্বাচিত সরকারের আড়ালে এক সামরিক শাসন জারি রেখেছে এবং নিয়মিতভাবে সেখানে কাশ্মীরদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিরাট সংখ্যায় হত্যা করছে এবং নানাভাবে তাদের ওপর নির্যাতন জারি রেখেছে। এখন POTO নামক এক নতুন সন্ত্রাসবিরোধী আইন পাস করে তারা কাশ্মীরী জনগণের ওপর নতুন উদ্যমে আরো কঠিন হামলা পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কেও এ একই কথা। নাগা, মিজো ইত্যাদি জাতি বরাবরই ছিল অভারতীয় স্বাধীন জাতি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ওপর সামরিক আক্রমণ চালিয়ে তাদের দেশকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের অধীনস্থ করেছিল এবং ১৯৪৭ সালে ভারত ছাড়ার সময় তারা ওই অঞ্চলগুলোকে স্বাধীনতা না দিয়ে ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত রেখেই বিদায় নিয়েছিল। সেই থেকেই ভারতের এ উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জাতি নিজেদের আবাসভূমিতে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। কাজেই সে সংগ্রামের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতীয় দখলদারিত্বের বিরুদ্ধেই সে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে সশস্ত্র সংগ্রাম। এ সংগ্রামে দখলদারী ও সেখানকার জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর সশস্ত্র আক্রমণেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এসব সশস্ত্র তৎপরতা নিজেদের আক্রমণেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু এসব সশস্ত্র তৎপরতাকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়া হিসেবে না দেখে ভারত সরকার তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে নিষ্ঠুরভাবে দমন করে আসছে। সন্ত্রাস বিরোধিতার অজুহাতে POTO নামে নিপীড়নমূলক আইনের প্রস্তাব তারা করেছে এবং যে আইন তারা শেষ পর্যন্ত তাদের পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নেবে সেটা কাশ্মীরের মতোই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও তাদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আরো কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের হাতকে আইনগতভাবে জোরদার করবে। তাই এ আইন হলো

Dhaka University Institutional Repository

ভারত সরকার কর্তৃক সে দেশের জনগণের ওপর এবং সে সঙ্গে স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন জাতির ওপর সন্ত্রাসী হামলাকে আইনসিদ্ধ করারই এক পৈশাচিক প্রচেষ্টা।

সন্ত্রাসবাদের অনেক চেহারা। বাংলাদেশের যে সন্ত্রাসী তৎপরতা দেখা যায় সেটার মূল ভিত্তি এ দেশের শাসক শ্রেণীর তৎপরতার সঙ্গে সম্পর্কিত। ১৯৭২ সাল থেকে চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ইত্যাদির মাধ্যমেই বাংলাদেশের নতুন শাসক শ্রেণী গঠিত হয়েছে এবং এভাবে গঠিত হতে গিয়ে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ সন্ত্রাস যে শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবেই করা হয়েছে তা নয়। শাসক আশ্রয় নিতে হয়েছে। এ সন্ত্রাস যে শুধু রাষ্ট্রীয়ভাবেই করা হয়েছে তা নয়। শাসক শ্রেণীর লোকেরা নিজেরা বেসরকারি ব্যক্তিগত পর্যায়েও এ সন্ত্রাস করে আসছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হলেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ের এ সন্ত্রাসী আসছে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হলেও, ব্যক্তিগত পর্যায়ের এ সন্ত্রাসী তৎপরতার ব্যাপকতা সরাসরি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী তৎপরতার থেকে অনেক বেশি। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসও যথেচ্ছ খুন-খারাবি প্রথম থেকেই চলে আসার ফলে এ ধরনের কার্যকলাপে সাধারণভাবে বিপুল এবং উত্তরোত্তর সংখ্যায় মানুষ অভ্যস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানে লোকসংখ্যা বিশাল আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিকাশ সেই তুলনায় কিছুই হয়নি। বেকারত্ব এখানে এমনভাবে সীমিত। এ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক পর্যায়ের চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন কমে না এসে সেটা আরো বড় আকারে হচ্ছে এবং তার প্রয়োজনে সন্ত্রাসের ব্যবহারও হচ্ছে ক্রমবর্ধমানভাবে। বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে সন্ত্রাসী তৎপরতা ছিনতাই, লুণ্ঠন, হত্যা যেভাবে বিস্তারলাভ করেছে এবং যতো বর্ধিত আকারে ঘটছে তাতে একথা অনায়াসে বলা চলে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী তৎপরতার দিক থেকে বাংলাদেশই হলো বিশ্বের নিকৃষ্টতম দেশ। এখানে সন্ত্রাসবাদ শাসক শ্রেণীর ও তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকদের এক বিরাট অংশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

১৮ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে হিসাব দেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গত ১ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর ২৫ দিনে দেশে ২৬৬টি খুন ও ২৩৩টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের জুন পর্যন্ত হয়েছে ১৮ হাজার ৫৬৩টি খুন ও ২২ হাজার ৯২৫টি ধর্ষণের মামলার। (দৈনিক যুগান্তর, ১৯.১১.২০০১) এ তো গেলো মামলার হিসাব। কিন্তু মামলা হয়নি এ রকম ঘটনা যে আরো কত তার কোনো হিসাব নেই হিসাব দেয়া সম্ভবও নয়। পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে বলা চলে, বাংলাদেশই হচ্ছে- এখন সারা বিশ্বের মধ্যে চোর, পকেটমার, লুণ্ঠনকারী, ধর্ষণকারী ও খুনের মতো অপরাধীদের সব থেকে বড় এবং নিরাপদ অভয়ারণ্য। এ অভয়ারণ্য সৃষ্টির মূল কারণ দুটি। প্রথমত এ দেশের শাসক শ্রেণী নিজের গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রথম থেকেই বেপরোয়া হয়ে সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং বেকারত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বেকারত্ব বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সন্ত্রাসকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

কাজেই আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে নিয়ে একটি দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত সব সন্ত্রাসবাদের মধ্যে একটি জায়গায় মস্ত সাদৃশ্য আছে। সেটা হলো এই যে, সন্ত্রাসবাদের জন্ম ও বিকাশের মূল কারণ সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্যে পাওয়া যায় না। সে কারণে আন্তর্জাতিক বা দেশীয় ক্ষেত্রে মূলত লুণ্ঠন, নিপীড়ন ও জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকে। কাজেই সে সমস্যাগুলোর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো দেশ ও সমাজ থেকে ও সে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের কোনো সম্ভাবনা নেই।[১]

[১] বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ। বসুন্ধরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা ২০০৩ ইং। পৃষ্ঠা -১৬৭-১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

• আন্তঃমহাদেশীয় সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক ঃ

জেএমবির নতুন তৎপরতা দেখে এটিই স্পষ্ট হয় যে শায়খ আব্দুর রহমান বা বাংলা ভাইকে ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে ধর্মীয় উগ্রপন্থী এ গোষ্ঠীর কার্যক্রম বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত করা গেলেও বন্ধ করা যায়নি। দেশের নানা প্রান্তে জেএমবির নতুন তৎপরতা এটিই পরিষ্কার করছে, নতুন উদ্যমে তারা সংগঠিত হচ্ছে। পুলিশ ও র‍্যাব প্রায় নিয়মিতই গ্রেফতার করছে জেএমবির নানা স্তরের নেতাকর্মিকে। উদ্ধার করছে বোমা ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের নাইক্ষ্যংছড়ীতে পাওয়া গেছে তাদের একটি বড় ট্রেনিং ক্যাম্প। ধরা হয়েছে যেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি।

এরপরও তুষ্ট হবার সঙ্গত কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না, বিশেষত যখন কোনো যুক্তিযুক্ত ধর্মীয় ভিত্তি এবং গণতান্ত্রিক আস্থাশীলতার ওপর দাঁড়িয়ে এসব জঙ্গি সংগঠানের কার্যক্রম ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের মতো দেশের দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এখানে ধর্মের নামে যে রাজনীতি হয় তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আবার দেশটির স্বাধীনতার মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করে। ফলে সমাজের একটি তাৎপর্যময় অংশকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় দেশ ও জাতির প্রগতিশীল অবস্থান ও পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসকে রক্ষা করার স্বার্থে।

একটি কথা অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে, ১৯৯৯ সালে প্রথম বোমা হামলার মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটার পর থেকে ধর্মীয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর হাতে বাংলাদেশে এ যাবত নিহত, আহত যারা হয়েছেন তার সকলেই প্রগতিশীল সমাজচিন্তার মানুষ। এ আঘাতপ্রাপ্তরা বাংলাদেশের চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ধারক-বাহক এবং আধুনিক সমাজচিন্তার পক্ষশক্তি। আরো সুস্পষ্ট, যে চেতনা ও দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, ধর্মীয় উগ্রবাদীরা মূলত তাকেই আঘাত করছে। ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মের নাম দিয়েও এ উগ্রপন্থীরা সন্ত্রাস এবং অমঙ্গলেরই বার্তাবাহক।

❖ হারুণ হাবীব

বলতেই হবে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে এদের গ্রহণযোগ্যতা তেমন নেই। এরপরও আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বলাই বাহুল্য, এসব সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে কেন, কিভাবে? বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েও নিত্যনতুন উদ্যমে এ ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা মাঠে নামছে কিভাবে?

এখানে উল্লেখ করতেই হয়, বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন কোনো ভূখণ্ড নয়। বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান ভেঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বাংলাদেশ গঠন মোটেও ছোট কোনো আঘাত নয়, ধর্মীয় রাজনীতির ধারক-বাহকদের জন্য। কাজেই দেদারছে এসেছে বাইরের টাকা। বিশেষ করে ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়গুলোতে যে সামরিক ও আধা-সামরিক শাসকেরা বছরের পর বছর বাংলাদেশ শাসন করেছে, তারা নিজেদের স্বার্থেই সচেতনভাবে ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন করেছে। এতে সমর্থন যুগিয়েছে সেসব শক্তি যারা পাকিস্তান ভাঙ্গতে দিতে চায়নি: মুসলমান প্রধান একটি দেশে আধুনিক সমাজব্যবস্থার পত্তন চায়নি। কাজেই সুপরিকল্পিতভাবে দেশি-বিদেশি সমর্থনে ক্যাডারভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে এ দেশের মাটিতে যাতে ১৯৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া সম্ভব হয়। মূলত এসব পরিকল্পনার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে নানা নাম ও বর্ণের জঙ্গি গোষ্ঠী, যারা একদিকে যেমন অর্থবলে বলীয়ান হয়েছে অন্যদিকে অস্ত্রবলেও পিছিয়ে থাকেনি।

আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আসনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী রাজনৈতিক শক্তি সমাসীন। মাত্র নয় মাস বয়স এ সরকারের। এর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা যাই হোক, সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যুক্তিতর্ক যতই চলুক, স্বীকার করতেই হবে, এদের মতো একটি রাজনৈতিক শক্তি সমান

Dhaka University Institutional Repository

বলেই এ দেশকে বাংলাদেশ মনে হয়। কথাটা মোটেও বেশি বলা নয়। সরকারের নীতি-নির্ধারকগণ হয়তো অনেক ব্যাপারেই সাফল্য লাভ করতে পারবেন না, অনেক ব্যাপারেই দক্ষ প্রশাসনিক কর্তৃত্ব দাবি করতে পারবেন না, কিন্তু জাতির তিরিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে তারা দেশটিকে একাত্তর-পূর্ব পাকিস্তানি দর্শনের দিকে ধাবিত করেছেন এরকম অভিযোগ কেউ করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্রগতিশীলতার পক্ষে এ যে দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এমন একটি সরকারকে অস্থিতিশীল করার হাতিয়ার হিসেবে ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের আবার যে ব্যবহার করা হবে না, আবার যে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হবে না, তা কি দিব্যি দিয়ে বলা যাবে?

শুধু দেশীয় জঙ্গি নয়, এবার আলোচনায় এসেছে ভারতীয় উগ্রপন্থী কিছু গোষ্ঠীর নামও। মাস পাঁচেক আগে আব্দুর রউফ দাউদ মার্চেন্ট নামে একজন ভারতীয় জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। খবরে বলা, এ ব্যক্তি মুম্বাই সঙ্গীত জগতের দিকপাল গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে আসামি এবং আন্তর্জাতিক মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের ঘনিষ্ঠ সহচর। দাউদ মার্চেন্ট ভারতের নাগরিক, কিন্তু সে গ্রেফতার হলো বাংলাদেশে।

এরপর বিগত পাঁচ মাসে (সম্ভবত) ছয়জন পলাতক। ভারতীয় জঙ্গি বা সন্ত্রাসী বাংলাদেশের মাটিতে গ্রেফতার হয়েছে। আমাদের পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনে যখনই এসব গ্রেফতারের খবর পরিবেশন করা হয়েছে তখনই বলা হয়েছে, এমনকি গ্রেফতারকৃতরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে, তারা হয় লস্কর-ই- তৈয়বা কিংবা আসিফ রেজা কমান্ডো ফোর্সের সক্রিয়া সদস্য। এরা আরো বলেছে, তারা পাকিস্তান বা আফগানিস্তানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছে, ভারত বা বাংলাদেশে তাদের টার্গেট আঘাত করার লক্ষে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মিডিয়ার বদৌলতে ভারতীয় এ জঙ্গি গ্রুপগুলোর নাম বাংলাদেশের মানুষের বেশ জানা। বিশেষ করে যখনই ভারতের মাটিতে কোনো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটে, অন্তর্ঘাত বা চরমপন্থি সহিংসতা ঘটে, তখনই এসব সংগঠনের সদস্যদের বাংলাদেশের মাটিতে গ্রেফতারের খবর মোটেই সুখকর নয়। বরং এসব খবর আতঙ্কজনক। এসব গ্রেফতার থেকে প্রথমত যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় তাহলো কিছু ভারতীয় নাগরিক, বিশেষত ভারতীয় পুলিশ যাদের খুঁজে থাকে, বাংলাদেশকে তারা নিরাপদ ঘাঁটি মনে করে। আমাদের দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, কোনো দেশই আজ সন্ত্রাস বা সহিংসতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত নয়। বাংলাদেশের নিজস্ব জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দীর্ঘদিন যাবতই ব্যস্ত রাখছে। এরপরও দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান বা ভারতভিত্তিক কিছু জঙ্গি সংগঠনের লোকজন এতদিন নিরুপদ্রব বছরের পর বছর এদেশে বসবাস করে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

নিজেদের জবানিতে গ্রেফতারকৃতদের কেউ কেউ জানিয়েছেন, তারা বছরের পর বছর ধরে, এমনকি পরিবার-পরিজন নিয়ে বাংলাদেশে বসবাস করেছে। এদেশে তাদের আশ্রয় দেয়া বা নিরাপত্তা দেয়ার লোকেরও অভাব হয়নি? এমনকি এসব ভারতীয় চরমপন্থী জাতীয় পরিচয়পত্র এবং বাংলাদেশের পাসপোর্ট পর্যন্ত যোগাড় করেছে। তারা হয় কোনো মাদ্রাসায় চাকরি করেছে নয়তো ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের লেবাসে তাদের তৎপরতা চালিয়ে গেছে। লস্কর-ই-তৈয়বা বা আসিফ রেজা কমান্ডো ফোর্স নামের গোষ্ঠীগুলো কাশ্মীর বা ভারতে তাদের কর্মকাণ্ডে পরিচালিত করে বলে আমরা বুঝেছি। গত বছরের মুম্বাই নগরীতে বড় ধরনের যে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড ঘটানো হলো, কয়েক শত লোকের জীবননাশ করা হলো, তার পেছনেও পাকিস্তানভিত্তিক কোনো সংগঠনের হাত আছে বলে এখন পরিষ্কারার ।

প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান ও ভারতের দ্বন্দ্ব বা বৈরিতার প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহৃত হবে কেন? এতে আমাদের কতটা লাভ? কেন এ অভিযোগ বাংলাদেশকে শুনতে হবে যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় রাজ্যগুলোয় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা যে তৎপরতা চালায় তার

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করা হয়? বাংলাদেশের সরকার বরাবর ভারতীয় এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এরপরও আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সদস্যরা ধরা পড়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের গুলি করেও মারা হয়েছে।

সর্বশেষ ভারতীয় নাগরিককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে তার নাম এমদাদুউল্লাহ বা মাহবুব। এ এমদাদউল্লাহ বা মাহবুব ভারি অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত চালাতে পারে। সে আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। ভারতীয় পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ২০০৫ সালে সে নাকি বাংলাদেশে আসে। এরপর থেকে গোপনীয়ভাবে বসবাস করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মাটি থেকে সে নিয়মিত পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সে দেশ থেকে টাকা পয়সা পাচ্ছে। এসব পুলিশের দেয়া ধৃত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি।

এর আগে গ্রেফতার হয় শাকিল নামে এক ভারতীয় নাগরিক। গ্রেফতার হয় জাহিদ শেখ, মুফতি ওবায়দুল্লাহ, মাওলানা মনসুরসহ অনেকে। পরিবেশিত খবরে দেখা গেছে, এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন জঙ্গি গোষ্ঠীর সদস্য, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মোটকথা, এরা প্রত্যেকেই জিহাদী। ইসলামকে ব্যবহার করে এরা বিশ্ব জয় করতে চায়। এরা আমেরিকা, ভারত গোটা পশ্চিমা বিশ্বকে শত্রু বিবেচনা করে। এমনিক অবাধ গণতন্ত্র, মুক্তচিন্তা ও রাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামোকে পর্যন্ত এরা শত্রু বিবেচনা করে।

কোন মানুষের দর্শন বা চিন্তাচেতনা একান্তই তার নিজের। কে কাকে কতটা বন্ধু বা শত্রু বিবেচনা করবে তা নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী সে নিজে। কিন্তু সে দর্শন বা চিন্তা যখন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং ধর্মীয় আইন এবং নিয়ম শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করে তখন আইনের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কোন চিন্তাচেতনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যখন সহিংস হয়, উগ্র হয় তখন তা আরেক উগ্রপন্থীকে ডেকে আনে। এগুলো হচ্ছে জীবনের স্বাভাবিক গতি, যাকে অস্বীকার করে পার পাওয়া যায় না। মূলত এক রক্তপাত আরেক রক্তপাতকে আহ্বান জানায়। এক সহিংসতা আরেক সহিংসতাকে ডেকে আনে।

আমি কখনই মনে করিনা- যারা নানা উগ্রপন্থী বা জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের কোন যুক্তির ভিত্তি নেই। নিশ্চয়ই আছে এবং তা অনেক ক্ষেত্রে মেনে নিতেও বাধা নেই। কিন্তু যে পন্থায় তারা প্রতিবাদ করে, লক্ষ্যে পৌছার চেষ্টা করে, তাতে শঙ্কিত না হয়ে উপায় থাকে না। এরপরও আমি মনেকরি জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ দমনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগে এ সঙ্কট মোকাবেলা করা যাবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের মতো দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত হতদরিদ্র শ্রেণীর যুব তারুণ্য সহজে জঙ্গিবাদের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই একই সঙ্গে এর সামাজিক বিশ্লেষণ জরুরি। যাই হোক, দৃশ্যতই দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের মাটিতে নিয়ন্ত্রিত হয় এমন কিছু সংগঠনের ভারতীয় কিছু সদস্য বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক গ্রেফতারগুলো তার প্রমাণ। শুধু তাই নয়, একটি ত্রিদেশীয় নেটওয়ার্কও কমবেশি গড়ে উঠেছে এদের কারও কারও মধ্যে। সাম্প্রতিক গ্রেফতারগুলো পুরস্কৃত হয়েছে। এ গ্রেফতারকৃতরা বাংলাদেশে বসেই নিয়মিতভাবে পাকিস্তানের মূল নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। আরো আতঙ্কের ব্যাপার হচ্ছে, এসব জঙ্গিকে আবার হরকাতউল-জিহাদের মতো বাংলাদেশেরও কিছু জঙ্গি সংগঠন পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতের মাঝ দিয়ে পাকিস্তান পৌছা এমন সঙ্কট কিছু নয়। তথ্য প্রযুক্তি বা যোগাযোগের এতই আধুনিকায়ন হয়েছে যে, যেকোনো মানুষ অতি সহজেই এখন যে কোন দেশ থেকে আরেক দেশের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এবং এক মুহূর্তে পৌছে যেতে পারে।
আমার বিশ্বাস, রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারক এবং তাদের প্রশাসনযন্ত্রকে দেশীয় সন্ত্রাসের এ আঞ্চলিকীরণের দিকে নজর দিতে হবে। জঙ্গি বা সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্র যেন সীমিত থাকে সে

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। কিন্তু জঙ্গিকে গ্রেফতার মধ্যে সাফল্য আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু আত্মতুষ্টির বিশেষ সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না।[২] *সন্ত্রাসীদের বিদেশীয় নেটওয়ার্ক, ১১ই অক্টোবর ২০০৯, দৈনিক জনকণ্ঠ।*

❖ সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার তথা সার্কভুক্ত আটটি দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমশই ঘোলাটে ও বৈরি করে তুলছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সার্কভুক্ত দেশগুলোকে পারস্পরিক বিরোধে ঠেলে দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসীগ্রুপ কোনো দেশের সরকারের কোন নিজস্ব সংগঠন না হলেও সন্ত্রাসী গ্রুপের কোন দেশে আক্রমণের দায়ভার সন্ত্রাসীদের সরকারের ওপর বর্তায় আর তারাই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় একদেশ অপরদেশের সঙ্গে পারস্পরিক ভুলবুঝাবুঝি এবং দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। যার সামগ্রিক প্রভাব দুদেশের রাজনীতি ও আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদকে মারাত্মভাবে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন; মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার জন্য পাকিস্তানের সরকারকে দায়ী করে ভারত সরকার বিভিন্ন উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করে এবং ভারত ও পাকিস্তানের কূটনৈতিক রাজনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। এছাড়াও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে দেশটির রাজনীতিকে চরম অস্থিতিশীল করে তুলেছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো দীর্ঘদিন নির্বাসন শেষে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরে মোটর শোভাযাত্রাকালে আততায়ীর বুলেটবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এ হামলার ষড়যন্ত্র ঠেকাতে ব্যর্থ হলে দেশটির জনগণ তাকে ভোটের নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করে তাকে সমুচিত জবাব দেন এবং প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর স্বামী আসিফ আলী জারদারি দেশটির প্রেসিডেন্ট এবং ইউসুফ রাজাগিলানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠনের মধ্যে লস্কর-ই-তৈয়ারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তানে এবং পাকিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সোয়াত উপত্যকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেশটিকে প্রতিনিয়ত অস্থিতিশীল করে রাখছে। অপরপক্ষে ভারত ও তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী হামলার ব্যাপারে তটস্থ থাকে। এরমধ্যে আসামের উলফা গেরিলা সংগঠনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর এ সংগঠনটির হামলা থেকে দেশটির জানমাল ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে দেশটিকে রক্ষা করতে ভারত সরকারকে সেভেন সিস্টার্স খ্যাত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ও পন্য পরিবহনে ভারত সরকারকে বিকল্প নিরাপদ রাস্তা হিসেবে বাংলাদেশের ট্রানজিট ব্যবহারে অধিকতর আগ্রহী হতে দেখা যাচ্ছে। যার বিনিময়ে বাংলাদেশ সরকারকে তাদের গুনতে হবে ১০০০ হাজার কোটি টাকার মতো অর্থ। তবে এর পেছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার রোড ব্যবহারে মাওবাদীদের সন্ত্রাসী হামলার বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের সন্ত্রাসের যে পরিব্যপ্তি রয়েছে তার মধ্যে শ্রীলংকার তামিল টাইগাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গেরিলা সংগঠনের নেতা প্রভাকরণ ভেলুপিল্লাইয়ের নেতৃত্বে সংগঠনটি সরকার গঠন করতে শ্রীলংকার সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটিয়েছে এবং দেশটির অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতিসহ অনেক নিরীহ লোককে অপহরণ করে হত্যাসহ বিভিন্ন জিম্মি নাটকের জন্ম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

❖ ধর্মীয় সন্ত্রাস ও প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম

১৯৯৩ সালের ৩ নভেম্বর বিশ্বের ২০টি রাষ্ট্র থেকে প্রায় ৩০ হাজার মুসলিম পাকিস্তানে সমবেত হন মারকান দাওয়া আর ইরশাদ নামে এক মৌলবাদী সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে । এ সংগঠনের প্রধান সেখানে বলেন, গত বছর কাশ্মীরে আমরা ৩৫ জন সৈন্যকে হারিয়েছি। কিন্তু কাশ্মীরই হল ভারতে ঢোকার দরজা। বসনিয়া এবং প্যালেস্তাইনে যে আন্দোলন চলছে তার সঙ্গে আমাদের যুক্ত হতেই হবে, হিন্দু শাসনের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে সাড়ে ১২ কোটি মুসলিমকে।

১৯৯৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের শ্রীনগরে গ্রেপ্তার হন হরকত উল আনসারি জঙ্গি সংগঠনের পাকিস্তানি প্রধান মুহম্মদ মাসুদ আজহার। তিনি বলেন, কাশ্মীরকে মুক্ত করার জন্য ১২টি দেশ থেকে সেনা এসেছে। আমরা ওদের কারবাইনের উত্তর দেব রকেট লাঞ্চার দিয়ে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এর কিছুদিন পরে জঙ্গিরা একটি ভারতীয় বিমানকে ছিনতাই করে কান্দাহারে নিয়ে যায় এবং মাসুদ আজহারের মুক্তি দাবি করে। ভারত সরকার বিমানযাত্রীদের মুক্তির বিনিময়ে মাসুদকে ছেড়ে দেয়।

বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসের যে খেলা আজ শুরু হয়েছে তার একটা অংশের ভিত্তি হলো মৌলবাদ, যেমন একটা অংশের উৎস হলো ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক শোষন। ধর্মীয় মৌলবাদ ছড়িয়ে আছে শাখা প্রশাখায়, কেউ কম বা কেউ বেশি শক্তিশালী। তবে বর্তমান বিশ্বে সব থেকে এগিয়ে রয়েছে ইসলামিক মৌলবাদ। যাকে বলা হচ্ছে- প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম। এর উৎস মূলত আরব দুনিয়া থেকে, কিন্তু এর বড় সাংগঠনিক ভিত্তি হলো পাকিস্তান এবং এ শক্তি প্রাথমিকভাবে আর্থিক মদদ পায় সেদিন থেকে যেদিন আরব দেশগুলি মালিক হয়ে উঠল পেট্রো ডলারের। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও কৌশলগত কারণে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমকে অর্থ দিয়েছে, অস্ত্র দিয়েছে, মদত ও উস্কানি দিয়েছে। আবার বিরোধও যে ঘটেছে, সেরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। তবে সারাবিশ্বের মধ্যে প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের সব থেকে বড় কর্মভূমি হলো কাশ্মীর।

১৯৮০-র দশকের শেষে সন্ত্রাসবাদের ওপর একটি রিপোর্ট আমেরিকান রিপাবলিকান টাস্ক ফোর্স বলে: For Pakistan, Kashmir constitutes a combination of regional interest and commitment to the Global Islamic Cause.

১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের যে একাদিক্রমিক সংঘর্ষ ঘটে চলে। তার চেহারা এবং মতলব পরবর্তীকালের পরিচয় থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ১৯৭০ এর দশকে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত আধিপত্য হটানোর জন্য আমেরিকা কয়েক হাজার জিহাদিকে অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রশিক্ষণ পাকিস্তানেও চলেছে। সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার পর এ কয়েক হাজার জিহাদির দায়িত্ব অনেকটাই এসে পড়ে পাকিস্তানের ওপর। পাকিস্তান গোটা পরিস্থিতি সামলাতে তাদের মুখ ঘুরিয়ে দেয় কাশ্মীরের দিকে। কাশ্মীর হয়ে ওঠে প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের মৃগয়াভূমি। এবং শুরু হয় ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের ছায়াযুদ্ধ, যার সুচনা ১৯৮৭ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালে আফগান ক্যাম্পে প্রশিক্ষিত হয়ে জঙ্গি সংগঠন জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের প্রথম ব্যাচ ভারতে ঢোকে। এটা প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে ১৯৮৯ সালে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে 'ইসলামাইজেশন অব মিলিট্যান্সি' ঘটানো শুরু হয়, জামাত পরিচালিত প্রায় ৫০টি মাদ্রাসা থেকে শিক্ষিত যুবকদের জঙ্গি বাহিনীতে ঢোকানোর মধ্যদিয়ে। এ প্রক্রিয়া তারপর থেকে চলতেই থাকে। এ সংগঠন জম্মু কাশ্মীরে নানা নাশকতামূলক কাজ করলেও সর্বোচ্চ কর্তাদের কাছে তা যথেষ্ট তীব্র ও নৃশংস মনে হয়নি। জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের গুরুত্ব ক্রমশ কমিয়ে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে তুলে আনা হয় পাকিস্তানপন্থী হিজবুল মুজাহিদিনকে। তৃতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কাশ্মীর ইস্যুর আন্তর্জার্তিকীকরণের প্রয়াসকে এবং বিশ্বের নানা দেশে মুসলিম মৌলবাদীদের সংগঠিত করা ও জঙ্গি সংগঠনগুলির সমর্থনে ও সাহায্যে তাদের এগিয়ে আনাকে।

লন্ডনের সেন্টার ফর ডিফেন্স স্টাডিজ এর তরফে ক্রিস স্মিথ ১৯৯০ এর দশকের গোড়ায় একটি রিপোর্ট তৈরি করেন যার বিষয় ছিল Diffusion of small and light weapons in Pakistan and Northern India. তাতে বলা হয়:

১. মার্কিন কূটনীতিক রবার্ট ওকলে মনে করেন, ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যুদস্ত হয় মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, সব বিষয়ে বেশি মাথা গলানো এবং দ্বিতীয়ত, ম্যাক্রো ম্যানেজমেন্ট। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবেই বিপরীত নীতি নিয়েছেন। অর্থাৎ মাথা না গলানো বা দায়হীনতা এবং মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট। দুর্নীতিগ্রস্ততা ও বন্দুকবাজির সংস্কৃতি এবং চোরাকারবারময় এ অঞ্চলে আগের নীতি একেবারেই অচল।

২. ভারতের লাইন অব কন্ট্রোলের ওপাশে আজাদ কাশ্মীরে বেশকিছু ট্রেনিং ক্যাম্প আছে। সেগুলি চালায় আইএসআই। ক্যাম্পের অফিসাররা হয় তামিল নয় আফগান।

৩. অন্যান্য ইসলামিক রাষ্ট্র, বিশেষত সুদান এবং আফগানিস্তান থেকে যে প্রচুর মুসলিম কাশ্মীরের জঙ্গি ক্যাম্পে ঢুকছে এ বিষয়ে যথেষ্ট উপযুক্ত প্রমাণ আছে।

৪. ১৯৮০-র দশকের গোড়া থেকে কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবি জঙ্গিদের ব্যাপক হারে অস্ত্রশস্ত্র দিতে থাকে আইএসআই।

এ রিপোর্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গাঁটছড়া রবার্ট ওকলের মন্তব্য থেকেই। ইন্ডিয়া টু ডে পত্রিকায় ১৯৯৪ সালের ১৫ মে সংখ্যায় বলা হয়, ওয়াশিংটনে সিআইএ-র আফগান টাস্ক ফোর্সের এক সিনিয়র অফিসার বলেছেন: Bombay was a typical CIA covert operation. It is a watershed for your guys. You are now facing some of the world's most motivated terrorist trained by the world's best subversion experts from the CIA. They won't just shoot the odd soldier from behind the bush. They will actually aim at your financial heart.'

রবার্ট ওকলের এক সাক্ষাতকারের অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। কাশ্মীরকে প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের বিহার ভূমি করে তোলার জন্য দায়ী কে?

ওকলে বলেন ঃ সেটা বলা খুব সহজ নয়। তবে জামাতরা খুবই সক্রিয়। আফগান যুদ্ধের সময় (সোভিয়েতের বিরুদ্ধে) এরা আইএসআইয়ের বাহিনীর একটি অংশ হিসেবে কাজ করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং সরকারিভাবে কোনোও মুভমেন্ট আছে কি না তা বলা কঠিন। আমি বলতে পারব না। আমি শুধু বলতে পারি, অনেক কাশ্মীরীই আমাদের বলেন, ফান্ডামেন্টালিজমের প্রসার এবং পাকিস্তানি এজেন্ট নিয়োগ তাঁদের ক্ষতি করছে। ওকলে স্বীকার করেন, পাকিস্তানি এজেন্ট নিয়োগ তাঁদের ক্ষতি করছে। ওকলে স্বীকার করেন, পাকিস্তানের আইএসআই কার্যত রাষ্ট্রের ভেতরে একটি রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে, তা এতই ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী।

প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম দেশে দেশে সাংগঠনিক চেহারা পেতে শুরু করে মূলত. ১৯৮২ সাল থেকে, আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সেনা সরে যাওয়ার পর সেই সময়ে আফগানিস্তানে সমাবিষ্ট হাজার হাজার জেহাদির হাতে চলে আসে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, এবং আসতে থাকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ পশ্চিমি দুনিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। আইএসআইয়ের প্রাক্তন প্রধান হামিদ গুল ১৯৯৩ সালে জানিয়েছিলেন, কাশ্মীরে জিহাদিদের পুষতে বছরে খরচ হয় ২৫০ কোটি টাকা। এ অর্থের জোগান পরবর্তীকালে যে অনেক বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই, এবং এ অর্থের একটা বড় অংশ আসে মার্কিন সাহায্য থেকে। এছাড়া প্যান ইসলামিক যে ফ্রন্ট গড়ে উঠেছে, সারাবিশ্ব থেকে তাদের অর্থ সংগ্রহের পরিমাণও বিপুল। কারণ মুসলিম সম্প্রদায় ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবী জুড়েই। ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অথচ মুসলিম ইয়ুথ, যার সদর দপ্তর রিয়াদে, এ অর্থ ভান্ডার গড়ে তোলার বিশেষ দায়িত্বে রয়েছে। এদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরের হাবিব ব্যাঙ্কে এবং ইসলামাবাদের ইমিরেট ব্যাঙ্ক ইন্টারন্যাশনালে।

অর্থ সংগ্রহের আর একটা বড় উপায় হলো ড্রাগ চোরাচালন, মূলত হেরোইন। সমগ্র পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং আফগানিস্তান হলো এ চোরাচালানের বড় ঘাঁটি। এখান থেকেই ড্রাগ ছড়িয়ে পড়ছে নানা ভূভাগে। তাছাড়া এ মাটিতে গাঁজা ও আফিমের চাষ ও প্রচুর প্রত্যেকটি জঙ্গি সংগঠন এ কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আর্থিক কারণেই। এদের প্রত্যেক সদস্যই একদিকে যেমন বন্দুকবাজ তেমনই অন্যদিকে ক্যারিয়ার। তবে এ অর্থ জোগানের ব্যাপারে বিরাট জায়গা নিয়েছে আইএসআই। আইএসআই বা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স একদিকে যেমন অস্ত্রের চোরাচালানদার, জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক, তেমনই মাদকের সব থেকে বড় কারবারি। তার অর্থ সংগ্রহের সম্পূর্ণ পদ্ধতি আজও অজানা। এ আইএসআইয়ের জন্ম পাকিস্তান সরকারের হাতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে, কিন্তু এ আইএসআই হলো এখন পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রনে, তার এক হাতে রয়েছে পাক সেনাবাহিনী, অন্য হাতে ইসলামিক মৌলবাদীরা এবং তার প্রত্যক্ষ সংযোগ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআই এরসঙ্গে, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে ।

প্যান ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রথম ইস্যু প্যালেস্তাইন, তারপর বসনিয়া, তারপর কাশ্মীর। কাশ্মীরকে আন্তজার্তিক ইস্যু করে তোলার মধ্যদিয়েই এরা অনেকটা দ্রুত এগিয়ে গেছে।

প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটি নিয়ে যথেষ্ট তাত্ত্বিক বিতর্ক আছে। কারও কারও মতে, এটা সম্পূর্ণভাবেই একটি পশ্চিমী কৌশল, ফান্ডামেন্টালিজম শব্দ দিয়ে ইসলামকে সংকীর্ণ করে তোলা। ইসলামের মধ্যে মৌলবাদ ও অমৌলবাদ এ রকম বিভাগ বা বিভেদ নেই। আমেরিকান ক্রিশ্চিয়ান ফান্ডামেন্টালিজম আছে, কিন্তু ইসলামের অন্তর্গত কোনও গোষ্ঠী একে অপরকে মৌলবাদী আখ্যা দেয় না। এ ব্যাখ্যাকারদের মতে, মসজিদের মধ্যে ইসলামের কথা বললে ধর্ম, বাইরে বললেই মৌলবাদ, এ প্রচার ভুল এবং যেখানেই মুসলিমরা বাঁচার জন্য লড়াই চালিয়েছে সেখানেই তাঁদের মৌলবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা সে আলজিরিয়া বা মিশর, প্যালেস্তাইন বা কাশ্মীর, মিন্দানাও বা বসনিয়া যেখানেই হোক না কেন। এটা হলো ক্যাথর্মিজমের নবপাঠ। বেশকিছু বছর আগে মার্কিন সিনেটর ম্যাককার্থির সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্বের

Dhaka University Institutional Repository

নবব্যাখ্যা। এদের মতে, ইসলামী ফান্ডামেন্টালিজম না বলে এটাকে বলা উচিত ইসলামিক রিভাইভালিজম বা ইসলামি পুনরুত্থানবাদ। ইসলামকে ইউরোপ চিরদিনই ভয় করে এসেছে, এমনকি অন্ধকার যুগের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে সুবিশাল সভ্যতা গড়ে তোলার পরেও, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দির ধর্মযুদ্ধের সময়ও সে এ ভীতি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। পরবর্তীকালেও নয়। উপরন্তু, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মুসলিম শক্তি ও সংহতি হয়ে দাঁড়ায় বড় ত্রাস। বিশেষ করে সিরিয়া, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশে পট পরিবর্তনের পর, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। তাই তার বিরুদ্ধে শুরু হয় পরিকল্পিত প্রচার।

এ যুক্তি যাঁদের তাঁরা আরো মনে করেন, এই ইসলামিক রিভাইভালিজমকে মূলত; পশ্চিমি দূরবীন দিয়ে দেখানো হয় বলেই তা ফান্ডামেন্টালিজমে পরিণত হয়েছে এবং সংকীর্ণ করতে করতে তাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দাঙ্গা, হত্যাকাণ্ড, বিমান ছিনতাই তথা সন্ত্রাসের সমর্থবোধে। ক্রিশ্চিয়ান ফান্ডামেন্টালিজমেও সন্ত্রাস আছে, হিন্দু ফান্ডামেন্টালিজমেও আছে, কিন্তু সেগুলিকে বড় করে দেখা বা দেখানো হয় না। লুইস এস আর ব্যাস তাঁর কিং অব টেরর বইতে লিখেছেন: বর্তমানে ইসলামিক পুনরুত্থানবাদের সব থেকে বড় প্রচারক বা বাহক হলো ইজিপ্ট বা মিশরের ইখওয়ান অল মুসলিম এবং পাকিস্তানের জামাত-ই-ইসলামি। এদের কাজ হলো শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা।

এ অমৃতভাষণ যে, সত্য থেকে কতটা দূরে অবস্থান করছে তা জামাত-ই-ইসলামের কার্যাবলী দেখলেই বোঝা যাবে। যদিও তারপরেই তিনি স্বীকার করেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন বা ঠাণ্ডাযুদ্ধ পরবর্তীকালে এ পুনরুত্থানবাদ পরিণত হয়েছে ইসলামিক এক্সট্রিমিজম বা ইসলামিক চরমপন্থায় এবং In recent time it has attained a vicious and virulent character. Modern extremism in reality is a reactionary culmination of the trends of Islamic revivalism in an epoch of modern world economy and politics.

প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজমের সাম্প্রতিক ব্যাপক সম্প্রসারণের কারণ কি, তা কিন্তু সেভাবে আলোচিত হয় না। যতটা হয় তার হিংস্রতা ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে এর কারণ সম্ভবত এটাই যে এর চেহারার একটি দিক আলোকপাত করা হয়, কিন্তু অন্যদিকটি অন্ধকারেই ডুবে থাকে।

সপ্তম শতকে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্রধানত অস্ত্রনির্ভর হয়ে। আরব দুনিয়া ছেড়ে তা পা রাখে আফ্রিকায় এবং তারপর ইউরোপে। একই সঙ্গে সাম্রাজ্য ও ধর্মের বিস্তার। স্পেনে ইসলাম রাজত্ব করে একটানা ৮০০ বছর। ইসলামিক শাসকরা হাত বাড়ায় এশিয়ার দিকেও। এ ব্যাপক সম্প্রসারণ থমকে দাঁড়ায় ইউরোপীয় রেনেসাঁর আবির্ভাবে। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ; কোণঠাসা করে ফেলে ইসলামের উত্থানকে । পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে বিপুলভাবে সাহায্য করে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব। কিন্তু এ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে বিযুক্তি, ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সময়ের সংযোগহীনতা তাকে ক্রমশ পিছিয়ে দিতে থাকে। তা সত্ত্বেও কিছু অগ্রবর্তী চিন্তাধারা এবং উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল প্রাথমিকভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অতঃপর উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, যেমন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে আজারবাইজানের বাকুতে কংগ্রেস অব দ্যা ইস্ট। কিন্তু বিভিন্ন দেশে উপনিবেশিক শাসন কৌশলের সামাজিক ও

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন হওয়ায় একটি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ চিন্তা-ভাবনা উঠে আসেনি, পরিবর্তে ইসলামের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় পারস্পরিক দ্বন্দ্বতায় মত্ত থেকেছে।

দ্বিতীয়, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতোই ইসলামিক সমাজে বড় প্রভাব ফেলে । শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত ইসলামিক ইভালিজমের অনেক নেতাই এ পথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেওবান্দ শিবিরের (সুন্নি সম্প্রদায়) অন্যতম নেতাআমায়েদ উল্লা সিন্ধি ১৯২১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। আফগানিস্তানের তালিবানরা এ গোষ্ঠীরই উত্তরাধিকারী। অথার্ৎ বোঝা যায়, সিন্ধির উপলব্ধি অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারেনি এবং ক্রমে এরা সোভিয়েত বিরোধী উগ্র মৌলবাদী হয়ে উঠে। ১৯২৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন মৌলানা হযরত মোহানি, এ ঘটনাও মনে রাখার মতো। ফলত, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষয়ক্ষতি, বামপন্থী নেতাদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও সংগ্রামকে ঠিকমতো অনুসরণ করতে না পারার ঘটনাবলী ইসলামিক মৌলবাদকে দৃঢ়তর, কঠিনতর, সংকীর্ণতর হতে সাহায্য করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে মৌলবাদ বড় আশ্রয় হয়ে উঠে, কোনও বিকল্প না পেয়ে এবং বেশ শক্ত ঘাঁটি বানাতে শুরু করে প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম।

তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইসলামিক দুনিয়ায় এক বামপন্থার প্রবাহ দেখা যায়। সিরিয়া, ইয়েমেন, সোমালিয়া ইথিওপিয়া ও অন্যান্য দেশে জনঅভ্যুত্থান দেখা যায়। এরমধ্যে সব থেকে বড় ঘটনা ঘটে ইজিপ্ট বা মিশরে। জামাল আবদেল নাসের সে দেশের রাষ্ট্রপতি হন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দলিল তৈরি করতে গিয়ে সুয়েজ খালের জাতীয়করণ ঘোষণা করেন। ১৯৬৫ সালে মিশরের সঙ্গে যুদ্ধে নামে ব্রিটিশ ও ফ্রান্স এবং তারা পরাজিত হয়। প্রায় অভাবনীয় হলেও এ ঘটনা ঘটেছিল এবং এ ঘটনার পরেই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের বিদেশনীতিতে উল্লিখিত দেশগুলির এ বামঘেষা নীতির বিরুদ্ধে তারা উস্কে দিতে শুরু করে সমস্যাপীড়িত মুসলিম যুবকদের। মদত দেয় রাজনীতি, অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এরা বেছে নেয় কিছু সংগঠনকে, বিশেষ করে জামাত-ই-ইসলাম এবং ইখওয়ান-ই-মুসলিমীনকে, যারা ইতিপূর্বেই জঙ্গি বলে পরিচিত ছিল। শুরু হয় অস্ত্রশস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং নানা জঙ্গি কর্মকাণ্ড, যাকে বলা হতে থাকলো ইসলামিক এক্সট্রিমিজম। এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে বামপন্থার প্রবাহকে রুদ্ধ করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের যাতে কোনরকম সম্পর্ক না তৈরি হয় তার ব্যবস্থা করা। কিন্তু উগ্র সরকার বিরোধিতা এবং জঙ্গি মতবাদের কারণে এরা সামাজিকভাবে যত বিচ্ছিন্ন হতে থাকে ততই নিজেদের সমর্পণ করতে থাকে সাম্রাজ্যবাদীদের কোলে। দেশে দেশে এ চরমপন্থীদের নিয়ে বাহিনী তৈরি করতে সাম্রাজ্যবাদীদের কোলে। দেশে দেশে এ চরমপন্থীদের নিয়ে বাহিনী তৈরি করতে থাকে ওয়াশিংটন যাতে দ্বিতীয় নাসের আর কোনও দিন তৈরি না হয়। এ বাহিনীকে দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, গুপ্তহত্যা, অন্তর্ঘাত সবরকম কাজই করানো হয়েছে। এভাবে দেশে দেশে গড়ে উঠলো ইসলামিক ঢেউ।

এর একটি বড় উদাহরণ ইন্দোনেশিয়া। ষাটের দশকে সুর্কনো যখন দেশের প্রেসিডেন্ট তখন দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্দোনেশিয়া। সদস্য সংখ্যায় সারা পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই ছিল তাদের স্থান। সুর্কনো যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে পপুলার ফ্রন্টিজমের দিকে এগোলেন তখনই ওয়াশিংটন চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেনানায়ক সুহার্তোর নেতৃত্বে যে অপারেশন চালানো হয় তাতে দশ লক্ষেরও বেশি কমিউনিস্ট সদস্যকে মারা হয়েছিল একদিনে। বিশ্বে এতবড় প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান আর ঘটেনি। মার্কিন হোয়াইট হাউস এ কাজ করার জেনারেল সুহার্তোকে দিয়ে। জেনারেল সুহার্তো এ কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ার মৌলবাদী সংগঠন সরকাত-ই-ইসলামকে দিয়ে। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এ ঘটনারই আর এক দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের দিকে যখন এগিয়ে যায় মুসলিম প্রধান এ ভূখন্ড তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সামনে রেখে ব্যাপক গণহত্যায় নামে জামাত-ই-ইসলামি, আল শামস, আল বদর, এ তিন জঙ্গি ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠন লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল। তৃতীয় ঘটনা আফগানিস্তান, নাজিবুল্লা সরকারের পতন ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হটানো। প্রায় ৩৫০০ কোটি ডলার বাবদ খরচ করেছিল ওয়াশিংটন। এখানে জন্ম হয় ওসামা বিন লাদেনের। আবার ১৯৮৮-৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার ও ১৯৯২ সালে নাজিবুল্লা পতনের ভেতর থেকে উঠে এসেছে নতুন সন্ত্রাস, হিজব উল মুজাহিদিন, লস্করই তৈবা ইত্যাদি যারা এখন কাশ্মীরে নিয়োজিত। এভাবে দেশে দেশে এ ইসলামিক চরমপন্থা কাছে আসতে আসতে একই লাইনে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তৈরি করে ফেলেছে এক আন্ত র্জাতিক রূপরেখা, যার নাম প্যান ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম এবং তাদের চরমপন্থা বা এক্সট্রিমিজ রূপান্তরিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ বা টেররিজমে।

এবং এ সূত্রেই দেখা যাবে, টেররিজম বা সন্ত্রাস বাদের সঙ্গে একই পংক্তিতে বসে গেছে ইসলামিক মতবাদ।

আবারও উদ্ধৃত করি লুইস এস আর ব্যাসকে, বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ক্ষমতাহীনতা, প্রথাগামী জনপ্রিয় রাজনীতি সামাজিক হতাশাকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সামনে এগোনোর কোনও রাস্তা না পেয়ে জনসাধারণের কিছু কিছু অনগ্রসর অংশ এবং পেটি বুর্জোয়ারা পেছনে ইতি উতি পথ খুঁজছে। মৌলবাদের কৌশলবিদরা ঠিক এ সুযোগকে হাতে তুলে নিচ্ছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও নেতাদের গলদগুলির সূত্র ধরে মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং দূর অতীতের বিত্ত সামগ্রীর কথা বলে তাদের সামনে মোহজাল রচনা করছে। মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বিরোধী যে মনোভাব নিহিত রয়েছে ইসলামিক নেতারা সেখানে সুড়সুড়ি দেয় । ব্যাপক মনোভাব নিহিত রয়েছে ইসলামিক নেতারা সেখানে ব্যাপকভাবে লুম্পেনাইজ করেছে। ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলি এ ঘটনাকেই পুঁজি করেছে। তারা যুব সম্প্রদায়ের লুম্পেন হয়ে যাওয়া অংশকে যেমন অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে, তেমনই দিচ্ছে আশ্রয়। যাতে রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিতে পারে। বঞ্চিত, শোষিত, হতাশাগ্রস্ত বিরাট সংখ্যক যুবক এভাবে মৌলবাদী সন্ত্রাসের জালে পা বাড়ায়। তারা সামনে আসা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা না করতে পেরে এ পথ বেছে নেয় বেঁচে থাকার জন্য, একটু স্বস্তির জন্য। কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরের সংস্কৃতি যখন তাদের শুধুই বিদ্রুপ আর উপহাস করে তখনই কিন্তু পাওয়ার তাড়নায় তারা নাম লেখায় ইসলামিক মৌলবাদীদের দলে।

এ ব্যাখ্যা ইসলাম অধ্যুষিত দেশগুলিকে সামনে রেখে। ইসলাম কথাটা তুলে দিলে সব ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য যে দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা নেই, শিক্ষা নেই, চাকরি নেই সেখানেই ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম এসব অভাবকে কাজে লাগিয়েছে নিজেদের সংগঠন বাড়ানোর জন্য। বিপুল পরিমাণ কালো টাকায় তারা গড়ে তুলেছে একের পর এক মাদ্রাসা, যাতে কৈশোর থেকেই ধর্মীয় জঙ্গি মৌলবাদী করে তুলতে পারে নতুন প্রজন্মকে। পাকিস্তানে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য জেনারেল জিয়াউল হক এ পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে মাদ্রাসার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ হাজার এবং অনথিভুক্ত ২৫ হাজার রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যখন অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে চলেছে তখন সাধারণ গরিব মানুষের কাছে মাদ্রাসাই বড় নির্ভর। সন্তানকে হয় শিশু শ্রমিকে পরিণত করা নয়তো খাবার ও জামাকাপড়ের ব্যবস্থা করতে মাদ্রাসায় পাঠানো এ দুইয়ের একটি পথ বাবা মাকে নিতেই হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ ইসলামিক এক্সট্রিমিজমের জন্য দায়ী বামপন্থী, গণতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাও পুঁজিবাদের বিকাশ ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা অধিকাংশ সমাজকেই সর্বনাশের প্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছেন। রোগ দুঃখ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হয়েছে দেশ। তাদের গণতন্ত্র এবং উদারনীতি কোটি কোটি মানুষের সামান্য খাদ্য বস্ত্র আশ্রয়টুকুও দিতে পারেনি।

বামপন্থীরা এ রাজনৈতিক ভঙ্গি নিয়েছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সন্ধানে নিয়োজিত হওয়ার কারণে। পুঁজিবাদী অবনয়নের কালে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের সময়ে এ বিপ্লব কোনও দিন হওয়া সম্ভব নয়। জাতি রাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ করা বা সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক উপরিকাঠামোকে রক্ষা করা, এর কোনওটা করার মতো অর্থনৈতিক শক্তি এসব দেশের হয়নি। ক্ষমতায় এরা এল এবং তারপর যখন কিছুই করতে পারল না এসব গণতন্ত্রী ও উদারনীতিবাদীরা, তখন তারা আশ্রয় নেয় ইসলামিক ডেমাগগিতে। ব্যাপক প্রতিবাদ এবং গণবিক্ষোভের মুখে পড়ে রাজা, একনায়কতন্ত্রী আর গণতন্ত্রী নেতারা হয়ে যান ইসলামের বড় বড় স্তম্ভ। একেবারে বোনপার্টিস্ট ক্যাশনে দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁরা।[৩] *রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্ত্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা।পৃষ্ঠা-৪০-৪৯।*

• রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তথা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস ঃ

মাইকেল প্যারেন্টি তার এগেইনস্ট ইমপেরিলেজম (তারেক ওমর চৌধুরী অনুদিত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত তার ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে কলকাতার চিরায়ত সংস্থা) বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন: সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের থেকে অনেক অনেক পুরনো এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বহু আগে তার জন্ম। প্যারেন্টি পারস্য, মাসিদোনিয়া, রোম ও মুঘল সাম্রাজ্যের উল্লেখ করেছেন কয়েক শতাব্দি প্রাচীন বলে। এ পর্যবেক্ষণও সঠিক নয়। যদি না সভ্যতার পরিবর্তে শিল্পবিপ্লবকে সময়সীমা বলে ধরা হয়। সাম্রাজ্যবাদকে এতে যথেষ্ট খাটো করেই দেখা হয়ে থাকে বলে মনে হয়।

প্যারেন্টি লিখছেন, আদি ধরন থেকে আজকের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের তফাত এখানে যে, বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ সুসংগঠিতভাবে বিদেশে বাজার দখল এবং শ্রম শোষণের মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে পুঁজি সঞ্চয় করে। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ অন্য দেশে বিনিয়োগ করে, নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি। এছাড়াও সেসব দেশের উৎপাদন কাঠামোকে পুঁজি সঞ্চয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে নেয়। সম্প্রসারণ বা বিস্তার হচ্ছে পুঁজিবাদের পক্ষে অপরিহার্য। সম্প্রসারণবাদীরা গোটা সমাজকে ধ্বংস করে; স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের মানুষদের বলপূর্বক পরিণত করে অধিকারহীন মজুরি শ্রমিকে, স্বদেশি সমাজ আর লোক সংস্কৃতিতে হটিয়ে দিয়ে এরা স্থাপন করে গণবাজার, গণমধ্যম এবং ভোগী সমাজ, সমবায়ী ভূব্যবস্থার জায়গায় নিয়ে আসে বাণিজ্যিক কৃষিখামার, গ্রামের জায়গায় বিস্তার ঘটায় নিরানন্দ বস্তির, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের জায়গায় নিয়ে আসে কেন্দ্রীভূত স্বৈরশাসন।

বিশিষ্ট মার্কিন চিন্তাবিদ প্যারেন্টির মতে, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে রাষ্ট্রের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়, সম্প্রসারণ ও আধিপত্যের এক সহজাত ইচ্ছা থেকে এর উদ্ভব। বস্তুত রাষ্ট্রদখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এখন আর সাম্রাজ্যবাদের প্রচলিত পন্থা নয়। উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দির গোড়াতে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ সারা দুনিয়াকে যেভাবে নিজেদের মধ্যে ছিঁড়ে খুবলে নিয়েছিল, সেই কায়দায় আজ আর কোনো উপনিবেশ নেই

Dhaka University Institutional Repository

বললেই চলে। মত ও কবরস্থ কর্নেল ব্লিম্পের জায়গা নিয়েছে স্যুট পরা টাই বাঁধা চৌকস ব্যবসায়ীরা। সরাসরি উপনিবেশ হিসেবে না রেখে দুর্বল দেশগুলোকে সার্বভৌমত্বের লাভজনক সম্পদের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এ সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে নামকরণ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সাম্রাজ্য, উপনিবেশহীন উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের জন্য সন্ত্রাস এক নৈমিত্তিক অস্ত্র। মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং এ ধরনের অন্যান্য সংগঠনের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য সহায়তায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক ও পুলিশবাহিনীকে গোয়েন্দাগিরি, নজরদারি, জেরা অত্যাচার, ভীতি প্রদর্শন ও খুন করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট বেনিংয়ে অবস্থিত মার্কিন সামরিক বাহিনীর স্কুল অব আমেরিকান এর সোয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মার্কিন বশংদ্ভোত রাষ্ট্রগুলোর সামরিক অফিসারদেরকে অত্যাচার চালাবার সর্বাধুনিক কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বলে সারা লাতিন আমেরিকার জনসাধারণ এর নাম দিয়েছে খুনিদের পাঠশালা (স্কুল অব অ্যাসাসিনস)। এল সালভাদরের গ্রামগুলোতে হত্যাযজ্ঞ এবং নৃশংসতা চালাবার দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ সামরিক অফিসারই সোয়াতে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

এসব মুৎসুদ্দিনিপীড়করা তাদের বন্দিদের বাধ্য করেছে শিশু সন্তাসহ আত্মীয় ও বন্ধুদের ওপর অত্যাচার দেখতে। এরা পরিবারের সদস্যদের সামনে মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, অ্যাসিড অথবা গরম জল দিয়ে ঝলসে দিয়েছে যৌনাঙ্গ, মেয়েদের যৌনাঙ্গ এবং বন্দিদের মুখে ইঁদুর ঢুকিয়ে দিয়েছে, যৌনাঙ্গ চোখ জিহ্বাসহ বন্দিদের শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলেছে। তারা ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে মারার জন্য মেয়ে বন্দিদের স্তনে বা শিরায় ইঞ্জেকশন দিয়ে বাতাস ভরে দিয়েছে। মেয়েদের যৌনাঙ্গে এবং ছেলেদের মলদ্বারে লাঠি বা বেয়নেট ঢুকিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করেছে বন্দিদের।

নিকারগুয়া, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা ও আফগানিস্তানের মতো যেসব দেশে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সরকার গুটিকয়েকজনের বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক সম্পদ পুনর্বণ্টন করেছিল, সেখানেই সরকারবিরোধী ভাড়াটে বাহিনীর ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্র মদদ দিয়েছে। এ ভাড়াটে বাহিনী বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রের শক্তি খর্ব করার উদ্দেশে স্কুল, সমবায়, খামার স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এমনকি গোটা গ্রাম ধ্বংস করেছে। এসব দেশে এ ভাড়াটে বাহিনী বয়স নির্বিশেষে নির্বিশেষে ধর্ষণ করেছে, হাজার হাজার মানুষকে খুন বা পঙ্গু করেছে অথবা অত্যাচার চালিয়ে মানসিকভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। হাজার হাজার ছোট ছেলেকে অপহরণ করে মার্কিন মদদপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী বাহিনীতে বলপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে উদ্বাস্তু শিবিরে। এসব ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের কারণে মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, যার দান অপরিমেয়। এর ফলে বিপ্লবী সরকারগুলোকে বাধ্য হয়ে তাদের কর্মসূচি পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

সামাজিক ন্যায়বিচাররের জন্য মানুষের সংগ্রামকে মার্কিন মদদপুষ্ট কাউন্টার ইনসারজেন্সি বা বিদ্রোহ দমনমূলক তৎপরতার মাধ্যমে বিরোধিতার করুন দৃষ্টান্ত হচ্ছে সালভাদরের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ও মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত সালভাদরের সেনাবাহিনী নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সারাদেশে এক একটি গোটা গ্রাম ধ্বংস করেছে। সালভাদর বাহিনীর ধারণা, গেরিলাদের প্রতি ওইসব গ্রামের মানুষের সহানুভূতি ছিল। এমন এক গ্রামের নাম হচ্ছে এল মোজোটি মূলত সরকারি বাহীনির হাতেই ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ৭০,০০০ সালভাদরীয় নিহত হন। দেশত্যাগী হতে হয়েছিল ৫,৪০,০০০ মানুষকে। আরো আড়াই লাখ লোককে ঘরবাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। এতকিছু ঘটেছিল অথবা সামরিক বাহিনীর নতুন বসতি নামের শিবিরে আটকে রাখা হয়েছিল। এতকিছু ঘটেছিল মাত্র ৪০ লাখ মানুষের একটি দেশে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশি গুয়াতেমালায় সিআইএ সৃষ্ট ৩৫ বছরের যুদ্ধে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নিহতদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক লাখ। নিখোঁজ হল আরো ৬০, ০০০ মানুষ। গেরিলাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সন্দেহে প্রায় ৪৪০টি গ্রাম ধ্বংস করা হয়। হত্যা করা হয় এসব গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাকে প্রায় ১০ লাখ লোক দেশ ছেড়ে দেশের ভেতরে অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এদের বলা হয় অভ্যন্তরীণ উদ্ধাস্তু। এসব চলে গেরিলা লড়াই বা বিদ্রোহ দমনে সামরিক তৎপরতা বা কাউন্টার ইনসারজেন্সির কারণে। এখনো নিধনযজ্ঞ চলছে সেখানে।[৪] *রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন ভদ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা।পৃষ্ঠা-২০-২৩।*

এভাবে কলম্বিয়াতে দীর্ঘ গেরিলাযুদ্ধের সময় সরকারি বাহিনীর হাতে এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধবিরতির সময়ে দক্ষিণপন্থী আধা সামরিক বাহিনীর হাতে পুঁজিবিরোধী অথবা সংস্কারপন্থী হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মিকে খুন করা হয়। নিহত নেতা কর্মিদের মধ্যে রয়েছেন প্যাট্রিয়টিক ইউনিয়নের দুজন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী এবং কলম্বিয়ার একজন সিনেট সদস্য। এ সিনেট সদস্য কমিউনিটি পার্টির প্রধান ছিলেন। সেখানে আজো হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। অথচ সব কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ তো দূরের কথা বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরামহীনভাবে কলম্বিয়ার সেনাবাহিনীকে সামরিক সাহায্য দিয়ে চলেছে।

ইন্দোনেশিয়ার মার্কিন মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী ১৯৬৫ সালে ৫ লাখ থেকে ১০ লাখের মতো মানুষকে হত্যা করে। সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে সন্দেহভাজন প্রায় সকলকে হত্যা করে। এমনকি নিউইয়র্ক টাইমস (১২ মার্চ, ১৯৬৬) এ ঘটনাকে আধুনিককালের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বর্বর গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ ঘটনার দশ বছর পরে এ ইন্দোনেশিয় সামরিকবাহিনীই পূর্ব তিমুর আক্রমণ করে সেখানকার সংস্কারপন্থী সরকারকে উচ্ছেদ করে। ইন্দোনেশিয়ার সামরিকবাহিনীর হাতে তিমুরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড এবং বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঞ্জার ইন্দোনেশিয়া সফর শেষ করার পরের দিনই তিমুরে এ আগ্রাসন শুরু হয়। সে সময় ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরত সিআইএ কর্মকর্তা ফিলিপ লাইকটি সম্প্রতি বলেছেন, (নিউইয়র্ক টাইমস, ১২ আগস্ট, ১৯৯৪) জেনারেল সুহার্তো যা করেছেন তা করার জন্য খোলাখুলি সম্মতি দেয়া হয়েছিল। এ অভিযানে ইন্দোনেশিয়ার সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত সমস্ত অস্ত্র, গোলাগুলি ও খাদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছিল বলে লাইকটি জানিয়েছেন। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা ও বিভিন্ন ধরনের খুনিবাহিনীকে মদদ দেয়ার মাধ্যমে মার্কিন সামরিক শক্তিকে পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করা হয়। কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে রক্ষা করা এসব বাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। কারণ কথিত কমিউনিস্ট আগ্রাসনের অস্তিত্বই নেই বরং এসব দেশের জনসাধারণের বা প্রতিবেশি দেশের প্রতিবাদ আন্দোলনগুলো দমন ও তাদের সন্ত্রস্ত করাই এ বাহিনীগুলোর কাজ।

২. ল্যারি সমকেদা রচিত এক নিবন্ধের একটি অংশের স্বচ্ছন্দ উদ্ধৃতি রাখছি।
১৯৪৫ সালে গুয়াতেমালায় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। যার ফলে গত চার দশকেরও ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অধিষ্ঠিত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার কৃষক নিধন হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে ডোমিনিকান রিপাবলিক সরকারকে উৎখাত করেছিল আমেরিকা এবং তিন হাজার মানুষকে। প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড ও সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জারের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে তাঁবেদার ইন্দোনেশিয়া যোগসাজশে তাঁবেদার ইন্দোনেশিয়া সরকার ১৯৭৫ সালে পূর্ব তিমুরে সামরিক অভিযান চালিয়ে আড়াই লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৭০ এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষত অ্যাঙ্গোলার জনগণের বিরুদ্ধে মার্কিন

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগে যে নিধনযজ্ঞ শুরু হয় তাতে ১০ লক্ষের ও বেশি প্রাণহানি ও অঙ্গহানি ঘটেছে। স্যামুয়েল নরিয়েগাকে ধরার জন্য ১৯৮৯ সালের বড়দিনে পানামা আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আট হাজার লোককে মেরে ফেলেছিল। ইরানে একদা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ এ ২৭ বছরে ৭০ হাজার ইরানিকে হত্যা করা হয়। ১৯৮০র দশকে লেবাননের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালায় ইসরায়েল এবং সেটা মার্কিন মদদে । কয়েক লাখ লেবাননির মৃত্যু হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ভিয়েতনামের ওপর চলেছে মার্কিন আক্রমণ প্রায় ৪০ লক্ষ ভিয়েতনামির ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়েছে, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৮০র দশকে লিবিয়ার ওপর আক্রমণ চালায় আমেরিকা। এরপর এসেছে গ্রানাডা, সোমালিয়া, হাইতি, সুদান, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইরাক, যুগোশ্লাভিয়া ও আফগানিস্তানের ওপর আক্রমণ। ইরাকে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু ঘটিয়েছে আমেরিকা। উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকেই ইউরোপের এক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে পরিণত হতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পুঁজিবাদ দ্রুত বিকশিত হতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আছ ভৌগোলিক কারণেই আমেরিকার গায়ে লাগেনি। উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র বিক্রি করে মার্কিন অর্থনীতি যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যদিয়েই ও যুদ্ধ পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার নেতৃত্বে আরোহণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক রাধিকারঞ্জন সমাদ্দারের এক নিবন্ধের সূত্রে বলতে পারি, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো: ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক কর্পোরেশনের অস্তিত্ব, ২. মিলিটারি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বা সামরিক শিল্পজোট। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে নয়াউপনিবেশবাদের নতুন কর্মকৌশল মার্কিন বৈদেশিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে এসব মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন। অন্যদিকে কেবল পুঁজি ও ভোগ্যপণ্যের ওপর নির্ভর করেই যে পুঁজিবাদ তার সঙ্কট কাটাতে পারে না, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে উঠা অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যদিয়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স বা মিকএর সৃষ্টি । ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর বিদায়ী ভাষণে এ পথের উল্লেখ করেছিলেন। মিক হলো যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনকারী একচেটিয়া শিল্প সংস্থা ও সামরিকবাহিনীর সংগঠন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বহুলাংশেই এ মিক এর ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ৪ হাজার অস্ত্র উৎপাদনকারী একচেটিয়া শিল্পসংস্থা ও সামরিকবাহিনীর সংগঠন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সংস্থা এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। ৪ হাজার কারখানায় তৈরির জন্য চাই লক্ষ লক্ষ অস্ত্র বিক্রির তো জায়গা চাই, বাজার চাই। আর এ বাজার তৈরির জন্য চাই নিরন্তর যুদ্ধ ও সংঘর্ষ। সুতরাং যদি যুদ্ধ কোথাও না ও বাঁধে তাহলেও তা বাঁধতে হবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যদিকে এ যুদ্ধ সম্প্রসারিত করবে সাম্রাজ্যকে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে ও সাম্রাজ্যবাদের জীবনরক্ষায় অবিরাম যুদ্ধ সংঘর্ষ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর তার প্রকাশ ঘটবে সন্ত্রাসে। যাকে বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস। মার্কিন সমরশক্তি যে, কখনই আত্মরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয়নি বরং গ্রাস করার তাগিদে, গুণ্ডামির তাগিদে এর সৃষ্টি, তার প্রমাণ হলো:

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অন্তত ৩২টি দেশে।
২. সমস্ত দেশে নৌ, স্থল, বিমানবহর মিলিয়ে এ ঘাঁটির সংখ্যা অন্তত ১৫০০।
৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বাজেট ৫০ হাজার বিলিয়ন বা ৫০,০০০,০০ কোটি টাকা ছড়িয়ে গেছে ২০০০সালে।
৪. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে অস্ত্র বিক্রি করেছে কমবেশি ১০০ বিলিয়ন বা ১০,০০০ কোটি ডলারের।
৫. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সৈন্যের সংখ্যা যেকোনও দেশের তুলনায় বেশি।
৬. বর্তমানে মার্কিন সামরিক শক্তির প্রধান স্তম্ভ হলো পরমাণু রাজনীতি।
৭. ন্যাটোর ৬টি সদস্য রাষ্ট্রে ১০৮টি পারসিং ও কুইজ মিসাইল বসানো হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ এ দশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাস্ত্র বাণিজ্য দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। গোটা দুনিয়ায় যুদ্ধ ব্যবসায় তাদের অংশীদারিত্ব ছিল ২৮ শতাংশ, ১৯৯৭ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮ শতাংশ । ১৯৯১-৯২ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এ যুদ্ধব্যবসায় সব থেকে বেশি লাভবান হয় মার্কিন যুদ্ধবিমান নির্মাণ সংস্থা, যাদের আয় এক লাফে ৩১ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৫০ কোটি ডলার দাঁড়ায়। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমির শাহির কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০০-র বেশি যুদ্ধবিমান বিক্রি করে। ১৯৯১-৯৪ সালের মধ্যে সৌদি আরবের কাছে মার্কিন যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি বৃদ্ধি পায় ৬৭শতাংশ । আমির শাহির কাছে ৮০টি যুদ্ধবিমান ও চারটি রণতরী বিক্রি করে ৮০০ কোটি ডলারে। মার্কিন সংস্থা লকহিড কর্পোরেশন বিপুল মুনাফা করে। ল্যান্ডমাইন নিষ্ক্রিয় করার যন্ত্র বিক্রি করে মার্কিন সংস্থা সিএমএস প্রতি বছর প্রায় ২০ কোটি ডলার মুনাফা করছে। ব্রিটিশ সংস্থা রয়্যাল অর্ডিন্যান্স ১৯৯২ সালে কুয়েতের কাছ থেকে ওই জিনিসেরই ৯ কোটি ডলারের বরাদ্ধ পায় এবং এখনো পেয়ে চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস হলো সামরিক সাম্রাজ্যবাদেরই অনিবার্য পরিণতি। কারণ সামরিক সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য শুধু আমেরিকার অর্থনৈতিক সঙ্কট দূর করা নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মার্কিন ডলারের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে। যখনই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকেও নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মার্কিন ডলারের ওপর কোনো ও প্রভাব ফেলতে না পারে। যখনই তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশে আমেরিকার অভিভাবকত্ব মানে না তখনই তাদের আমেরিকার বোমা বর্ষণের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন হয়েছিল গ্রেনাডা, নিকারাগুয়া, লিবিয়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে:

১৯৮৩ সালে গ্রেনাডায় মার্কিন সামরিক অভিযানে ব্যয় হয়েছিল ১২ কোটি ৯০ লক্ষ মার্কিন ডলার,

১৯৮৩ সালে লেবানন ব্যয় ১০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার,
১৯৮৭-৮৮ সালে পারস্য উপসাগর অভিযানে ব্যয় ২২ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার,
১৯৯০ সালে পানামা অভিযানে ব্যয় ২২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার
১৯৯১ সালে ইরাক অভিযানে ব্যয় ৮০০০ কোটি ডলার,
১৯৯২-৯৬ সালে সোমালিয়া অভিযানে ১৯০ কোটি ডলার,
১৯৯৪-৯৫ সালে রোয়ান্ডা অভিযানে ১৭ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার,
এবং পরবর্তীতে হাইতি অভিযানে ৯৩ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছিল।

উল্লেখ করা দরকার, এ সমস্ত অর্থই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুলেছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিপীড়ত মানুষ ও উন্নত দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে।

সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস যেমন সাম্রাজ্য দখলের একটি অনিবার্য হাতিয়ার, তেমনই এ হাতিয়ার আজ ব্যবহৃত হচ্ছে আর একটি অভিযানে। এ অভিযান হলো তেল দখল। সাম্রাজ্য দখলেরই নতুনতর রূপ। তেল বা পেট্রোলিয়াম হলো আজকের বিশ্বে সব থেকে মূল্যবান সম্পদ। তেলের খনিগুলো যার দখলে সব থেকে বেশি থাকবে তার হাতেই সর্বাধিক সমর্পিত থাকবে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। তেল হলো জ্বালানি। এ জ্বালানির ওপর নির্ভর করে আছে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের গতি, তাদের ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয় শিল্পোন্নত দেশ ও যুদ্ধবাজ দেশগুলি এবং তাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। ১৯৫০ এর দশকের মধ্যে প্রাচ্য বা মিডল ইস্টের (সেন্ট্রাল ইস্ট নামেও আখ্যায়িত) দেশে দেশে তেলের সন্ধান পাওয়া যেতে শুরু করে ব্যাপকভাবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যপ্রাচ্য হয়ে উঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শিকারভূমি। ঢল নামে বহুজাতিক সংস্থাগুলির এমনকি হল্যান্ডের বহুজাতিক সংস্থাও নখ চেপে

Dhaka University Institutional Repository

বসে পড়ে লিবিয়ার মাটিতে। তেলের সন্ধান পাওয়া যায় পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলেও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের ধারণা মধ্য এশিয়ার কাস্পিয়ান অববাহিকায় যে পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল সঞ্চয় রয়েছে তা দিয়ে আগামী ৩০ বছর (২০২৫ পর্যন্ত) তাদের জ্বালানি চাহিদা সুন্দরভাবে মিটে যাবে। উপরন্তু অন্যদেশে তেল রপ্তানি করে পাওয়া যাবে হাজার হাজার কোটি ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ৫১ শতাংশ অপরিশোধিত তেল, অর্থাৎ প্রায় ১৯৫ লক্ষ ব্যারেল তেল প্রতিদিন আমদানি করে। এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হিসেবে করে দেখেছে, ২০২০ সালে আমেরিকায় প্রতিদিন ২৫৮ লক্ষ ব্যারেল তেল আমদানি করার প্রয়োজন হবে। এ অঙ্ক থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে, কাস্পিয়ান অববাহিকায় কি বিপুল পরিমাণ তেল আছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পারস্য উপসাগরের তেলের ভান্ডার থেকেও অধিক হলো এ সঞ্চয়। সুতরাং কাস্পিয়ান সাগর ও সন্নিহিত সমগ্র অঞ্চল মার্কিন নিয়ন্ত্রণে থাকা একান্ত জরুরি।

এছাড়াও তুর্কিমেস্তানের মরুভূমিতে রয়েছে তেল ও গ্যাসের আর এক বৃহৎ সঞ্চয়। সেখানে তিন ট্রিলিয়ন কিউবিক মিটার গ্যাস এবং ৬০০ বিলিয়ন ব্যারেল তেল রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এ জ্বালানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদাকে অত্যন্ত সহজ ভাবে পূরণ করতে পারবে বছরের পর বছর ধরে। সুতরাং তুর্কমেনিস্থানের দিকেও হাত বাড়ানো দরকার ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপরন্তু উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলিতো আছেই। পুঁজিবাদী বিশ্বের মোট চার পঞ্চমাংশ তেল ও গ্যাস রয়েছে এ মধ্যপ্রাচ্যে ও পশ্চিম এশিয়ায়। ২০০০ সালে বার্ষিক তেল উৎপাদন ১০০ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে। এ তেলের মালিক প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, সমগ্র তেল মানচিত্রের পটভূমিতে আফগানিস্তান হয়ে উঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক রাষ্ট্র। তেল সম্পদে নয়, তেল সম্পদ নিয়ন্ত্রণে চৌকির বা আউটপোস্টের ভূমিকায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাই অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে আফগানিস্তানকে করায়ত্ত করা। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হটানোর জন্য একদা যে মার্কিন অভিযান শুরু, সোভিয়েত প্রভাবিত ইউনিয়নকে হটানোর জন্য একদা যে মার্কিন অভিযান শুরু, সোভিয়েত প্রভাবিত সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর তা পরিণত হয় আফগান দখল নীতিতে।

ইতিহাসের অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক মৈনাক রায় লিখছেন: আফগান্তিানের ভৌগোলিক অবস্থানই তেল সুরক্ষার প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মধ্য এশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের তেল ও গ্যাসের সম্ভাব্য সবচেয়ে সহজ পরিবহন পথ হিসেবে আফগানিস্তানকেই বেছে নেয়া হয়েছে এবং বহু বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের মধ্যদিয়ে একটি খসড়া প্রকল্পও রূপায়ন করা হয়েছে ইতিমধ্যে। এ প্রস্তাবিত পরিবহন পথ (পাইপলাইনের মাধ্যমে) শুরু পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার তুর্কমেনিস্তানের যেখানে খুব সম্ভবত পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভার লুকিয়ে আছে। তুর্কমেনিস্তান গ্যাসের আফগান রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে পরিবহন পরিকল্পনাটি মার্কিনিদের নিজস্ব নয়। আর্জেন্তিনার ব্রিদাস গ্রুপ কোম্পানির কাজ পাগল চেয়ারম্যান কার্লোস বুলঘেরানির মস্তিষ্কপ্রসূত এ পরিকল্পনা। ১৯৯৩ সালে তুর্কমেনিস্তানের যৌথ উদ্যোগে শুরু হয় পূর্ব তুর্কমেনিস্তানের ২০০০ মাইলব্যাপী সিসমিক লাইন ধরে ভূবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। এ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে ১৫০ মাইলব্যাপী বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার। পাকিস্তানও তুর্কমেনিস্তান সরকার যৌথভাবে ব্রিদাস গ্রুপকে দায়িত্ব দেয় আফগান অঞ্চলের মধ্যদিয়ে পরিবহন পথের উপযুক্ততা যাচাই করতে । ইতিমধ্যে আসরে নেমে পড়ে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ইউনোক্যাল কর্পোরেশন। তারা তদকালীন তুর্কমেন প্রধান নিয়াজভ ও পাকিস্তানের প্রধান বেনজির ভুট্টোকে রাজি করিয়ে ফেলে, এমনকি আফগানিস্তানের তালিবান শাসকদেরও । ইউনোক্যাল কর্তাদের অভিমত ছিল, ক্রমবর্ধমান ক্রয়ক্ষমতা ও বিশাল জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ার বাজার অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এ এশিয়ার বাজারে পৌঁছানোর পথ হলো

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি: ১. চীনের মধ্যে দিয়ে, ২.ইরানের মধ্যে দিয়ে, ৩. আফগানিস্তানের মধ্যেদিয়ে। প্রথমটি ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয় টি মার্কিন বিদেশনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তৃতীয়টি সব থেকে সুবিধাজনক। কিন্তু ইউনোক্যালের তদানীন্তন ভাইসপ্রেসিডেন্ট বব টিউটর বলেন, আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে এ পাইপলাইন তবেই সম্ভব যদি সেখানে একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসম্পন্ন সরকার থাকে।

অর্থাৎ যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দের বা তল্পিবাহক সরকার থাকে। তাই ওসামা বিল লাদেনকে খোঁজার এবং সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার নামে আফগানিস্তানে একদা তাঁবেদার মৌলবাদী তালেবানদের নতন ঘাঁটিয়ে গোটা দেশটি দখল করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

ডেভিড এন. গিবস এ সূত্রে তার ওয়াশিংটনের নয়া হস্তক্ষেপনীতি নিবন্ধে লিখছেন: ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় (ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস) নিরীহ মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবীবাসী দুঃখিত হলেও আমেরিকান শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি জর্জ বুশের ভাষায় আমেরিকাকে শক্তিশালী করতে এটি একটি সুযোগ। নিজের দেশের আর্থিক মন্দা, যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবসা, মধ্য এশিয়ার তৈল সম্পদ অধিকারসহ আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় সারা দুনিয়ার দখলদারীর উদ্দেশ্য একমুখী বিশ্বব্যবস্থা প্রণয়নের পথে সমস্ত বাধা দূর করতে মার্কিন শাসক শ্রেণীকে আজ হোক কাল হোক যুদ্ধ বাঁধাতেই হতো। রিচার্ড নিক্সের ভাষায় : ১১ সেপ্টেম্বরের বহু আগেই আফগানিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। বিগত দু'বছর ধরে আফগানিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়া হয়। বিগত দু'বছর ধরে আফগানিস্তানের চারদিকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে সামরিক বৃত্ত রচনা করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমর দাবানলকারী এক স্ফুলিঙ্গ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বযুদ্ধ শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন: যেখানেই তেল গ্যাস সেখানেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের থাবা। এ থাবা খুব শক্তিশালী ভাবে সারা বিশ্ব জুড়ে নতুন উদ্যমে বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানের ওপর হামলা করেছে এবং তাদের দ্বিতীয় পর্বের হামলা ইরাকের ওপর নতুন করে শুরু করার কথা বলছে, অদূর ভবিষ্যতে সুদানও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু। এই হল সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস।[৫] *রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্দ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা।পৃষ্ঠা-২৩-৩০।*

Dhaka University Institutional Repository

• মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস দেশকাল বিবরণ ফলাফল ঃ

১. দক্ষিণ ডাকোটা ১৮৯০ সেনা অভিযান উন্ডেডনী তে ৩০০ লাকোটা ইন্ডিয়ান গণহত্যার শিকার।
২. আর্জেন্টিনা ১৮৯০ সেনা অভিযান বুয়েনস এয়ারিসে মার্কিন স্বার্থ সুরক্ষিত।
৩. চিলি ১৮৯১ সেনা অভিযান জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীদের সঙ্গে মেরিন সেনার সংঘর্ষ।
৪. হাইতি ১৮৯১ সেনা অভিযান যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা দাবিকৃত নাভাসা দ্বীপে কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমন।
৫. আইডাহো ১৮৯২ সেনা অভিযান রুপোর খনির শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমন।
৬. হাওয়াই ১৮৯৩ নৌ ও স্থলসেনা স্বাধীন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে হাওয়াইয়ের সংযুক্তি।
৭. শিকাগো ১৮৯৮ সেনা অভিযান রেল ধর্মঘট দমন, ৩৪ জন নিহত।
৮. নিকারাগুয়া ১৮৯৪ সেনা অভিযান ব্লুফিল্ডস বন্দর দখল।
৯. চীন ১৮৯৪-৯৫ নৌ ও স্থলসেনা অভিযান
১০. কোরিয়া ১৮৯৪-৯৫ সেনা অভিযান যুদ্ধ চলাকালে সোলে সেনাদের অবস্থান।
১১. পানামা ১৮৯৫ নৌ ও স্থলসেনা অভিযান।
১২. নিকারাগুয়া ১৮৯৬ সেনা অভিযান।[৬] *রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ :- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন ভদ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা। পৃষ্ঠা-৩০-৩৯।*

Dhaka University Institutional Repository

• বিশ্বের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন

কলাম্বিয়া ঃ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইএলএন) , রেভলিউশনারি আমর্ড ফোর্সেস অব কলাম্বিয়া (এফ এ আর সি), **ফ্রান্স** ঃ বাস্ক ফাদারল্যান্ড অ্যান্ড লির্বাটি (ইটিএ), অন্য নাম, উজকাদি তা আসতাকাতাসুনা, অন্য নাম, এটা।, **স্পেন** ঃ বাস্ক ফাদারল্যান্ড অ্যান্ড লির্বাটি (ইটিএ), ফার্স্ট অব অক্টোবর অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রেজিস্ট্যান্স গ্রুপ (জিআরএপিও), **সুদান** ঃ আবু নিদাল অর্গানাইজেশন, অন্য নাম আরব রেভলিউশনারি কাউন্সিল, অন্য নাম আরব রেভলিউশনারি ব্রিগেডস, অন্য নাম রেভলিউশনারি অর্গানাইজেশন অব, স্যোসালিস্ট মুসলিমস, **সিরিয়া** ঃ আবু নিদাল অর্গানাইজেশন, **স্পেস** ঃ রেভলিউশনারি অর্গানাইজেশন সেভেনটিন নভেম্বর রেভলিউশনারি পিপলস, স্ট্রাগলাগল, শাইনিং পাথ অব জোস কার্লোস মারিয়াতেগুই, টুপাক আমারু রেভলিউশনারি মুভমেন্ট (এমআরটিএ), **উত্তর আয়ারল্যান্ড** ঃ প্রভিশনাল আইরিশ রিপাবলিক আর্মি দা প্রোভোস,আইরিশ রিপাবলিক আর্মি, কনটিনিউইটি আইরিশ রিপাবলিক আর্মি, **দক্ষিণ আফ্রিকা** ঃ পিপল এগেইনস্ট গ্যাংস্টারিজ অ্যান্ড ড্রাগস, **সিয়েরা লিওন** ঃ রেভলিউশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট, **জাপান** ঃ আম শিনরিকিও, অন্য নাম এ আইসি কমপ্রিহেনসিভ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, জাপানি রেড আর্মি, অন্য নাম, অ্যান্টি ইমিডরিয়ালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল, বিগ্রেড, **ফিলিপিন্স** ঃ আবু সায়াফ গ্রুপ, অন্য নাম আল হরকত আল ইসলামিয়া, আলেক্স বনসায়ানো বিগ্রেড, নিউ পিপলস আর্মি, **ভারত** ঃ হিজবুল মুজাহিদিন, লস্কর-ই- তৈয়বা, জৈশ-ই-মহম্মদ, আলফা (ULFA), এনএসসিএন, পাকিস্তান ঃ হরকত-উল-মুজাহিদিন, জৈশ-ই মুহম্মদ,**আফগানিস্তান** ঃ আল কায়েদা, অন্য নামদা বেস, অন্য নাম ইসলামিক আর্মি, অন্য নাম ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, এগেইনস্ট জিউস অ্যান্ড ক্রুসেডার্স,অন্য নাম ইসলামিক আর্মি ফর দা লিবারেশন, অন্য নাম ওসামা বিন লাদেন নেটওয়ার্ক, অন্য নাম ওসামা বিন লাদেন অর্গানাইজেশন, সাইটস, ইসলামিক মুভমেন্ট অব উজবেকিস্তান, **ইরান ও ইরাক** ঃ আবু নিদাল অর্গানাইজেশন, মুজাহিদিনি ই খালক অর্গানাইজেশন, প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট আবু আব্বাস গোষ্ঠী, **তাজিকিস্তান/ফিরগিজস্তান/উজবেকিস্তান** ঃ ইসলামিক মুভমেন্ড অব উজবেকিস্তান, **ইসারায়েল / জর্ডান /প্যালেস্তাইন** ঃ হামাস, অন্য নাম ইজজ আল দি আল কোয়াশিম, ব্রিগেডস, অন্য নাম ইজজ আল দিন আল কোয়াশিম, ফোর্সেস, অন্য নাম ইজজ আল দিন আল কোয়াশিম, ব্যাটেলিয়নস, অন্য নাম ইজজ আল দিন আল কোয়াশাম, বিগ্রেডস, অন্য নাম, ইজজ আল দিন আল কোয়াশাম, ফোর্সেস, অন্য নাম ইজজ আল দিন আল কোয়াশাম, ব্যাটেলিয়নস, কাহানে চাই, অন্য নাম ইয়েশিভা অব দা জিউইশ আইডিয়া, বায়াত আল মকদিস, প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট আবু আব্বাস ফ্যাকশন, অন্য নাম প্যালেস্তাইন লিবারেশন ফ্রন্ট, পপুলার প্রন্ট ফর দা লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন, অন্য নাম পিএফএলপি, অন্য নাম প্যালেস্তাইন পপুলার রেজিস্ট্যান্স, ফোর্স, রোয়ান্ডা ঃ আর্মি ফর দা লিবারেশন অব রোয়ান্ডা, ফর্মার আর্মড , **লেবানন** ঃ আবু নিদাল অর্গানাইজেশন, হিজবুল্লা, অর্গানাইজেশন, অন্য নাম অর্গানাইজেশন অব দা অপ্রেসড অন, আর্থ, রং, অন্য নাম আনসার আল্লাহ, অন্য নাম ফলোয়ার্স অব দা প্রফেট মহম্মদ, পপুলার প্রন্ট ফর দা লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন, জেনারেল কমান্ড, জাপানিজ রেড আর্মি, প্যালেস্তাইন ইসলামিক জেহাদ শাকাকি গোষ্ঠী, পপুলার ফ্রন্ট ফর দা লিবারেশন অব প্যালেস্তাইন, আলমিজরিয়া ঃ আমর্ড ইসলামিক গ্রুপ, অন্য নাম আল যানাহু আল ইসলামিক আল, মুসাল্লা, **ইজিপ্ট** ঃ গামা'আ আল ইসলামিয়া, অন্য নাম জিহাদ গ্রুপ। *সূত্র : ক্রাদিল এক্স টেলর কো অর্ডিনেটর ফর কাউন্টার টেররিজম ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা।' রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন ভদ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা।পৃষ্ঠা-১৩৬-১৩৯।*

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশিকাঃ

১। বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদ । বসুন্ধরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা ২০০৩ ইং, । পৃষ্ঠা-১৬৭-১৭১ ।

২। সন্ত্রাসীদের ত্রিদেশীয় নেটওয়ার্ক, ১১ই অক্টোবর ২০০৯, দৈনিক জনকণ্ঠ ।

৩। রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্দ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা । পৃষ্ঠা-৪০-৪৯ ।

৪। রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্দ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা । পৃষ্ঠা-২০-২৩ ।

৫। রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্দ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা । পৃষ্ঠা-২৩-৩০ ।

৬। রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্দ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা । পৃষ্ঠা-৩০-৩৯ ।

৭। রথীন চক্রবর্তী, সন্ত্রাসবাদ ।- নাট্য চিন্তা, প্রকাশন তন্দ্রা চক্রবর্তী, ২০০৩ ইং, কলকাতা ।পৃষ্ঠা-১৩৬-১৩৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

প্রশ্নমালা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

সারণী ঃ- ১

প্রশ্ন ঃ ১ রাজনীতিতে সন্ত্রাস কিরূপ মাত্রায় বিদ্যমান।

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. প্রকট	২৮ জন	৫৬%
শিক্ষক	খ. মাঝারি	১৫ জন	৩০%
রাজনীতিবিদ	গ. কম মাঝারি	২জন	৪%
চাকুরিজীবী	ঘ. নিম্ন মাঝারি	৫ জন	১০%
ব্যবসায়ী	ঙ. সন্ত্রাসমুক্ত	০ জন	০.০০%
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে সন্ত্রাস প্রকটতার মাত্রা জরিপে ২৮জন অর্থাৎ ৫৬% মতামত রাজনীতিতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ব্যাপক ১৫ জন অর্থাৎ ৩০% মাঝারি মাত্রায়, ২ জন অর্থাৎ ৪% কম মাঝারি, নিম্ন মাত্রার ৫ জন অর্থাৎ ১০% এবং সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির পক্ষে কেউ মতামত প্রদান করেনি। সুতরাং জরিপ পর্যালোচনায় রাজনীতিতে সন্ত্রাস প্রকট বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সারণী ঃ- ১.১

প্রশ্ন ঃ ২. রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে ধারণা।

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য	১১ জন	২২%
শিক্ষক	খ. রাজনীতিক দলগুলোর হাতিয়ার	১৭ জন	৩৪%
রাজনীতিবিদ	গ. রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুরক্ষার জন্য	১৯ জন	৩৮%
চাকুরিজীবী	ঘ. মানসিক বিকৃতিজনিত	০০ জন	০০%
আইনজীবী	ঙ. দারিদ্রতার জন্য	০৩ জন	০৬%
ব্যবসায়ী			
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে মতামত জরিপে দেখা যাচ্ছে, ১৯ জন অর্থাৎ ৩৮%, উত্তরদাতা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুরক্ষার জন্য সন্ত্রাসের উত্থান, ১৭ জন অর্থাৎ ৩৪% রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার, ১১ জন অর্থাৎ ২২% বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য এবং ৩ জন অর্থাৎ ৬% দারিদ্রতার জন্য রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উত্থান বলে মতামত দিয়েছে। অতএব, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুরক্ষার জন্যই সন্ত্রাসের উত্থান বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ১.২

প্রশ্ন ঃ ৩. রাজনীতিতে সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় কতটা প্রতিবন্ধক।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক.গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চাকে পুরোপুরি ব্যাহত করছে খ. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুগম হচ্ছে গ.নতুন অরাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে	৩১ জন ০০ জন ১৯ জন	৬২% ০০% ৩৮%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পুরোপুরি ব্যাহত করছে বলে মতামত প্রদান করেছে ৩১ জন অর্থাৎ ৬২% এবং নতুন অরাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে বলে মতামত প্রদান করেছে ৩৮%। সুতরাং রাজনীতিতে সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার্কে পুরোপুরি ব্যাহত করছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

সারণী ঃ- ১.৩

প্রশ্ন ঃ ৪. রাজনীতিতে সন্ত্রাস রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত মনোভাবে কি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. বেশি সন্ত্রাসের প্রয়োজন খ. বিরোধী দলগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য প্রকৃত হাতিয়ার মনে করছে গ. রাজনৈতিক ময়দানে টিকে থাকার জন্য সন্ত্রাস লালন পালন জরুরি ঘ. সন্ত্রাস বিষয়ে কোন মাথা ব্যাথা নেই	০০ জন ২০ জন ৩০ জন ০০ জন	০০% ৪০% ৬০% ০০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জন অর্থাৎ ৬০% উত্তরদাতাদের বলছেন, রাজনৈতিক ময়দানে টিকে থাকার জন্য সন্ত্রাস লালন পালনে রাজনৈতিক দলগুলো আংশিক মনোযোগী এবং ৪০% উত্তরদাতার মতামতে রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার জন্য সন্ত্রাস লালন করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ১.৪

প্রশ্ন ঃ ৫. সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ কতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. শতভাগ খ. মাঝারি মাত্রায় গ. নামমাত্র ঘ. একদমই না	২০ জন ২৬ জন ৪ জন ০ জন	৪০% ৫২% ০৮% ০০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, মতামত জরিপে সর্বোচ্চ ২৬ জন অর্থাৎ ৫২% মতামত (খ) উত্তরমালার ২০ জন অর্থাৎ ৪০% (ক) উত্তরমালার ৮% (গ) উত্তরমালার এবং (ঘ) উত্তরমালার মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা ০ (শূন্য)। অতঃপর (ঙ) সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভগের পৃথকীকরণ মাঝারি মাত্রার ভূমিকা রাখবে বলে অধিকাংশ মতামত।

সারণী ঃ- ১.৫

প্রশ্ন ঃ ৬. সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কি হতে পারে।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির শপথগ্রহণ করা খ. কেবল নির্বাচনী ইশতেহারে না আটকে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করা গ. বিচার বিভাগ, পুলিশ, র‍্যাব ও প্রশাসনের উপর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ঘ. দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের বয়কট করা	২ জন ২২ জন ২৫ জন ১ জন	৪% ৪৪% ৫০% ২%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে জরিপমালায় দেখা যাচ্ছে, ২৫ জন অর্থাৎ ৫০% মতামত (গ) উত্তরমালার ২২ জন অর্থাৎ ৪৪% (খ) উত্তর মালায় ২ জন অর্থাৎ ৪% মতামত (ক) উত্তরমালার এবং ঘ উত্তরমালার মতামত ২% মতামত প্রদানকারী। অতঃপর সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব এবং বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধের ওপরই বেশি মতামত গৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ১.৬

প্রশ্ন ঃ ৭ সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি গড়ে তোলার জন্য পুলিশ প্রশাসন র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার কি জরুরী। হ্যাঁ হলে কিভাবে তা প্রশাসনে দলীয় প্রভাব মুক্ত রাখা।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. উন্নত প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা খ. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করন গ. তাদের কার্যসমূহের রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন করন।	৭জন ২৮ জন ১৫ জন	১৪% ৫৬% ৩০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের প্রশ্ন জরিপমালার প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ২৮ জন অর্থাৎ ৫৬% মতামত জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্ব দিচ্ছে, ১৫ জন অর্থাৎ ৩০% মতামত তাদের কার্যের ডিজিটাইলাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনে জোর দিচ্ছে এবং বাকি ১৪% মতামত উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে। অতএব সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি গড়ে তোলার জন্য পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব ও বিচার বিভাগের ওপর থেকে হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার জরুরি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

সারণী ঃ- ১.৭

প্রশ্নঃ ৮. রাজনীতিক সন্ত্রাসের প্রভাব পড়ে।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে	৪৯জন	৯৮%
শিক্ষক	খ.শুধুমাত্র বিরোধি রাজনৈতিক দলের উপর	১ জন	০২%
রাজনীতিবিদ	গ. কতিপয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর		
চাকুরিজীবী	ঘ. নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবার	০ জন	০০%
আইনজীবী	ঙ. সংখ্যালঘুদের ওপর	০ জন	০০%
ব্যবসায়ী	চ. বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০ জন	০০%
অন্যান্য		০ জন	০০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৪৯ জন অর্থাৎ ৯৮% মতামতে বলছে, রাজনীতিক সন্ত্রাসের প্রভাব রাষ্ট্রের সকলক্ষেত্রে পড়ে। অতঃপর একথা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে, সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি একান্ত অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ১.৮

প্রশ্ন ঃ ৯। রাষ্ট্রের সুনাগরিক বা সচেতন ব্যক্তি হিসেবে রাজনীতিতে সন্ত্রাস নির্মূল করনের প্রতিকার

কি বলে আপনার মতামত।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. সামাজিকভাবে সন্ত্রাস মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হওয়া	৪৩	৮৬%
শিক্ষক	খ. কেবলমাত্র সন্ত্রাসী এবং তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানানো	২	৪%
রাজনীতিবিদ			
চাকুরিজীবী	গ. সন্ত্রাস মুক্ত রাজনীতি চাই এ স্লোগান নিয়ে মিছিল,	৩	৬%
আইনজীবী	মিটিং, কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা		
ব্যবসায়ী	ঘ. সন্ত্রাসী রাজনীতি নয় সঠিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার	২	৪%
অন্যান্য	রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এ মর্মে সকলকে শপথ গ্রহণ করা		
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৪৩ জন অর্থাৎ ৮৬% মতামত জরিপে সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস মোকাবেলায় গুরুত্বারোপ করেছে। (গ) উত্তরমালায় ৬% মতামত (ঘ) উত্তরমালার ৪% এবং (ঙ) উত্তরমালার ৪% মতামত পাওয়া গেছে। অতঃপর দেখা যাচ্ছে, (ক) সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস মোকাবেলা অত্যন্ত জরুরি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

সারণী ঃ- ১.৯

প্রশ্ন: ১০. সন্ত্রাসের রাজনীতি কোন এলাকার পরিসরে অধিক মাত্রায় সংগঠিত হয়।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. মেট্রো পলিটন সিটিতে	২৯জন	৫৮%
শিক্ষক	খ. শহরতলীতে	১৪ জন	২৮%
রাজনীতিবিদ	গ. জেলা ও থানা/ উপজেলা	৫ জন	১০%
চাকুরীজীবী	ঘ. স্থানীয় পর্যায়ে	২ জন	৪%
আইনজীবী			
ব্যবসায়ী			
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের জরিপ প্রশ্নমালার প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২৯ জন অর্থাৎ ৫৮% জনমত বলছে মেট্রোপলিটন সিটির কথা, ২৮% জনমত বলছে শহরতলীর কথা, ৫ জন অর্থাৎ ১০% জনমত বলছে জেলা থানা / উপজেলা এবং ৪% জনমত স্থানীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস সংগঠিত হওয়ার ব্যাপারে মতামত প্রদান করেছে। অতএব (ক) মেট্রোপলিটন সিটিই সন্ত্রাসীদের আস্তানা বলে চিহ্নিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ২.১

১১. সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য রাজনীতিক দলগুলোর সংস্কার প্রয়োজন আছে কি? থাকলে তা কিভাবে?

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলগুলোর পুরনো নেতাদের ঢালাওভাবে দল থেকে প্রত্যাহার করা	৩জন	০৬%
	খ. উচ্চশিক্ষিত, বিনয়ী, সহিষ্ণু ও নৈতিকতায় বলিয়ান লোকদের রাজনীতিক দলে অর্ন্তভুক্তকরণ	৪৭ জন	৯৪%
	গ. দলের প্রতি ত্যাগী ও নৈতিকায় বলিয়ান লোকদের দলে অন্তর্ভুক্তকরণ।	০ জন	০.০%
	ঘ. বার বার দল পরিবর্তনকারী নেতাদের দলে ফিরিয়ে আনা	০ জন	০.০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য রাজনীতিক দলগুলোর সংস্কার প্রয়োজন আছে কিনা মতামত জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ৪৭ জন অর্থাৎ ৯৪% জনমত বলছে উচ্চশিক্ষিত, বিনয়ী, সহিষ্ণু এবং নৈতিকতায় বলিয়ান লোকদের রাজনৈতিক দলে অন্ত র্ভুক্তিকরণের ওপর মতামত প্রদান করেছে। বাকি ৬% জনমত (ক) উত্তরমালায় মতামত প্রদান করেছে।

সারণী ঃ- ২.২

প্রশ্ন: ১২ দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় চরমপন্থি / জঙ্গি সংগঠনসমূহ জড়িত আছে কি? হ্যাঁ

হলে এ সংগঠনসমূহের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তৎপরতা কিরূপ?

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. প্রকট / অত্যন্ত বেশি	৯জন	১৮%
	খ. মধ্যম মাপের	১৮ জন	৩৬%
	গ. খুব সামান্য	২৩ জন	৪৬%
	ঘ. কোনো ব্যাপকতা নেই	০ জন	০.০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জঙ্গি সংগঠনসমূহের তৎপরতার ব্যাপারে প্রাপ্ত জনমতে দেখা যাচ্ছে, ২৩ জন অর্থাৎ ৪৬% বলছে খুব সামান্যই তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ৩৬% জনমত মধ্যম মাত্রার এবং

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত প্রকট বলেছেন ১৮% জনমত। সুতরাং জনমতে ইহাই প্রতীয়মান হচ্ছে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জঙ্গি সংগঠনসমূহের তৎপরতা সামান্য মাত্রায়।

সারণী ঃ- ২.৩

প্রশ্ন:১৩। জঙ্গি / চরমপন্থি গোষ্ঠী তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের টার্গেট / নিশানা করেছে কোন কোন সেক্টারকে।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. বিধর্মী গোষ্ঠীকে	৬জন	১২%
শিক্ষক	খ. রাজনীতিক দল/ব্যক্তিকে	৭ জন	১৪%
রাজনীতিবিদ	গ. অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন		০.০%
চাকুরিজীবী	প্রতিষ্ঠান ও লোকদের	০ জন	১৪%
আইনজীবী	ঘ. ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী,	৭ জন	৫৬%
ব্যবসায়ী	আইনজীবী এবং বিভিন্ন	২৮জন	৪%
অন্যান্য	পেশার লোকদের		
	ঙ. প্রযোজ্য নহে।	২ জন	
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরোক্ত জরিপ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত জনমতে দেখা যাচ্ছে, ২৮ জন অর্থাৎ ৫৬% জনমত বলছে জঙ্গি / চরমপন্থি গোষ্ঠীসমূহ সকল পেশাজীবী মানুষকে তাদের টার্গেটে পরিণত করেছে। **যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, জঙ্গি / চরমপন্থী গোষ্ঠীসমূহ দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে একটা** আতঙ্কের নাম।

সারণী ঃ- ২.৪

প্রশ্ন: ১৪। জঙ্গিবাদ / চরমপন্থিদের উত্থান কি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন প্রভাব ফেলেছে? তা কিরূপ? ইতিবাচক না নেতিবাচক? নেতিবাচক হলে

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. জঙ্গিবাদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে	৩০ জন	৬০%
শিক্ষক	রাজনীতিক দলগুলো একে অপরকে		
রাজনীতিবিদ	দোষারোপ প্রদান রাজনীতিক		
চাকুরিজীবী	অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তোলা।		
আইনজীবী	খ.জঙ্গিবাদ গোষ্ঠীকে পুরোপুরি নির্মূল	২০জন	৪০%
ব্যবসায়ী	না করে রাজনীতিক দল ও জনগণকে		
অন্যান্য	আতঙ্কে ভুগানো।		
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

জঙ্গি চরমপন্থি সমূহের উত্থানে ৩০ জন অর্থাৎ ৬০% জনমত বলছে রাজনৈতিক দলসমূহ উক্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বাকযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে রাজনৈতিক পটকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ২.৫

প্রশ্ন:১৫ রাজনীতিক সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তিদের পারিবারিক অবস্থা কি ধারায়।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. সর্বশান্ত হয়ে পড়ে	৬ জন	১২%
শিক্ষক	খ. সামাজিক ভাবে হেয় হয়	১১ জন	২২%
রাজনীতিবিদ	গ. সামাজিক ভাবে মানুষের		
চাকুরিজীবী	করুণা লাভ করে।	১০ জন	২০%
আইনজীবী	ঘ. মানবেতর জীবনযাপন করে।	২৩ জন	৪৬%
ব্যবসায়ী			
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার পরিবার সমূহের ৬ জন অর্থাৎ ১২% সর্বশান্ত হয়, ১১ জন অর্থাৎ ২২% সামাজিক ভাবে হেয় হয়, ১০ জন অর্থাৎ ২০% সামাজিক ভাবে মানুষের করুনা লাভ করে, ২৩ জন অর্থাৎ ৪৬% মানবেতর জীবন যাপন করে। যা কিনা সমাজে পরিবার বা ব্যক্তির উপর সন্ত্রাসের নেতিবাচক প্রভাব সুস্পষ্ট করে তুলে।

সারণী ঃ- ২.৬

১৬। রাজনীতি সন্ত্রাসের ফলে জাতীয় বড় ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি? হ্যাঁ/ না।
হ্যাঁ হলে তা কি ধরনের

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. রাজনীতির সুষ্ঠু ধারা ব্যাহত হয়	৯ জন	১৮%
শিক্ষক	খ. গণতন্ত্রের চৌর্য বৃত্তি ঘটে	৮ জন	১৬%
রাজনীতিবিদ	গ. দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়	২৭ জন	৫৪%
চাকুরীজীবী	ঘ. জীবনযাপন ব্যাহত হয়	৬ জন	১২%
আইনজীবী	ঙ. মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়	০ জন	০০%
ব্যবসায়ী			
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

রাজনীতিতে সন্ত্রাসের কারণে দেশের ভাবমূর্তি দারুনভাবে নষ্ট হয় বলছে ২৭ জন অর্থাৎ ৫৪% জনমত ৯ জন অর্থাৎ ১৮% জনমত বলছে রাজনৈতিক সুষ্ঠু ধারা ব্যাহত হওয়ার কথা ৮ জন অর্থাৎ ১৬% বলছে গণতন্ত্রের চৌর্যবৃত্তির কথা। অতএব প্রতীয়মান হচ্ছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ফলে বড় ধরনের জাতীয় সমস্যার ব্যাপারটি প্রকট।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ২.৭

প্রশ্ন: ১৭ আপনি কখনো রাজনীতিক সন্ত্রাসের স্বীকার হয়েছেন? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে কি ধরনের শিকার ।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. বিরোধী দল কর্তৃক	২২ জন	৪৪%
শিক্ষক	খ. দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল	১৭ জন	৩৪%
রাজনীতিবিদ	গ. রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত		১০%
চাকুরিজীবী	প্রতি হিংসার শিকার	৫ জন	১২%
আইনজীবী	ঘ. রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার	৬ জন	
ব্যবসায়ী	নয়।		
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন জনমতে দেখা যাচ্ছে, ৪৪ জন অর্থাৎ ৮৮% জনমত কোন না কোনভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন মাত্র ১২% জনমত কোন ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হননি বলে মতামত প্রদান করেছেন। যা স্পষ্ট করে দেয় দেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রকটতার বিষয়টি।

সারণী ঃ- ২.৮

প্রশ্ন: ১৮। রাজনীতিক প্রতিহিংসার শিকার ব্যক্তিরা প্রশাসন, পুলিশ কর্তৃক সহায়তা পায় না পায়

না। না পেলে তা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তির জন্য কি তা পর্যাপ্ত হয়?

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী	ক. হ্যাঁ	২০ জন	৪০%
শিক্ষক	খ. না	৩০ জন	৬০%
রাজনীতিবিদ			
চাকুরিজীবী			
আইনজীবী			
ব্যবসায়ী			
অন্যান্য			
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার ব্যক্তিরা পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থার পুরোপুরি সহায়তা পায় না বলে মতামত প্রদান করেছে ৩০ জন অর্থাৎ ৬০% বাকি ২০ জন অর্থাৎ ৪০% বলেছে পর্যাপ্ত সহায়তা পাওয়ার কথা যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের পুলিশ ও প্রশাসন রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে লালন পালনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সারণী ঃ- ২.৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নঃ ১৯ আপনার বিনোদনের মাধ্যম কি।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরীজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. রেডিও খ. টিভি গ. সংবাদপত্র	৩ জন ৩১ জন ১৬ জন	৬% ৬২% ৩২%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরোক্ত জরিপ প্রশ্নমালায় গৃহীত জনমতের ৩১ জন অর্থাৎ ৬২% বিনোদন হিসেবে টিভি ১৬ জন অর্থাৎ ৩২% সংবাদপত্র এবং ৬% রেডিও কে বেছে নেন। যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জনমতের সবাই তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট।

সারণী ঃ- ৩.১

প্রশ্নঃ ২০ আপনি স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখেন কি? দেখলে কি ধরনের অনুষ্ঠান বেশি প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. মুভি খ. খেলাধূলা গ. সংবাদ ঘ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঙ. শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চ. রাজনীতিক অনুষ্ঠান	২৩ জন ২ জন ২৪ জন ৪ জন ০ জন ০ জন ১ জন	৪৬% ৪% ৪০% ৮% ০% ০% ২%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

জনমত প্রদান কারীদের ২৩ জন অর্থাৎ ৪৬% স্যাটেলাইট চ্যানেলে মুভি দেখে থাকেন ২০ জন অর্থাৎ ৪০% সংবাদ দেখেন। যা কি না সচেতনতা এবং জানার বিষয়টিকে প্রতীয়মান করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ৩.২

প্রশ্ন ২১ আপনি রাজনীতি বা সন্ত্রাসমূলক প্রতিবেদন দেখেন কি।

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. হ্যাঁ খ. না	৩০ জন ২০ জন	৬০% ৪০%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীর জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, ৬০% জনমত রাজনীতি বা সন্ত্রাসমূলক প্রতিবেদন দেখার বিষয়টি জানিয়েছেন ২০ জন অর্থাৎ ৪০% দেখেন না অথার্ৎ সন্ত্রাস বা রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা জনমতের কাছে প্রাধান্যের বিষয়টি প্রতীয়মান করে।

সারণী ঃ- ৩.৩

প্রশ্ন ঃ ২২ আপনি কি দৈনিক পত্রিকা পড়েন? পড়লে কোন ধরনের সংবাদ বেশি পড়েন?

উত্তরদাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. রাজনীতি খ. সংস্কৃতি গ. অর্থনৈতিক ঘ. খেলাধূলা	২৫ জন ১৯ জন ৫ জন ১ জন	৫০% ৩৮% ১০% ২%
		মোট ৫০ জন	১০০%

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরোক্ত জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, ২৫ জন অর্থাৎ ৫০% জনমত সংবাদপত্রে রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ পড়ার কথা বলেছেন ১৯ জন অর্থাৎ ৩৮% সংস্কৃতি, অর্থনীতি ১০% এবং ২% খেলাধুলা। যা কিনা দেশের রাজনীতি বিষয়ক সংস্কৃতি অনুধাবনের পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ- ৩.৪

প্রশ্ন ঃ ২৩। আপনি সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংবাদ পড়েন কি?

উত্তর দাতার প্রকারভেদ	উত্তরমালার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ছাত্র / ছাত্রী শিক্ষক রাজনীতিবিদ চাকুরিজীবী আইনজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	ক. হ্যাঁ খ. না	৩৪ জন ১৬ জন	৬৮% ৩২%
		মোট ৫০ জন	১০০%

মাঠ জরিপ

সন্ত্রাস সম্পর্কিত সংবাদ পাঠ করেন কিনা জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে ৩৪ জন অর্থাৎ ৬৮% জনমত সন্ত্রাসসম্পর্কিত সংবাদ পড়েন। উক্ত সংবাদ পড়েন না ১৬ জন অর্থাৎ ৩২% জনমত। যা প্রতীয়মান করে, জনমতের অধিকাংশই সন্ত্রাস বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

"রাজনীতিতে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ বাংলাদেশ"
শীর্ষক গবেষণার প্রশ্নমালা

১। রাজনীতিতে সন্ত্রাসশীর্ষক শিরোনাম মতামত জরিপে সন্ত্রাস কিরূপ মাত্রায় ব্যাপকতা / ব্যাপ্তি লাভ করেছে বলে আপনি মনে করেন?
ক) প্রকটভাবে খ) মাঝারি মাপের
গ) নিম্নমাপের ঘ) সন্ত্রাসমুক্ত।

২। রাজনীতিতে সন্ত্রাসের উৎস সম্পর্কে আপনার ধারণা?
ক) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের জন্য খ) রাজনীতিক দলগুলো হাতিয়ার হিসেবে
গ) রাজনীতির কর্তৃত্ব সুরক্ষা দেয়ার জন্য ঘ) মানসিক বিকৃতিজনিত কারণে
ঙ) দারিদ্রতার জন্য।

৩। রাজনীতিতে সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চায় কতটা প্রতিবন্ধক বলে আপনার মতামত?
ক) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চাকে পুরোপুরি ব্যাহত করেছে
খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার পথকে সুগম করেছে
গ) নতুন অরাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে।

৪। রাজনীতিতে সন্ত্রাস রাজনীতিক দলগুলোর নীতিগত মনোভাব কি ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে?
ক) বেশি বেশি সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে
খ) বিরোধী দলগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য প্রকৃত হাতিয়ার মনে করছে
গ) রাজনীতির ময়দানে টিকে তাকার জন্য সন্ত্রাস লালন পালন জরুরি
ঘ) না কি সন্ত্রাস বিষয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই

৫। সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ কতটা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনার মতামত?
ক) শতভাগ খ) মাঝারি মাত্রায়
গ) নাম মাত্র ঘ) একদম-ই-না

৬। সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির জন্য রাজনীতিক দলগুলোর ভূমিকা কি হতে পারে?
ক) সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতির শপথ গ্রহণ করা
খ) কেবলমাত্র নির্বাচনী ইশতেহারেই আটকানো থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করা
গ) বিচার বিভাগ, পুলিশ, র‍্যাব ও প্রশাসনের ওপর থেকেই হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার করা
ঘ) দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের বয়কট করা

৭। সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি গড়ে তোলার জন্য পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব, গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার কি জরুরি? হ্যাঁ হলে কিভাবে সবকটা প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা?
ক) উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা খ) জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
গ) তাদের কার্যসমূহের রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশনকরণ

৮। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রভাব পড়ে?
ক) রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে খ) শুধুমাত্র বিরোধী রাজনীতিক দলের ওপর
গ) কতিপয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর ঘ) নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবার
ঙ) সংখ্যালঘুদের ওপর চ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

৯। রাষ্ট্রের সুনাগরিক বা সচেতন ব্যক্তি হিসেবে রাজনীতিতে সন্ত্রাস নির্মূলীকরণের প্রতিকার কি বলে আপনার মতামত?

ক) সামাজিকভাবে সন্ত্রাস মোকাবেলায় একতাবদ্ধ হওয়া

খ) কেবলমাত্র সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ধিক্কার জানিয়ে

গ) সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি চাই এ স্লোগান নিয়ে মিছিল, মিটিং কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদি

আয়োজন করা

ঘ) সন্ত্রাস মোকাবেলায় প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হওয়া

ঙ) সন্ত্রাস রাজনীতি নয়, সঠিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা এ মর্মে সকলকে

শপথ গ্রহণ করা

১০। সন্ত্রাসের রাজনীতি কোনো এলাকার পরিসরে অধিক মাত্রায় সংগঠিত হয়?

ক) মেট্রোপলিটন সিটিতে খ) শহরতলীতে

গ) জেলা ও থানা উপজেলা ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে

১১। সন্ত্রাসের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য রাজনীতিক দলগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি?

ক) প্রত্যেক রাজনীতিক দলগুলোর নুরন্দো নেতাদের ঢালাওভাবে দল থেকে প্রত্যাহার করা

খ) উচ্চশিক্ষিত, বিনয়ী, সহিষ্ণু ও নৈতিকতার বলিয়ান লোকদের রাজনীতিক দলে অন্তর্ভুক্তকরণ

গ) দলের প্রতি ত্যাগী ও নৈতিকতায় বলিয়ান লোকদের দলে অন্তর্ভুক্তকরণ

ঘ) বার বার দল পরিবর্তনকারী নেতাদের সরিয়ে দেয়া।

১২। দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনায় চরমপন্থী / জঙ্গি সংগঠনসমূহ জড়িত আছে কি? হ্যাঁ হলে জঙ্গি সংগঠনসমূহের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপকতা কিরূপ?

ক) প্রকট / অত্যন্ত বেশি খ) মধ্যম মাপের

গ) খুব সামান্য ঘ) কোনো ব্যাপকতা নেই

১৩। জঙ্গি / চরমপন্থি গোষ্ঠী তাদের কর্মকাণ্ডের টার্গেট / নিশানা করেছে কোন কোন সেক্টরকে?

ক) বিধর্মী গোষ্ঠীকে খ) রাজনীতিক দল / ব্যক্তিকে

গ) অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লোকদের

ঘ) ব্যবসায়ী চাকরিজীবী, আইনজীবী এবং বিভিন্ন পেশার লোকদের ঙ) প্রযোজ্য নহে

১৪। জঙ্গিবাদ / চরমপন্থি উত্থান বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো প্রভাব ফেলেছে? তা কিরূপ? ইতিবাচক / নেতিবাচক? নেতিবাচক হলে -

ক) জঙ্গিবাদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনীতিক দলগুলোর একে অপরকে দোষারোপ প্রদানে রাজনীতিক অঙ্গনকে অস্থিতিশীল করে তোলা

খ) জঙ্গিবাদ গোষ্ঠীকে পুরোপুরি নির্মূল না করে রাজনীতিক দল ও জনগণকে আতঙ্কে ভুগানো।

১৫। রাজনীতিক সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তিদের পারিবারিক অবস্থা কি ধারায়?

ক) সর্বশান্ত হয়ে পড়ে খ) সামাজিকভাবে হেয় হয়

গ) সামাজিকভাবে মানুষের করুণা লাভ করে ঘ) মানবেতর জীবনযাপন করে

১৬। রাজনীতিক সন্ত্রাসের ফলে জাতীয় বড় ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে কি? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে তা কি ধরনের-

ক) রাজনীতিক সুষ্ঠু ধারা ব্যাহত হয় খ) গণতন্ত্রের চৌর্যবৃত্তি ঘটে

গ) দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় ঘ) জীবনযাপন ব্যাহত হয়

ঙ) মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়

Dhaka University Institutional Repository

১৭। আপনি কখনো রাজনীতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে কি ধরনের শিকার?
ক) বিরোধী দল কর্তৃক খ) দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দল
গ) রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার শিকার ঘ) রাজনীতিক সন্ত্রাসের শিকার হননি

১৮। রাজনীতিক প্রতিহিংসার শিকার ব্যক্তিরা প্রাশসন, পুলিশ, র‍্যাব কর্তৃক সহায়তা পায়, না পায় না। পেলে তা রাজনীতিক সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তির জন্য কি তা পর্যাপ্ত হয়?
ক) হ্যাঁ খ) না

১৯। আপনার বিনোদনের মাধ্যম কি?
ক) রেডিও খ) টিভি গ) সংবাদপত্র

২০। আপনি সেটেলাইট চ্যানেল দেখেন কি? দেখলে কি ধরনের অনুষ্ঠান বেশি প্রাধান্য দেন?
ক) মুভি খ) খেলাধুলা গ) সংবাদ
ঘ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঙ) শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান চ) রাজনীতিক

২১। আপনি রাজনীতি বা সন্ত্রাসমূলক প্রতিবেদন দেখেন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না

২২। আপনি কি দৈনিক পত্রিকা পড়েন? পড়লে কোন ধরনের সংবাদ বেশি পড়েন?
ক) রাজনীতি খ) সংস্কৃতি
গ) অর্থনীতি ঘ) খেলাধুলা

২৩। সন্ত্রাসসম্পর্কিত সংবাদ পড়েন কি?
ক) হ্যাঁ খ) না

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

আমার রাজনীতিতে সন্ত্রাস শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা, জার্নাল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে বিষয়টি আমার উপলব্ধি হয়েছে তা হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবেলায় সকল দেশই আজ একই কাতারে সামিল সকলই আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করতে কি পরাশক্তি, কি অনুন্নত, কি উন্নয়শীল সকলের কণ্ঠস্বর আজ এক সন্ত্রাস মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হও নতুবা সন্ত্রাসবাদই হয়ে উঠবে একবিংশ শতাব্দির বিশ্ব নিয়ন্ত্রক। উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ও আজ সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের প্রতি আমাদের সকলকেই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা উচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস কোনো নতুন বিষয় নয়। রাজনীতিতে তো নয়ই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসের প্রাথমিক রূপ ছিল বৈপ্লবিক। বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করতেই ইহার আবির্ভাব হয়েছিল। যেমন ঃ মাস্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এটা ছিল স্বাধীনতা পূর্ব বৃটিশ শাসনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা। পাকিস্তান আমলে আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উপস্থিতি ছিল, তা ছিল স্বাধীনতাকামী আন্দোলন স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আবির্ভাব ঘটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানকে হত্যার মধ্যদিয়ে। যার ধারাবাহিকতায় আজ অবধি বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ব্যাপকতা নানা অবস্থায় বিস্তৃতি লাভ করছে। দৈনিক পত্রিকা, টিভি এবং দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে তা অনেকটাই স্পষ্ট বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এতটুকু ব্যাপকতা লাভ করেছে, দেশের জনগণ সরকারি চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এমনকি খোদ সরকার প্রধান, সংসদ সদস্যরা সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন প্রায়ই, কখনো হুমকির মতো ব্যাপার ঘটে থাকে। আজ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যেন বিশ্বের অনেক দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি পুরো ছবি সমগ্র দেশকে ঘোর অমানিশার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। যেমন ঃ সার্কভুক্ত দেশ পাকিস্তান আফগানিস্তানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ দুটি দেশের সন্ত্রাসী সংগঠন যেমন ঃ তালেবান লস্কর এ তৈয়বার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ দুটি সংগঠন দেশ দুটিকে যেন খাদের কিনারায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। এ সন্ত্রাসবাদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে আজ যেন পাশ্চাত্য এবং মুসলিম সভ্যতার সংঘাতে বিশ্ববাসী আজ অবগত। সংঘাতের সুযোগে পশ্চিমাদেশগুলো মুসলিম তেল প্রধান দেশগুলোর খনিজ তেল পাচার করছে অবাধে যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা আগামী শতাব্দির প্রধান জ্বালানি মজুদকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে নিচ্ছে অনেকটাই দুর্বল করে দিবে। মুসলিম উম্মাহার দেশ হিসেবে আজ বাংলাদেশেও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উন্নত বিশ্ব সন্দেহের তীর বাংলাদেশের দিকে তাক করছে। এখনই উপযুক্ত সময় সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা। তা না হলে অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অদৃষ্ট কি হবে তা সহজেই অনুমেয় যা কিনা পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানে লক্ষ্যণীয়। আমার রাজনীতিতে সন্ত্রাস শীর্ষক শিরোনামের অভিসন্দর্ভের প্রশ্নমালা জরিপের একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপনের মাধ্যমে আমার গবেষণাকর্মের সমাপ্তি টানব। প্রশ্নমালা জরিপে প্রাপ্ত উল্লেযোগ্য দিকসমূহ হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১। জরিপমালায় রাজনীতিতে সন্ত্রাস প্রকট বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সুরক্ষার জন্যই সন্ত্রাসী উন্নয়ন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩। রাজনীতিতে সন্ত্রাস গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চাকে পুরোপুরি ব্যহত করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

৪। রাজনীতিতে দলগুলো বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার জন্য সন্ত্রাস লালন করছে।

৫। সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ মাঝারিমাত্রার ভূমিকা রাখবে বলে অধিকাংশ মতামত।

৬। বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ বন্ধের ওপরই বেশি মতামত গৃহীত হয়েছে।

৭। সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি গড়ে তোলার জন্য পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব ও বিচার বিভাগের ওপর থেকে হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার জরুরি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

৮। ৯৮% জনমত বলেছে, রাজনীতিক সন্ত্রাসের প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে। বাকি ২% মতামত বলেছে, রাজনীতিক সন্ত্রাসের প্রভাব বিরোধী দলগুলোর ওপর পড়ে। অতঃপর একথা নিংসন্দেহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে সন্ত্রাসমুক্ত রাজনীতি একান্ত অপরিহার্য।

৯। সামাজিকভাবে একতাবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাসের মোকাবেলা অত্যন্ত জরুরি বলে প্রতীয়মান হয়।

১০। মেট্রোপলিটন সিটিই সন্ত্রাসীদের আস্তানা বলে চিহ্নিত হচ্ছে।

১১। ৯৪% জনমতা বলেছে যে উচ্চ শিক্ষিত বিনয়ী সহিষ্ণু এবং নৈতিকতার বলিয়ান লোকদের রাজনীতিক দলের অন্তর্ভুক্তি করানোর ওপর মতামত প্রদান করেছে।

১২। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জঙ্গি সংগঠনসমূহের তৎপরতার ব্যাপারে প্রাপ্ত জনমতে দেখা যাচ্ছে, ৪৬% জনমত বলেছে, খুব সামান্যই তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ৩৬% জনমত মাত্রার অত্যন্ত প্রকট বলেছেন, ১৮% জনমত।

১৩। ৫৬% জনমত বলেছে, জঙ্গি চরমপন্থি গোষ্ঠীসমূহ সকল পেশার জিম্মি মানুষকে তাদের টার্গেটে পরিণত করেছে। যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে জঙ্গি চরমপন্থি গোষ্ঠীসমূহ দেশের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে একটা আতঙ্কের নাম।

১৪। জঙ্গি চরমপন্থি গোষ্ঠীসমূহের উত্থানে ৬০% জনমত বলেছে, রাজনৈতিক দলসমূহ উক্ত ইস্যুকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং বাকযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে রাজনৈতিক উৎসকে অস্থিতিশীল করে তুলছে।

১৫। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তিরা মানবেতর জীবনযাপন করে বলে মতামত দিয়েছে ৪৬%। সামাজিকভাবে মানুষের করুণা পায়। ১২% বলেছে সর্বশান্ত হয়ে যাওয়ার কথা।

১৬। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে দেশের ভাবমূর্তি দারুনভাবে নষ্ট হয় বলেছে ৫৪%।

১৭। ৮৮% জনমত কেবল কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে।

১৮। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার ব্যক্তিরা পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থায় পুরোপুরি সহায়তা পায় না বলে মতামত প্রদান করেছে ৬০%। বাকি ৪০% বলেছে, পর্যাপ্ত সহায়তা পাওয়ার কথা।

রাজনীতিতে সন্ত্রাস শীর্ষক বাংলাদেশ প্রসঙ্গ গবেষণাকর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাস তথা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের একটি প্রাথমিক ধারনা দেয়া। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উৎস, গতিধারা ও মাত্রা নিরুপন করে ইহার মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পিছনে রাজনৈতীক দল সমূহের এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহন আছে কিনা তা তলিয়ে দেখা। এ ছাড়া ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পাশাপাশি সামাজিক ভাবে সংগঠিত সন্ত্রাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরা। বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে সরকার, বিরোধী দল এবং আপামর জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও কর্মকান্ড তুলে ধরার মাধ্যমে সন্ত্রাস দুরীকরনে সম্ভাব্য উপায় সমুহ চিহ্নিত করে রাষ্ট্র দেহ থেকে সন্ত্রাস দূর করা।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার বিষয় নিধারণে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সন্ত্রাস অতীব গুরুত্বপূর্ন ও তাৎপর্যপূর্ণ। এবং উপরোক্ত বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস উন্নত কিংবা অনুন্নত অথবা উন্নয়নশীল দেশ সমুহের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি দেশের
সর্বস্তরের আজ এক আলোচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাস আজ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ জনগন সকলেই আজ সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হয়ে পরেছে। সকলের গলায় যেন আজ সন্ত্রাস ফাঁসির দড়ি হয়ে আটকে গেছে আর সেই ফাঁসির দড়ি যেন ক্রমষই গলায় শক্ত হয়ে আটকে গিয়ে মৃত্যুর দিকে ধাপিত করছে সকলকে। আর এই ফাঁসির কাজ সম্পাদনকারী জল্লাটি হচ্ছে সন্ত্রাসী নিজে, যার পৃষ্ঠপোষকতা রাষ্ট্র করেনা । তথাপি কোন এক অদৃশ্য শক্তিতে সন্ত্রাসীরা প্রচন্ড দাপটের সহিত তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সাধন করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু আজ সময় হয়েছে সে অদৃশ্য অশুভ শক্তির মূল উদঘাটন করে তার উৎপাটন করা। তা না হলে দেশের সরকার প্রধান ব্যক্তি বা মহতী উদ্যোগকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেশকে চরম অস্থিতিশীল, অরাজকতা এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে করবে বাধা গ্রস্ত। আমার গবেষণার মাধ্যমে সন্ত্রাসের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করে সন্ত্রাসের উৎস, বিকাশ ও গতিধারা আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসের উৎসমুখটাকে চিহ্নিতকরে সেই মুখটাকে বন্দ করে দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় তথ্য, নির্দেশাবলী এবং পদক্ষেপ সমূহ বিস্তারীত আলোচনা মাধ্যমে সন্ত্রাস দূরীকরণে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যা কিনা আমার গবেষণা কর্মটিকে একটি যুগপযোগী গবেষণা হিসাবে মর্যাদা দিতে পারে বলে আমার প্রাথমিক অনুমান।

আমার গবেষণা কর্মে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে বেচে নিয়েছি ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ও জরিপ পদ্ধতির। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে সন্ত্রাসের প্রাথমিক পটভূমি, ইহার বিকাশ, সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার নেপথ্যের কারণ জানার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ জার্নাল এবং বিগত বছরের কিছু পত্র-পত্রিকার রিপোর্টের মাধ্যমে আমার গবেষণার সেকেন্ডারি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তুলনামূলক পদ্ধতি বর্তমান সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা শাখার বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আমি আমার গবেষণা পত্র অতীত সমাজ ও বর্তমান সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দাড় করাতে সক্ষম হয়েছি। যার মাধ্যমে কোন সমাজে কি মাত্রায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট সমীকরণ দাড় করাতে চেষ্টা চালিয়েছি। এছাড়া জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি জরিপ প্রশ্নমালা তৈরি করে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর সন্ত্রাস বিষয়ক প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়াস চালিয়েছি।

পরিশেষে আমি সন্ত্রাস নির্মূলে প্রয়োজনীয় কিছু দিক নির্দেশনা এবং অভিমত নিম্নে উল্লেখ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

• সন্ত্রাস নির্মূলে প্রয়োজনীয় সুপারিশ, পদক্ষেপ ও দিক নির্দেশনা ঃ

১। দ্রুত সন্ত্রাসীদেরকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। সন্ত্রাসীরা কোনো দলের নয়, ওরা দেশ ও জাতির শত্রু বিবেচনা করে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উপর জোর নজরদাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সরকারের আইন, শাসন, বিচার বিভাগকে সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির ব্যাপারে কঠোর এবং সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। যাতে করে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংগঠিত করতে না পারে এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে সহজে পার না পায়। আইনকে কঠিনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে শুধু কাগজে কলমে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। সরকার ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে তাদের সবাইকে দলীয় মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে দেশের কাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকল রাজনৈতিক দলকেই উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে সঠিক ভূমিকা রাখতে হবে।

৪। জনগনকেও সজাগ ও সচেতন করতে হবে। এবং তাদের মধ্যে পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব গড়ে দিতে হবে, যেন কোন তুচ্ছ কারনেই আমরা এক অপরের উপর প্রতিশোধ পরায়ন না হয়ে পড়ি। কেননা প্রতিশোধ পরায়ন মনোভাব অনেক সহিংস ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্ম দিতে পারে।

৫। সরকারের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে আরো বেশি দক্ষ, কর্তব্যপরায়ন ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত হতে হবে এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ থাকতে হবে যাতে করে আইনের দুর্বল প্রয়োগের সুযোগে অথবা নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের কে সহযোগিতার মাধ্যমে সন্ত্রাসী রাজত্বের কায়েম না হতে পারে।

৬। যে সমস্ত এলাকায় বেশি বেশি সন্ত্রাসী কার্মকান্ড সংগঠিত হয় সে সব এলাকায় অভিযোগসেল গঠন এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অধিক তৎপরতার সহিত সন্ত্রাসী পাকড়াও সহ নানামুখী কর্মকান্ড পরিচালিত করতে হবে।

সততা, নিষ্ঠা, নৈতিকতা, উন্নয়ন, বিভিন্ন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঠিক করতে হবে যেন তারা অন্যায় কাজের দিকে মনোনিবেশ না করতে পারে। সেজন্য পাশাপাশি আবাসিক ব্যবস্থাও সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করতে হবে।

৭। বর্তমানে সন্ত্রাসীদের ধরতে প্রযুক্তির ব্যবহার যেমন- মোবাইল ট্র্যাকির, সিসি টিভির ব্যবহার সন্ত্রাসীদের চিহ্নিতকরার কাজ অনেকটাই সহজতর করে দিয়েছে এই ধারা বজায় রাখতে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল রপ্ত করতে হবে বাংলাদেশের র‍্যাব, পুলিশ ও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থাকে। অন্যথায় খুব সহজেই অপরাধীরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ধোকা দিতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। দেশের সকলকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবনতাকে নিরুৎসাহিত ও কঠোর ভাবে দমন করতে হবে। এ ব্যাপারে সচেতনতার জন্য টিভি, প্রিন্ট মিডিয়া, সেমিনার, র‍্যালী ও সমাবেশের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাতে হবে।

৯। সন্ত্রাস বিরোধী স্লোগানসহ, সন্ত্রাস নির্মূলে যুগোপযোগী আইন প্রনয়ন ও পুরাতন আইনের সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরী এবং সেই সাথে প্রয়োগ।

১০। সন্ত্রাসীরা যেন কোন রাজনৈতিক দলের ব্যানার ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। অন্যথায় গনতান্ত্রিক দুবৃত্তায়নসহ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমশই অশান্ত ও অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে যা কিনা দেশের ভাবমূর্তিতে দারুন ভাবে ব্যাহত করবে এবং বিদেশী বিনোয়োগ কারীদের আস্থা নষ্ট করবে যা দেশের অর্থনীতিক ভিত্তিকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করবে। দুর্বৃত্ত ধরনের দলীয় লোকজনকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে।

১১। মোবাইল ব্যবহারকারী প্রত্যেক গ্রাহকের রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক জরুরী। এবং এ রেজিষ্ট্রেশন বাধ্যতামূলক সেবায় আনার জন্য সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন জরুরী। কেননা নাম রেজিষ্ট্রেশন বিহীন সিম ব্যবহার করে অনেক সন্ত্রাসী দেশের ভিআইপি সহ সকল সাধারণ জনগনকে হুমকি প্রদানসহ চাঁদাবাজির মত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটায়। সিম সঠিক ব্যাক্তির নামে রেজিষ্ট্রেশন না থাকায় তারা খুব সহজেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়েও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। যা কিনা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তায় দারুন ভাবে বিঘ্নতার সৃষ্টি করছে।

উপরোক্ত বর্ণিত পদক্ষেপ ও অভিমতের মাধ্যমে সন্ত্রাস দূরীকরণে যদি আমার গবেষণা কর্মে কোন একটি নির্দেশনাও কাজে আসে তাহলেই আমি আমার গবেষণাকর্মটি সার্থক ও ফলপ্রসু হবে বলে মনে করব । এবং ভবিষ্যতেও রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর বিষয় নিয়ে গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগে সচেষ্ট হবো। এ ছাড়া গবেষণাটি যদি ফলপ্রসু হিসেবে বিবেচিত হয় যা কিনা বাংলাদেশের গবেষণা ক্ষেত্রে একটি ভিন্নতর মাত্রা যোগ করবে বলে আমার মনে হয় এবং নতুন নতুন গবেষকদেরও আমার কাজটি গবেষণা ক্ষেত্রে নতুন গবেষণার রাজ্যে অবগাহনের দ্বার খুলে দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. অপরাধ বিজ্ঞান। রাজনীতিক হত্যা রাজনীতিক অপরাধ। শ্রী পঞ্চানন ঘোষাল, এম.এস.সি. গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড,সন্স,কলকাতা ১৯৮৫

২. নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতি। আবুহেনা আবদুল আউয়াল, নজরুল ইন্সটিটিউট - ১৯৯৯

৩. রাজনীতির বাহিরে নয়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, কাকলী প্রকাশনী - ২০০০

৪. আজকের রাজনীতি। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা, প্রকাশনা-গতিধারা-২০০১,

৫. সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ। সম্পাদনা আলি রিয়াজ, অঙ্কুর প্রকাশনী - ১৯৯৫।

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রাজনীতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ। গালিব আহসান খান, জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন-২০০১।

৭. সাম্প্রদায়িকতার নানাধিক। সুকান্ত পাল, প্রগ্রেসিভ পাবলিসার্স কলকাতা- ২০০৪।

৮. বাংলাদেশের গণ মাধ্যম। আহমেদ ফারুক হাসান। আগামী প্রকাশনী-১৯৯৬

৯. বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। তারেক শামসুর রহমান।

১০. বাংলাদেশের রাজনীতি সরকার ও শাসন তান্ত্রিক উন্নয়ন-১৫৫৭-২০০০ নিউ এজ পাবলিকেশন ঢাকা-২০০১

১১. বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১। মোঃ মাহবুব রহমান, সময় প্রকাশন -১৯৯১

১২. বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ আফগানিস্থান ও আমেরিকা। মুরারি ঘোষ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স কলকাতা - ২০০৫

১৩. অপরাধ আইন ও কার্যপ্রনালী। নাজমুল আহসান চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান মিয়া খোশরোজ কিতাব মহল লিমিটেড।

১৪. সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ। খুরশিদ আলম হাসান, কল্লোল প্রকাশনী-২০০৫

১৫. সামাজিক গবেষণায় জরিপ পদ্ধতি আর্থ-সামাজিক জরিপে পদ্ধতি। নির্দেশিকা ড.সৈয়দ আলী নকী । উপমা প্রকাশন ঢাকা-২০০২ইং

১৬. বাংলাদেশের রাজনীতি সঙ্কট ও বিশ্লেষণ। তালুকদার মনিরুজ্জামান, শুভ প্রকাশন ২০০৩।

১৭. বাংলাদেশ সমাজ এবং রাজনীতির চালচিত্র। এমাজউদ্দিন আহমেদ, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ,২০০০।

১৮. বাংলাদেশ রাজনীতির একদশক। ড. তারেক শামছুর রহমান, গ্রন্থমেলা, ঢাকা-২০০৩ ইং।

১৯. আন্তজার্তিক সন্ত্রাসের ইতিকথা। আফগানিস্থান থেকে আমেরিকা, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অব.), পালক পাবলিশার্স-২০০২ইং ।

২০. হত্যার রাজনীতি ও বাংলাদেশ। বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সময় প্রকাশন-১৯৯৯ ইং।

২১. জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ১০ই মে ১৯৯১ইং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২. জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৩. জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী ৮ই নভেম্বর ১৯৯১ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৪. জার্নাল সাপ্তাহিক আগামী, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৫. সন্ত্রাসীদের ত্রিদেশিয় নেটওয়ার্ক, ১১ইং অক্টোবর ২০০৯ জনকণ্ঠ

২৬. Bangladesh Political Science Review. Journal of the Department of Political Science, Volume 4- Number 1- December 2006.

Dhaka University Institutional Repository

২৭. Department of Political science. University of Dhaka, A new Experience of Terrorism Bangladesh Perspective, Gyasuddin Molla
২৮. Political Terrorism, Theory. Tactics And Counter Measures, Writer – Gant, Ward Law Cambridge University, Press- 1988
২৯. Terrorism, The Global Perspective, Ab. M. G. Kibria – Writer, Musurykhola Press and Publication – 2003
৩০. Media Coverage of Terrorism, Writer- Methods of Deffuicr, ODasko, Alali, Kenoye Kealvin Eke Editors. Shage Publications
৩১. The International Professional publishers Newbury Park London New Delhi- 1991
৩২. Crime Against Humanity political persecution documents, October 3, December 31 – 2001
৩৩. MA- Published by Documentation Sub Committee. Crime against Humanity. National Convention- 2002, The Daily Star.
৩৪. Crime Against Humanity Public by National Convention, Crime Against Humanity – 2002 HR Bhaven 26/1 Kakrail, Dhaka 1000, Bangladesh.
৩৫. Terrorist Lives, Writer – Max well Taylor and Ethel Quayle, Brasscycs, London, Washington- 1994
৩৬. The Bomb on Bengal The Arise of Revolice Teoray Terrorism, In India 1900-1910 Delhi – Oxford University Press, Oxford, Neyork-1993.
৩৭. Political Terrorism,Of the State in the Medel East, Writer- Asaf Hossain, Mansell Publishing Limited London And New York- 1988.
৩৮. Peace conflict and violence, Writer- Danial, Christle Richard Kwagnen Deborah Duhamn Prentice saddle river, New Jerscy – 2001
৩৯. War of Words, Writer Sandra Silberstein British Library Fatiguing in Publication, Data -2004.
৪০. Religion, Violence and political Mobilisation in South Asia. Writer – Ravider Kavr
৪১. Shge Publication, New Delhi Thousand Oaks – London-2005, "RAIA"
৪২. Hand Book of Political Conflict Theory and Research. Writer – Ted Robert Gurr, The Free Press Division of Macmillan Publishing consinc-New York, Collien Mac Millan Publishers London-1980.
৪৩. Origins of Terrorism, Woodrow Wilson center series. Psychologies and Ideologies. Theologies Stats of Mind. Writer Eocled By- Walter Reich. Woodrow Wilson international center for scholars and Cambridge University Press Cambridge. New York Portchesten Melbourne Sydney-1990.
৪৪. The Terror Network, The Secret War of International Terrorism Writer-Claire Sterling New York Press, Holt Rinehart and Winston Readers Digest Press. New York-1981
৪৫. The Never Ending War Terrorism in The 80's' Writer-Christo Pher Dobson And Rorald Payre. Facts on File New york-oxford -1987
৪৬. AL-Qaeda Now,Under Standing Today's Terrorists Edited By- Karen J. Green Berg. Cambridge University, Press- 2005,

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. To Nonviolent Politician Science From Seasons of Violence, Writer – Glenn D. Paege, University of Hawal, Honolulu Hawal – 1993
৪৮. Critigum of Violence, Between Poststructunalism and Criticla Wrmer Beatrice Hasnssen Routledge Taylor and Eraneis Group London Andnew, York 2000.
৪৯. Environment, Scarcity, And Villence, Writer- Thomas, Homer Dixon Princeton University Press- Prince ton and Oxford- 1990
৫০. On war Political Violence in the International system. Writer By Manusl, Midlarsky The Free Press, Collier Macmillan Publisher Lindon – 1974
৫১. The Age of Terrorism. Writer – Walter Laqueur Little, Brown And Company Boston, Toroto – 1977, Printed in the United States of Amcrica.
৫২. The terror Net work. The sceret war of International Terrorism, Writer Holt, Rimehart
৫৩. And Uierston Readers. De Gest Press New York – 1981
৫৪. Perspectives On Terrorism Writer – Edited by Lawrence zelic Ereedman And Yonah Alexander Hidustan Publishing Corporation India – 1985 Selht
৫৫. Media Power in Politics. Second edition Bores A. Graber University of Illinoisan Chicago – 1994
৫৬. The Power Game. How Washington works writer Hedrick Smith Random House NewYork-1980
৫৭. Terrorism History and Fact in the world and in India. Writer- N. S. Saksena Abhinav Publications New Delhi – 1985
৫৮. Patterns of Global Terrorism 2002, United States Department of State, Office of the Coordinator of Counter Terrorism, April – 2003
৫৯. Fighting Terrorism through Motivating the Young Generation. Writer Md. Mozzammel Haque The Financial Express 02-11-2009
৬০. The writer An Erasmus Mundus in "Atosim" Master course in the Faculty of Science At University of Amsterdam
৬১. Youth Crime. Professor Rosni Department Crime an Science Police. Maulana Bashni Science and Technology University The Daly Star 2009